সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৬৩

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর :
বিশ্বনাথ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, নং রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

শ্রদ্ধেয়

শ্রীসুব্রত বাগচী

করকমলেষু—

এই লেখকের আরো কয়েকটি বই

যখন যেমন
লোটাকম্বল
শ্বেতপাথরের টেবিল
ছাগল
ক্যানসার
কলকাতা আছে কলিকাতাতেই
রসেবশে
রাখিস মা রসেবশে

বোতাম

আমার ভীষণ ভয় করে। কি করে কি হবে! শেষ পর্যন্ত পারব তো! সমরেশকে দেখে এলুম। প্যারালিসিস হয়ে পড়ে আছে। ছেলে আর মেয়ে দুটো শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনও বড় হতে অনেক দেরি। ছেলেটা সবার ছোট। মাথায় মাথায় দুটো মেয়ে। স্কুল শেষ করে কলেজ। কলেজ শেষ করে হয় বিয়ে না হয় চাকরির চেষ্টা। এই গোলাকার পৃথিবীর ঘোর-প্যাঁচ তো অনেক। হায়না, নেকড়ে, শেয়াল, ষাঁড়ে ভর্তি। কেউ গুঁতোবে, কেউ খাবলাবে, কেউ আঁচড়াবে, কামড়াবে। সবই সহ্য করতে হবে, কায়দা করে পাশ কাটাতে হবে। নিজের জীবন যেন নিজেরই পায়ে ফুটবল। পেলের মতো পায়ে পায়ে কাটিয়ে, এধার, ওধার করে গোলের জালে জড়িয়ে দিতে হবে। গোলাকারের গোলেমালে গোলের খেলা। খেলতেই হবে। যতদিন বাঁচা ততদিন খেলা। মাঠেই আমাদের জন্ম, মাঠ থেকেই চিতায়। দর্শক হবার উপায় নেই সবাই খেলোয়াড়। এ খেলার আইনে ফাউল নেই, পেনাল্টি নেই।

সমরেশের বিছানার মাথার দিকে তার স্ত্রী সুপ্রিয়া বসেছিল। বেশ রূপসী। সমরেশের বিয়ের দিন আমরা কম হইচই করেছি! একটু হিংসে যে হয়নি তাও নয়। নিখুঁত সুন্দরী। বন্ধুবান্ধবের ভালো চাকরি হলে, সুন্দরী বউ হলে, প্রোমোশান হলে হিংসে হবে না! তাহলে আর বাঙালি হয়ে জন্মালুম কি করতে! সুপ্রিয়া খুব খোলা-মেলা, হাসিখুশী, হুল্লোড়ে মেয়ে ছিল। বিছানার মাথার দিকে বসে আছে সুপ্রিয়ার ধ্বংসাবশেষ। সমরেশের কেউ কোথাও নেই। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল সুপ্রিয়ার ওপর। লেখাপড়া জানে। সমরেশের অফিসেই একটা চাকরিও পেতে পারে। মধ্যবয়সী,

সুন্দরী মেয়েও কি খুব নিরাপদ! মনে হয় না। দেখছি তো চারপাশে। মানুষের ক্ষিদে বেড়েই চলেছে।
কি হবে, কে জানে! আমার ভীষণ ভয় করছে।
সুপ্রিয়া বলেছিল, 'কেমন আছেন?'
ভদ্রতার প্রশ্ন। ভালো আছি, বলতে সঙ্কোচ হল। কেউ অসুস্থ থাকলে নিজে ভালো আছি বলতে লজ্জা করে। অপরাধী বলে মনে হয়। তাই বানিয়ে বানিয়ে নিজের কিছু অসুখের কথা বললুম। হার্ট দোল খাচ্ছে। রক্ত মিঠে হয়েছে। চাপ বেড়েছে।
সুপ্রিয়া বলেছিল 'সাবধান, এই লোকটাকে আমি বলে বলে পারিনি। স্বামীরা যদি স্ত্রীর কথা একটুও শুনত।'
আমি আর বেশিক্ষণ বসিনি। ওই অবস্থায় যে-কথাই বলি বোকা বোকা মনে হয়। একটা চলমান সংসার ব্রেক ডাউন হয়ে মাঝপথে গোঁত্তা খেয়ে পড়ছে। এ এমন গাড়ি, ঠেলে স্টার্ট করানো যাবে না। মিস্ত্রী এনে মেরামত করানো যাবে না। গাড়ি পড়েই থাকবে। আরোহীরা এইবার যে যার ব্যবস্থা দেখে নাও।
রাস্তায় নেমে লোকজনের ভিড়ে নিজেকে বেশ হারিয়ে ফেলেছিলুম। সবাই চলছে। সবই চলছে। সবই চলমান। দোকানপাট, কেনাবেচা। মনে হল, এইভাবেই যখন সব চলে, চলে যাবে ঠিকই, কোথায় কোন ঘরে কে কাত হয়ে পড়ল তা নিয়ে অত ভাবার কি আছে! মানুষের বরাত বলে তো একটা কথা আছে। যার যেমন বরাত। এইভাবেই আজ, কাল হবে। কাল, পরশু হবে। মনে মোটামুটি একটা বল এসে গেল। প্রবীণরা বলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। তাই না হয় রাখব। একটা মাদুলি, কি পাথর পরব। মাসে একবার মন্দিরে যাব। পাপ-টাপ আর তেমন না-ই বা করলুম। আর আমার পাপ তো একটাই। মেয়েদের দিকে চোরাগোপ্তা তাকানো। সেটা মনে হয় এমন কিছু পাপ নয়। একটা বদ্‌অভ্যাস। চুরি-জোচ্চুরি করি না। লোক ঠকাই না। ভেজালের কারবার করি না।

রাজনীতি করি না। বায়োস্কোপ করি না। আমার বউ চিত্রাকে আমি ভালই বাসি। বধূ-নির্যাতন করি না। আমার বাবাও নেই, মা-ও নেই। বউয়ের কথায় তাঁদের অসম্মানের পাপ ইচ্ছে থাকলেও করতে পারব না। তাঁরা আমার পথ পরিষ্কার করে রেখে গেছেন। অকারণে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে ভেবে, আমার শালীকে বউয়ের মতো করে আদর করেছিলুম। তাও জোর করে নয়। অনেক তেল দিয়ে তার অনুমতি নিয়ে। 'আসতে পারি' বলে নিপাট ভদ্রলোক যেমন অন্যের দরজা ভেজানো ঘরে ঢোকে। তা ছাড়া শালীদের আদর করার অধিকার সব জামাইবাবুরই আছে। শাস্ত্রসম্মত। এর জন্যে পক্ষাঘাত হবে না। বা হঠাৎ চাকরি চলে যাবে না। গেলে গোটা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ বেকার হয়ে যেত। সবার আগে চাকরি যেত আমার অফিসের বড় কর্তার। তিনি তো সব মেয়েকেই 'আবার খাব' সন্দেশ ভাবেন। কি কাণ্ডই যে করে বেচারা! মনটা সব সময় যেন কলুই মাছের মতো লাফাচ্ছে তার। ওটা একটা রোগ। এক দাগ পালসেটিলা থারটি খেলেই সেরে যেতে পারে। কিছু অসুখ অনেকে ইচ্ছে করেই ভালো করে না। বেশ মজা লাগে। যেমন অনেকে দাদ পোষে। চুলকোতে ভালো লাগে বলে।

এই সব আলোচনা করতে করতে যেই বড় রাস্তায় এসে পড়েছি, চোখের সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এক স্কুটার আরোহীকে মেরে বেরিয়ে গেল একটা লরি। স্কুটারটা তালগোল পাকিয়ে গেল। মানুষটা চুরমার। চারপাশ থেকে লোক ছুটে এল। একদল ধাওয়া করল লরিটার পেছনে। শান্ত সুন্দর একটা পরিবেশ নিমেষে রক্তাক্ত। একটা ট্যাকসি থেকে আরোহীদের টেনে টেনে নামিয়ে লোকটিকেও তোলা হল। সবাই বললে অকারণ। শেষ হয়ে গেছে। একেবারে দলা পাকিয়ে গেছে।

আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিলুম একপাশে। হাত-পা কাঁপছে। চোখের সামনে ভয়াবহ মৃত্যু সহ্য করা যায়! সুন্দর লাল রঙের

স্কুটারটা মারা গেছে। মানুষ নয় বলে পড়ে রইল পথের পাশে। এক সেকেণ্ড আগে আর এক সেকেণ্ড পরে। সময়ের ওই সাংঘাতিক মুহূর্তটা কোনও রকমে পাশ কাটাতে পারলে স্কুটার আরোহী এতক্ষণে কত দূরে চলে যেত। কোথাও কোনও বাড়িতে তাঁর স্ত্রী হয়তো ঘড়ি দেখছেন আর ভাবছেন স্বামীর আসার সময় হল। মাছের কচুরি বেলছেন। এলেই ভেজে দেবেন গরম গরম। কেন আসছে না, কেন আসছে না করে সময় এগোবে। এক সময় মৃত্যুদূত এসে দরজার কলিংবেল টিপবে। ছোট মেয়েটি ছুটে আসবে বাবা, বাবা বলে। বাবা নয়। এসেছে বাবার মৃত্যুসংবাদ। সব আলো জ্বলছে, অথচ কী ভীষণ অন্ধকার! আমি ভাবছি এইসব, তার মধ্যেই সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার সেই রাজপথ। নতুন গাড়ি। নতুন মানুষ। পাশের রেস্তোরাঁয় তিনটে যণ্ডা মতো লোক, হাতের চেটোর মতো চওড়া কাটলেটে কামড় মারছে। পাশে চায়ের কাপ ধোঁয়া ছাড়ছে। ঠিক ওই জায়গার ওপর দিয়েই দুচাকা ছুটছে। পেছনে ধাওয়া করে আসছে লরি। মানুষটির চলে যাওয়ার চেয়েও আমি ভাবছি তাঁর পরিবারের কথা। বুড়ি মা বেঁচে নেই তো! অবিবাহিতা বোন। তিন দিন পরেই যার বিয়ে। ছেলে হবার জন্যে স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি ছিল না তো! কে জানে বাবা! আমার ভীষণ ভয় করছে! ঠিক এক সেকেণ্ড পরে কি হবে তাই তো জানি না। অথচ কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজকে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা করছি বিশ বছর পরের। এই তো আজই ষাট হাজার টাকার ইনসিওরেন্স করেছি। পাকবে সেই বিশ বছর পরে, আমার বয়েস তখন হবে ষাট। কোনও মানে হয়। এই সাংঘাতিক ভয়ের পৃথিবীতে এক মিনিট পরে কি হবে কেউ জানে! না আমি জানি, না আমার বউ! সেদিন এক ফার্নিচার-এর দোকানের মালিক বেশ বললেন। একটা খাট কিনতে গেছি। তা বললুম, ভাই এমন একটা খাট দিন, যা সারা জীবন চলে যাবে। ভদ্রলোক আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কত বছর আছেন, জানাতে

পারলে আমার সুবিধে হয়। দশ বছর, বিশ বছর। আপনার জানা আছে?'

খুব বোকা বনে গেলুম। সারা জীবন বলার সময় আমার কোনও ধারণাই ছিল না। সেটা কতটা? কত দূর! ভদ্রলোক তখন ভগবানের মতো হেসে বললেন, 'মশাই, জীবন বড় অনিশ্চিত। পদ্মপাতায় জলের মতো। এই আছে এই নেই। একটা খাট দিচ্ছি। নিয়ে যান। তারপর দেখা যাক, খাট আগে যায় না মানুষ আগে যায়। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, যেমনই হোক, মানুষই আগে যায়।'

একটু বেশ ঝালে-ঝোলে মেখে তরিবত করে খাওয়া-দাওয়া সারা হল। ঢেউ শব্দে বেশ জমাটি একটা ঢেঁকুর উঠল। ছুটির দিন, ভাবছি, একটু গড়িয়ে নিলে ষোলকলা পূর্ণ হয়। দিবানিদ্রার মহাসুখ। যখন যেমন পারা যায় জীবন থেকে সুখ বের করে নিতে হয় নিংড়ে।

বউ বললে, 'এখন আর গড়িয়ে পড়ো না। পিসিমাকে একবার দেখে এসো। অবস্থা খুব খারাপ।'

তাই তো! পিসিমাকে তো একবার দেখতে যাওয়া দরকার। কি থেকে কি হয়ে গেল। মুহূর্তের ব্যাপার। অমন এক সাধিকার মতো মহিলা। সারাটা জীবন যাঁর দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে। কত কাণ্ড করে বিধবা মহিলা ছেলেটিকে মানুষ করলেন! ভালো চাকরি হল। ভালো মাইনে হল। বিয়ে হল ছেলের। দুই নাতি। জীবনের একেবারে শেষ কালে সুখ ছোঁব ছোঁব করছে। প্রায় ছোঁয় আর কি। ভগবান পায়ের তলার জমিটা সামান্য একটু টেনে দিলেন খুচ্ করে। ভোরবেলা মহিলা জপে বসবেন বলে ঠাকুর ঘরে যাবেন। চৌকাঠের ওপর দিয়ে পা বাড়ালেন, এ-ঘর থেকে ও-ঘর। কিছুই না, টাল খেয়ে পড়ে গেলেন। কোমরের হাড়ে একটু চোট লাগল। যা হয়। কেউ বললে, জল দাও, কেউ বললে মলম, আরনিকা। সামান্য চোট। আরে বাবা বৃদ্ধ বয়সের হাড়। একেবারে পাটকাঠির মতো। সেই হল। হিপজয়েণ্টে ফ্যাকচার। তিন মাস পড়ে থাক বিছানায়। যে মানুষ

রাতে ঘণ্টা চারেকের জন্যে বিছানা নিতেন তাঁর এ কি শাস্তি! বিছানা তাঁকে ভালবেসে বললে—কিছু মানুষ আসে সেবা করার জন্যে কিছু আসে সেবা নেবার জন্যে। তুমি এসেছিলে সেবা করার জন্যে। এইবার তুমি আমার সেবা নাও। চোট লাগা পাটা ভুল সেটিং—এর জন্যে বিকল হয়ে গেল। শরীরের যেখানে যত গোলযোগ ছিল, ব্যাধিশত্রু, সব তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এল। রণক্লান্ত সৈনিক এইবার ঘরে ডাক পেয়েছেন। চেতন, অচেতন, অর্ধচেতন স্তরে মন ভাসছে। অলৌকিক দৃশ্য দেখছেন মাঝে মাঝে। আজ অথবা কাল, যে কোনও দিন বীণা নীরব হবে।

ভীষণ ভয় করে। ভগবানকে বিশ্বাস করে তো তাহলে কোনও লাভ নেই। তিনি তো কোনও রক্ষাকবচ নন। আমার পিসিমার চেয়ে ধার্মিক কজন আছেন! আর জীবনে অত কষ্টই বা কে করেছেন। সুখের পেয়ালাটি সবে এগিয়ে এসে ঠোঁট স্পর্শ করব করব করছে; ভাগ্যের হাত থেকে হাতলটি খুলে গেল। হাতলের জোড় খুলে কাপ পড়ে গেল। হল না। এবারটাও হল না। সব দৌড়ে সবাই কি ফিতে ছুঁতে পারে! পরের বার। পিসিমা পরের বার। নেকস্ট টাইম বেটার লাক।

চৌকির ওপর বিছানা। চাদর ঢাকা পিসিমা। মুখটাই শুধু বেরিয়ে আছে। মুখ না বলে কঙ্কাল বলাই ভালো। শুধু পাতলা একটা চামড়ার আস্তরণ। ভীত, সন্ত্রস্ত, করুণ দুটো চোখ। চোখ দেখলেই বন্দী মানুষকে চেনা যায়। বনের পাখি আর খাঁচার পাখি। পিসিমার চোখ মুক্তি খুঁজছে। অনেকদিন এসেছি। ভাগ্যের চাবুক অনেক সহ্য করেছি। অসম্ভব সম্ভব হবে ভেবেছি। ভেবেইছি। আর আমি ভাবতেও পারছি না। পাখি এবার তুমি উড়ে যাও। প্রভু খাঁচা আমার খুলে দাও।

পিসিমা চাদরের তলা থেকে শীর্ণ হাত বের করে আমাকে স্পর্শ করতে চাইলেন। শক্তি নিঃশেষ। আমি কোনও ভাবেই জিজ্ঞেস করতে

পারলুম না, কেমন আছেন ? দেখতেই তো পাচ্ছি ! বলতেও পারলুম না। ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন। ও কথার কোনও মানে হয় না। যার জীবন তিনিই জানেন কে কতদিন ভালো থাকবে। কে কখন ভালো হয়ে উঠবে। আমার পিতার তরফের শেষ প্রতিনিধি। যেই চলে যাবেন বন্ধ হয়ে যাবে বইয়ের মলাট। কেউ কোনও দিন আর খুলবে না। খোলার প্রয়োজন হবে না। বিছানার পাশে বসে রইলুম বহুক্ষণ। পিসিমার ভেতরে অদৃশ্য এক নৌকা বেয়ে চলেছে ঢেউ মোহানার দিকে। আমি যেন শুনতে পাচ্ছি দাঁড়ের শব্দ। জল-কল্লোলের শব্দ।

পথে নেমে এলুম। বড় অসহায় লাগছে নিজেকে। মানুষকে একদিন না একদিন যেতে হবে ঠিকই। কিন্তু এইভাবে কেন ? যাবে তো বিস্ফোরণের মতো যাও। ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মতো যাও। অথবা যে-ভাবে মানুষ বেড়াতে যায় সেইভাবে যাও। রেলগাড়ির জানালার ধারে মুখ বের করে বোস। হাসতে হাসতে হাত নাড়তে নাড়তে চলে যাও। আমরাও রুমাল নাড়ি, তুমিও রুমাল নাড়।

একটা হিসেব করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমার ছেলে শানুর বয়স এখন পাঁচ। তার মানে এখনও কুড়িটা বছর। কুড়ি বছর টেনে যেতে হবে। স্কুল কলেজ, জীবিকা। তারপর রাখে ভালো, টান মেরে ফেলে দেয় সেও ভালো। সে হবে ভয়ঙ্কর ভালো। কোথায় যাব। কোন আস্তানায় থাকব। তখন তো অথর্ব। লোলচর্ম। বিস্মৃতিপ্রবণ। ঘৃণিত এক বৃদ্ধ। দুটো জিনিস বর্তমান জগতে অতিশয় ঘৃণার, এক দারিদ্র্য, দুই বার্ধক্য। ঘৃণা নিয়েই মরতে হবে। সসম্মানে আর কজন যেতে পারে ! এই যে আমার পিসিমা। সবাই এখন ফিসফাস করছে, এই অবস্থায় যাওয়াই ভালো। ভালো হবার যখন আশা নেই তখন যাওয়াই ভালো। হিসেব তো মিলছে না আমার। কুড়িটা বছর আমাকে টাকার পাইপ লাইন ঠিক রাখতে হবে। কল ঘোরালেই যেন টাকা পড়ে। ছেলের নিজের

পায়ে দাঁড়ানো। দুটো মেয়ের প্রায় একই সঙ্গে বিয়ে। এর মধ্যে কতবার সব অসুখে পড়বে। চিত্রার অপারেশান। মেয়েদের একটা না একটা বড় রকমের অপারেশান হবেই হবে। এমন খুব কম বউই আছে যারা অক্ষত জীবন শেষ করেছে। বলা তো যায় না। যদি ব্রেস্ট ক্যানসার হয়। ইউটেরাসে ক্যান্সার! হবে না, একথা তো জোর করে বলা যায় না। আমারও তো ক্যান্সার হতে পারে। আজকাল তো প্রতি পাঁচজনে একজনের ক্যান্সার।
ভীষণ ভয়। এখন চিত্রা যদি আমার আগে চলে যায়। আমি নিঃসঙ্গ। আর আমি যদি আগে যাই। চিত্রা কি করে সামলাবে। পুরো পরিবার ভেসে যাবে। ছেলেটা বদসঙ্গে পড়ে বখে যাবে। আজকাল তো দুটো ভবিষ্যৎ মানুষের ছেলের। হয় মানুষ হও, না হয় গুণ্ডা হও। গুণ্ডারা যেন চৌবাচ্চার কই মাছ। নেতারা এসে বেছে বেছে তুলে নেবেন। মদত দেবেন। শেল্টার দেবেন। নেতারা হলেন রাজনীতির ইস্কুপ। গুণ্ডারা হল স্ক্রু ড্রাইভার। গদির প্লাইউডে ফিট করে দেবে। বাঁচবে না বেশি দিন। অপঘাতেই মরবে। তবু তো জীবিকা। বোম মেরে, ছুরি মেরে বাঁচা অথবা মরা। তা বীরই বলা চলে। মেয়ে দুটোরই বা কি করবে চিত্রা। প্রেম তো করবেই করবে। দেখতে শুনতে কেউ খারাপ নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা যেমন হবেই হবে, প্রেমও হবে। বিয়ে হবে। তারপর ডিভোর্স। এক নম্বর স্বামী। স্বামী নম্বর দুই। তিন, চার। আজকাল একটা গান কানে আসে। এক, দো তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট, নয় দশ এগারো বারহ। মনে হয় ওটা বিয়েরই গান। চিত্রা যায় যাক, শিবির আগলে আমাকেই বসে থাকতে হবে। যুগকে ঠেকাতে পারব না। তবু চেষ্টা।
বেঁচে থাকাটা কি সাংঘাতিক ভয়ের। আগুন নিয়ে খেলা। অপরেশ এল ম্লান মুখে। সুন্দর চেহারা ছিল। অভিনয় করত এক সময় সখের থিয়েটারে। প্রাইভেট ফার্মে ভালো চাকরি করত। আজ

টান। তিন বছর প্রতিষ্ঠান বন্ধ। আজকাল এটা খুব জরুরী। কলকারখানা বন্ধ না হলে মানুষের ভালো হবে না। যেমন অপরেশের হচ্ছে। কাঠের মতো শরীর হয়েছে। লোহার মতো মুখ। কত রকমের চেষ্টা করছে সংসার চালাবার জন্যে। কিছু আর বাকি নেই। কোনওটাই তেমন লাগছে না।

অপরেশ চিত্রাকে বলছে—'ছেঁড়া খোঁড়া, ফেলে দিলেই হয় এইরকম দু'একটা শাড়ি আছে? বড় উপকার হয়।' আমার চোখে জল এসে গেল। পুরুষ মানুষের কাঁদা উচিত নয়। কি করব চোখের জল যে চাপতে পারি না। এই অপরেশ আমার বাল্যবন্ধু। একই সঙ্গে জীবন শুরু করেছি। একই স্কুলে পড়েছি। একই মাঠে খেলেছি। অপরেশের কি প্রাণ ছিল। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সবাই তাকে ত্যাগ করেছে। ওই যে বললুম, দারিদ্র্য বড় ঘৃণার।

চিত্রা দু'টো নতুন শাড়ি অপরেশকে দিতে গেল। অপরেশ হাত জোড় করে বললে, 'নতুন শাড়ি চাই না বউঠান। ছেঁড়াখোঁড়া থাকে তো দিন। যা আপনি ফেলে দেবেন বা বাসনঅলাকে দিয়ে দেবেন।'

কিছুতেই নিলে না নতুন শাড়ি। চিত্রা বোঝাতে বোঝাতে শেষে কেঁদেই ফেললে।

অপরেশ বললে, 'বউঠান, মন খারাপ করবেন না। জগতে কেউ ভালো থাকে, কেউ খারাপ থাকে। আবার আজ যে ভালো আছে, কাল সে খারাপ। দিনের এইটাই মজা। কখনও একরকম যায় না। চেষ্টাটাই বড় কথা। বেঁচে থাকার চেষ্টা। ভালো থাকার চেষ্টা। ভয় পেলে চলবে না। হাল ছাড়লে চলবে না। এইটাই তো পরীক্ষা। মানুষ নাগরদোলায় চেপে আনন্দ পায় কেন? ওই যে ওঠা-পড়ার ভয়ের আনন্দ।'

অপরেশ চলে গেল। তবু আমার ভয় গেল না। কতটা পথ এই একা একা যেতে হবে তা তো জানি না। সেদিন একটা আধপাগলা

লোক আমাদের রকে বসে আছে। প্রায় উদোম। পরনের ফুলপ্যাণ্ট কোলের ওপর ফেলে বোতাম বসাচ্ছে। আমাকে দেখে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'আমার আবার ভয় কি? আমার ছুঁচ সুতো, বোতাম সবই আছে। বোতাম ছিঁড়বে, নিজে নিজেই বসিয়ে নেব। আর যেদিন প্যাণ্টটাই ছিঁড়ে যাবে সেদিন কি করব! বোতাম তুমি বসবে কোথায়।' আমাকে বললে 'শোন'। কাছে গেলুম। খুব চুপিচুপি বললে—'দারা-পুত্র-পরিবার সবই হল বোতাম। বুঝলি ব্যাটা ফুলপ্যাণ্ট!'

সুরঞ্জনা

এক একজন থাকে ওইরকম। সবেতেই তাদের গোলমাল। যা কিছু করতে যাবে একটা কেলেঙ্কারি। কিছু করার নেই। বরাত। বরাত মানতেই হবে। আমি ভেবেছিলুম, বিয়েটিয়ে করব না। একা মানুষ. একমেবাদ্বিতীয়ম। প্রায় ব্রহ্মের মতো। যা সামান্য লেখাপড়া শিখেছি, তাই ভাঙিয়ে মোটামুটি একটা চাকরি জুটেছে। একা মজাসে থাকব। যা মাইনে পাই, ভাল-মন্দ খেয়ে বই পড়ে, গান শুনে, সিনেমা দেখে ভালই চলে যাবে। ওসব কথায় কান দোবো না, ব্যাচেলার লিভস লাইক এ প্রিন্স, ডাই লাইক এ ডগ। আরে মরতে তো হবেই, সে কুকুর-বেড়ালের মতো মরি, কি বউয়ের কোলে মাথা রেখে ছেলেদের কীর্তন শুনতে শুনতেই মরি। পরমগতি মৃত্যু। তার চেয়ে যদ্দিন বাঁচি সুখে বাঁচি।

ওই বরাত! বরাতে নেই কো ঘি ঠকঠকালে হবে কি? ফাঁদে পড়ে গেলুম। ইচ্ছে করেই পড়লুম, বোকার মতো। প্রেম, প্রেম একটা ভাব বয়েসকালে সব মানুষের ভেতরেই থাকে। গোঁফ বেরলো তো প্রেমের হুলও বেরলো। পাত্তা না দিলেই হয়। নড়ে নড়ে একসময় পক্ষাঘাত হয়ে যায়। বাতের ব্যথার মতো, সইতে সইতে সয়ে যায়। আমার তো তা হবার নয়। তাহলে বলি, কি ভাবে গর্তে পড়লুম।

পুজোর ফুল কিনতে গেছি। দেখি কি একটি মেয়ে মালা কিনছে। তা কিনছে কিনুক। আমার কি? আমি পাশটিতে দাঁড়ালুম। দরাদরি চলছে। জায়গাটা ঘিঞ্জি মতো। ফলঅলা, ফুলঅলা, সাইকেল রিকশা, বাস, এক গাদা লোক, সব একসঙ্গে গুঁতো গুঁতি। একটি মেয়ের পাশে দাঁড়ালে দেখতে ইচ্ছে করবেই, তাতে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হবে না। মনে হল, মেয়েটি বেশ সুন্দরী। ছিপছিপে লম্বা। ফর্সা। বড় বড় তারার মতো চোখ। ঘাড়ের কাছে সকালের

এলো খোঁপা। নীল ফিনফিনে শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে কবিতার মতো মনে হতে লাগল। মেয়েটি একবার মাত্র আমার দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবলুম লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট শুনেই এলুম। হবে না কি! ওই এক তাকানোতেই মোহিত হয়ে যেতে পারে নাকি। আমার কিন্তু হয়েছে। আমি প্রেমে পড়ে গেছি। একেবারে ভরা ডুবি। আমি তখন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছি। আমার মন মেয়েটির খোঁপার কাছে প্রজাপতির মতো উড়ছে। মীর্জা গালিবের মতো অবস্থা আমার। আমার ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যদেবী যাই বলি না কেন আবির্ভূতা হলেন গরুর রূপ ধরে একটা গরু হঠাৎ দমকা বেগে আমাদের পেছন দিয়ে যেতে গিয়ে তার সুডৌল নিতম্ব দিয়ে আমাদের একটু ঠেলা মারলেন। আমি সামলাতে পারলেও মেয়েটি সামনে হুমড়ি খেয়ে ফুলের ওপর পড়ে যাচ্ছিল। আমি চট করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললুম। ধরে সোজা করে দিলুম। দিয়েই ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আর করব না। পড়ে যাচ্ছিলেন তো, তাই হাতটাকে সামলাতে পারিনি।'

মেয়েটি হেসে ফেলল। ফুল, আর মালা নিয়ে চলে যাবার সময় ফুলঅলাকে বলে গেল, 'আমি কিন্তু কাল ঠিক আটটার সময় আসবো, তিনটে একেবারে টাটকা মালা রেডি করে রাখবেন।' মেয়েটি চলে যাবার পর ফুলঅলা আমার দিকে তাকাবার একটু অবসর পেল। তিরিক্ষি মেজাজে বললে, 'কত'? কিছু ছেঁড়া ফুলের পাপড়ি, দুর্বো ঘাস, পাতামাতা দিয়ে একটা মোড়ক তৈরি করে দিলে। ফুল না বলে আবর্জনা বলাই ভাল। অথচ মেয়েটিকে কেমন বেছে বেছে সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া হল। তা দিক। মেয়েটি আমার মন ছুঁয়ে গেছে। হাতে দিয়ে গেছে স্পর্শ। সারাটা দিন মনে মনে ভাবলুম, বোম্বে ছবিতে এইভাবে কোনও মেয়েকে সাহায্য করলেই প্রেম হয়। আমার কেন হবে না! হতেও তো পারে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও বাড়তে লাগল। মেয়েটি আমাকে

একেবারে উস্তমখুস্তম করে মারল। যেই একটু ঘুম আসে অমনি মেয়েটি স্বপ্নে এসে দাঁড়ায়, খোঁপায় আবার ফুলের মালা। দাঁড়াবার সে আবার কি ভঙ্গি। যেন এক সম্রাজ্ঞী। যে-ইঁদুর যেচে কলে পড়বে তার আর কে কি করবে! আমার ফুলের দরকার ছিল না, তবু গিয়ে হাজির হলুম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে কিউরিসিটি কিলস এ ক্যাট। আমার মাস্টারমশাই প্রায়ই বলতেন। কৌতূহলই বেড়ালের মৃত্যুর কারণ। মেয়েটি আটটার সময় আসে কিনা! আমি আবার একটু সাজুগুজু করে ফেললুম। নিজেই হাসলুম। ফুল কিনতে যাচ্ছি, না বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এত সেজেগুজে কেউ সাতসকালে বাজারে যায় না। আবার সব খুলে ফেললুম। এ তো সিনেমার প্রেম নয়, বাস্তবের প্রেম। ফুলঅলার দোকানের সামনে কেউ নেই। আমিও কম হিসেবী নই। শুধু শুধু ফুল কিনবো না। আজ তো পুজোর ফুল নয়, প্রেমের ফুল। সে যদি আসে তবেই খরচ করব। অকারণে খরচ করব না। আমি টোকো ন্যাসপাতির ঝুড়ির ওপর ঝুঁকে পড়লুম। আর আড়ে আড়ে দেখছি, সে এল কিনা। হঠাৎ সে এল হুড়তে পুড়তে। দমকা বাতাসে চুল উড়ছে ফুরফুর করে। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। গলায় একটা চিকচিকে হার। হৃৎপিণ্ড আমার ছলাং করে উঠল। বয়েস বেশি হলে ওই এক লাফানিতেই মৃত্যু হত। আমি নেশার ঘোরে এগিয়ে গেলুম। মেয়েটি হাতব্যাগ থেকে টাকা বের করতে করতে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মধু মেশানো গলায় বললে, 'ভাল আছেন?'

টাকা বের করতে গিয়ে কি একটা পড়ে গেল। ভগবান আছেন গো। আবার আমি সেবার সুযোগ পেয়ে গেলুম। ছোট্ট একটা লেডিজ রুমাল পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তুলে হাতে দিলুম। মেয়েটি অদ্ভুত একটা চোখের ভঙ্গি করে, গানের কলির মতো বললে, 'ধন্যবাদ!' সাবধান করে দিলুম, 'ওতে আর মুখ মুছবেন না।'

'না, না, সে আর বলতে।'

মেয়েটি এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, সেই অসভ্যটা কোথায়?'

'কোনটা? কোনটা?'

'সেই দামড়া গরুটা কোথায় গেল?'

সেটা আজ অন্য এলাকায় চরতে গেছে।'

মেয়েটি চলে যাবার সময় বলে গেল, 'আমি কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় আসব। চারটে জবার মালা একেবারে রেডি করে রাখবেন।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আসছি।'

বেশ কিছুক্ষণ চোখে চোখে রগড়ারগড়ি হয়ে গেল। আমি বললুম 'আসুন।'

সারারাত বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করলুম। মেয়েটি বেশ জোরে জোরে পরের দিনের আসার সময় কেন বলে? নিশ্চয়ই আমাকে শোনাবার জন্যে। আসবে, মালা নেবে চলে যাবে। অত বলার কি আছে? প্রেম। এরই নাম প্রেম। মেয়েটি আমার জীবনে এলে ধন্য হয়ে যাবো। যেন ছবি! আনন্দে আমার ভেতরটা প্রজাপতি হয়ে গেল। অদৃশ্য কোকিল ডেকে উঠল। নাম জানি না। কাল্পনিক একটা নামে বারকতক ডাকলুম। কল্পনার তেমন জোর নেই। নামটা বিশেষ সুবিধের হল না। সুধা, সুধা বললুম কয়েকবার। বলতে, বলতে পালকের মতো ঘুমিয়ে পড়লুম আমি।

পরের দিন ঈশ্বর আরও সহায় হলেন। মেয়েটির সবুজ শাড়ির তলার দিকটা ফুলের ঝুড়ির খোঁচায় আটকে গেল। ফুলসমেত ঝুড়িটা উলটে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে সেটাকে সামলালুম। তারপর নিচু হয়ে শাড়িটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। সাহসটাকে এক হ্যাঁচকায় বেশ বাড়িয়েছি। কি সুন্দর পা! এই কারণেই কবিতার লাইনকে বলে চরণ।

মেয়েটি রাজরানীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। শাড়িটাকে কায়দা করে ছাড়ালুম।

'ছিড়েছে ?'

'ছোট্ট একটা ফুটো হয়েছে।'

'আমার শাড়ি পরা উচিত নয়। এই নিয়ে সাতটা হল। এটা আমার মায়ের শাড়ি। পরার সময়েই বলেছিল, হ্যাঁ যাও, পারো তো ছিঁড়ে নিয়ে এসো। কি হবে ?'

'রিপু করা যায়। ইনভিজিব্‌ল রিপু। একেবারে বোঝাই যাবে না।'

'কোথায়, কোথায় ?'

'আমাদের দোকানে।'

মেয়েটি হাঁটছে। আমিও হাঁটছি। ফুলঅলা বললে, 'আপনার ফুল ? আপনি আবার কোথায় চললেন পেছন, পেছন। আচ্ছা ক্যাবলা তো !'

'আসছি, আসছি। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?'

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। 'যান ফুলটা নিয়ে আসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে বলতে ইচ্ছে করল, তুমি করুণাময়ী। কাল রাতে নাম রেখেছিলুম সুধা। তুমি করুণাময়ী। বেশ কিছুটা পথ দু'জনে নীরবে পাশাপাশি হাঁটলুম। মেয়েটি কি একটা গান গুন গুন করছে। বাজার এলাকার ভিড়ভাট্টা পেরিয়ে এসেছি। মেয়েটি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,

'আপনার বাড়ি কি এই দিকে ?'

'কই না তো।'

'তা হলে গুড়গুড় করে এদিকে চলেছেন কোথায় ?'

বেশ বিব্রত বোধ করলুম। পায়ের তলা থেকে হঠাৎ যেন জমি সরে গেল। কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। শেষে যা থাকে বরাতে। বললুম, 'আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে।'

'কাকে ?'

'আপনাকে ?' তারপর চোখ-কান বুজিয়ে বোমা ফাটানোর মতো

যোগ করলুম, 'আই লাভ ইউ।' ভেবেছিলুম মারবে এক চড়। মারল না। বললে, 'কি সর্বনাশ! কি হবে এখন?'

'আমি জানি না। আমার হয়ে গেছে।'

দুষ্টু দুষ্টু হেসে মেয়েটি বললে, 'আমারও একটু একটু হয়েছে। মা জানতে পারলে আমাকে পেটাবে।' মনটা একটু খারাপ হল। মা পেটাবে কেন? আমি কি লোফার না কি! আমার কোনও যোগ্যতা নেই না কি! দোবো একবার ফিরিস্তি! আমি কি ফক্কা প্রেমিক, না লক্কা প্রেমিক।

'আপনার মাকে গিয়ে প্রণাম করে আসি!'

'সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আগে পেটাপিটি হোক। জানাজানি হোক। দাদার নৃত্য হোক।

আপনার ওপর একটু ধুমধাম হোক। জিনিসটা আগে বেশ একটু জমে উঠুক।'

'দাদা কি খুব কড়া ধাতের মানুষ?'

'ও বাব্বা! দাদা আর মা, দু'জনেই সমান। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। আমার বাবা নেই তো! সি ই এস সি-র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন দু'বছর আগে। মেরেই ফেললে বোধহয়।' মেয়েটি মেঘ ভাসা শরতে নীল আকাশের দিকে উদাস তাকিয়ে রইল। পুজো যে এসে গেল। আজ সকালে শিশির পড়েছিল। মা দুর্গার চিঠির মতো ছোট ছোট অক্ষরে।

'মেরে ফেলল কেন বলছেন?'

'বাবা' কারেন্ট অফ্ করে একটা মেশিনে কাজ করছিলেন। হঠাৎ কে একজন স্যুইচ অন করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার অমন সুন্দর বাবা পুড়ে কাঠ হয়ে গেলেন। কত তদন্ত টদন্ত হল। দোষীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সবাই বললে, সুন্দর একটা চক্রান্ত। অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিলে। দাদাকে একটা চাকরি দিলে। সে আর কি হবে! আমার বাবাকে তো আমি আর কোনও দিন পাবো না।

বাবার সেই ডাক—সুরঞ্জনা প্লিজ। বাবা আমার প্রেমিক ছিলেন।'
সুরঞ্জন এইবার খুব দ্রুত হাঁটতে লাগল। কেউ যেন খুব পরিচিত গলায় ডাকছেন—'সুরঞ্জনা প্লিজ।'

॥ দুই ॥

অধ্যবসায় থাকলে কি না হয়। আদা-জল খেয়ে লাগতে পারলে সিদ্ধি হবেই। আমার পেছনে যাঁরা আসছেন প্রেমের পথ ধরে, আমি তাঁদের এই কথাটাই বলতে চাই। অনেকটা আমার জীবনই আমার বাণী গোছের একটা ব্যাপার। সুরঞ্জনার জন্যে পাগল হয়ে গেলুম। সুরঞ্জনার দাদা মেরে আমার খোলনলচে আলাদা করে দিক। সুরঞ্জনার মা আমার গায়ে গরম জল ঢেলে দিন। আলু সেদ্ধর মতো সেদ্ধ হয়ে যাই, মরে ভূত হয়ে যাই সেও ভি আচ্ছা। হৃদয়ে আমার হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। সুরঞ্জনা খুব ভাল নাচে। মহাজাতি সদনে ফাংশান। আমার সঙ্গে তখন তুমির সম্পর্ক। বললে, 'তুমি মহাজাতি সদনে চলে এসো। গ্রীনরুমে দেখা হবে। তারপর অনুষ্ঠান শেষ হলে দুজনে একটা ট্যাকসি করে একটু ঘুরেঘারে ফিরে আসবো। বেশ মজা হবে।'

মহাজাতি সদনে গিয়ে সাজঘরে খোঁজ করতেই আধ-সাজা অবস্থায় বেরিয়ে এল। পোশাক পরা হয়ে গেছে। চুল আর মুখের মেকআপটাই বাকি ছিল। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল! নাচে বলেই ফিগারটা অত ভাল! ঠিক এমন সাজে তো আগে দেখিনি। হাঁ হয়ে গেলুম।

কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, 'কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

সুন্দর বললে কোন মেয়ের না ভাল লাগে! সুরঞ্জনার মুখে একটা খুশির আমেজ ফুটল। হাত দিয়ে আমাকে দূরে ঠেলে দিতে দিতে বললে, 'কাছে এসো না। দিদি খুব কড়া। দেখে ফেললে তোমাকে যা তা বলবেন। তুমি সিটে গিয়ে বসো। প্রোগ্রাম শেষ হলে

তোমাকে ডেকে নেবো।'

অনুষ্ঠান শুরু হল। সুরঞ্জনা নাচল বটে। সেরা নাচ। সে কি হাত-তালি। আমার মনে হল পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত। তার পরেই মনে হল, এই মেয়ের স্বামী হবার কোনও যোগ্যতাই আমার নেই। মানে মানে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। অনুষ্ঠান শেষ হল। সুরঞ্জনা বেরিয়ে এল, 'চলো-চলো।' আর এক মিনিট দাঁড়ালেই দলে পড়ে যাবো।'

সুরঞ্জনার হাতে একটা ব্যাগ। ব্যাগটা আমি আমার কাঁধে ঝুলিয়ে নিলুম। জানি, ব্যাগে কি আছে! সুরঞ্জনার নাচের পোশাক। ঘুঙুর। মেকআপের জিনিস। মিষ্টি ব্যাগ। ব্যাগটাও যেন সুরঞ্জনা। আমার পাশে পাশে সুরঞ্জনা হাঁটছে। তার পা থেকে নাচের নেশা তখনও যায়নি। শরীরে তখনও তরঙ্গ খেলছে। একবার গায়ে গা ঠেকল। শরীর তখনও গরম হয়ে আছে। নাচের সময় সুরঞ্জনা যখন ঘুরছিল, আমি তখন তার পা দেখছি। পা দেখে পাগল হয়ে গেছি। সুরঞ্জনা যদি আমার হয়, আমি তাকে কতটা যত্নে রাখব, সে আমিই জানি। রোজ পদসেবা করব। দেবীর মতো ভক্তি করব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলুম। পেছনের আসনে প্রথম কয়েক কিলোমিটার আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। হঠাৎ সুরঞ্জনা সরে এল একেবারে আমার পাশে। একটা হাত রাখল আমার কাঁধে। ডান হাতটা ঝুলে পড়ল আমার বুকের কাছে। চাঁপার কলির মতো আঙুল। গোল কবজিতে সুন্দর সোনালি একটা ঘড়ি। পিঠে নেমেছে চুলের ঢল, রাতের কবিতার মতো। সুরঞ্জনা বললে, 'ভীষণ ক্লান্ত, জানো তো! স্টেজে কি ভীষণ গরম তোমার কোনও ধারণা নেই।'

সুরঞ্জনা মাথাটা আমার বাঁ কাঁধের ওপর ফেলে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'যা নাচ নাচলে তুমি! আমি হাঁ হয়ে গেছি।'
'নাচ বোলো না। বলো নৃত্য।'
ট্যাক্সি চলেছে ফাঁকা পথ ধরে হু হু করে। খুব ইচ্ছে করছে বাঁ হাত দিয়ে সুরঞ্জনার সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরে আরও কাছে টেনে নি। পেছনের আসনে খেলা করছে তরল অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলো এসে আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে খেলে খেলে চলে যাচ্ছে। ক্লান্ত ট্রাম ঘরে ফিরছে। পার্কসার্কাসে গজলের আসন বসেছে। স্কার্টপরা এক মহিলা চেনে বাঁধা সাদা কুকুর নিয়ে ফুটপাথে বেড়াচ্ছেন। রাত একেবারে রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। সুরঞ্জনা এক লাইন গুন গুন করে উঠল, 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে।' লাখনৌ রেস্তোরাঁয় রুমালি রুটি তৈরি হচ্ছে। কাঠ কয়লার আগুনে কাবাব চুনচুন করছে। এক লহমায় দৃশ্যটা দেখে সুরঞ্জনা বললে, 'যা খিদে পেয়েছে না!'
'গাড়ি ঘোরাতে বলব?'
'না বাবা। যারা বসে আছে তাদের মাঝে বসার সাহস আমার নেই।'
'কি খাবে বলো? বাঙালি রেস্তোরাঁয় যাবে?'
'রাত কত হল খেয়াল আছে? দাদা লাঠি হাতে বাড়ির বাইরে পায়চারি করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি।' গাড়ি আরও কিছুটা এগলো। সুরঞ্জনা বললে, 'আজ সারা রাত তুমি আমার কাছে থাকলে কত ভাল হত। পিয়ালশাখার ফাঁকে একখানি চাঁদ বাঁকা ওই, তুমি আর আমি শুধু বাসর জেগে রই। অনুষ্ঠানের রাতে আমার নিজেকে মনে হয় আনারকলি।'
'আজ আমার ভীষণ অবাক লাগছে সুরঞ্জনা, তুমি কেন আমাকে ভালবাসলে? তোমার মতো এত বড় একজন শিল্পী!'
'শিল্পী-টিল্পী জানি না। তোমাকে ভালবাসি একটা কারণে, তোমাকে ঠিক আমার বাবার মতো দেখতে।'

'তা হলে ?'

'তা হলে মানে ?'

'ওই একটা মাত্র কারণ হলে চটকে যেতে বেশি সময় লাগবে না। কেন জান ? ওই যে ছেলেটা তোমার সঙ্গে নাচছিল, সে আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য। আমি আত্মহত্যা করতে পারব না সুরঞ্জনা। আমি ভয়ঙ্কর ভীরু।'

'তোমার একটাই দোষ, পরেরটা অনেক আগেই ভেবে ফেল। যারা সঙ্গে নাচে তাদের বিয়ে করতে নেই। এক শিল্পী আর এক শিল্পীকে সহ্য করতে পারে না। ঠোকাঠুকি লেগে যায়। তা ছাড়া ও অনিতা বলে একটা মেয়েকে ভালবাসে। দয়া করে তুমি একটু কম ভাবো।'

সুরঞ্জনা আমার কাঁধে মাথা রেখে সারাটা পথ এল। বেশ কিছুটা দূরে নির্জন মতো একটা জায়গায় আমরা গাড়ি ছেড়ে দিলাম সুরঞ্জনা তার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। আমি সারা গায়ে তার স্পর্শ মেখে বাড়ি ফিরে এলুম শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, তবলাটা শিখলে কেমন হয়। আমার বোলে সুরঞ্জনার প নাচবে।

নাটক যে সেই রাতেই জমে উঠবে ভাবতেও পারিনি। একেই বলে, বিধির বিধান। একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। সদরের কড়া বাজল এই রাতে কে আবার এল। আমি দিদির কাছে থাকি। দিদি অধ্যাপিকা। তিন বছর হল জামাইবাবু কিডনি ফেল করে মারা গেছেন। নিঃসন্তান দিদির একজন অভিভাবক দরকার। আমি সেই হিসেবেই আছি। আমারও কলকাতায় একটা থাকার জায়গার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই দিদি আমাকে ভালবাসে।

দিদি নিজের বিছানা থেকে বললে, 'এত রাতে কে এল রে ! এই সময় তো পুলিস ছাড়া কেউ আসবে না। তুই নকশাল-টকশাল করছিস না তো ?'

'আমার সে সাহস নেই দিদি।'

দরজার কাছে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, 'কে?'

মেয়ের গলা, 'দরজা খোলো। আমি।'

দরজা খুললুম। সামনেই স্বরঞ্জনা। হাতে একটা বড় ব্যাগ; যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছে। আমাকে ঠেলে ভেতরে চলে এল।

দিদি জিজ্ঞেস করলে, 'কে রে শুভো?'

'স্বরঞ্জনা।'

স্বরঞ্জনা ততক্ষণে ঘরে চলে গেছে। ব্যাগটা একপাশে নামিয়ে রেখে সোজা বিছানার কাছে গিয়ে দিদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। স্বরঞ্জনাকে পাশে বসিয়ে দিদি বললে,

'কি হয়েছে?' কাঁদছ কেন?'

'আমি চলে এসেছি। আমাকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে? সে আবার কী। তাড়িয়ে দিল কেন? এত রাতে কেউ তাড়িয়ে দেয়!'

'আজ আমার নাচের প্রোগ্রাম ছিল। ফিরতে একটু দেরি হয়েছে। আমাদের দলের একজন আগে এসে লাগিয়ে দিয়েছে। ঢোকামাত্রই দাদা আমার গালে সপাটে এক চড় মেরে? হিন্দিতে বললে, নিকালো হিঁয়াসে। মা বললে চুলের মুটি ধরে টিল লঙ্গরের মতো ঘোরা। দাদা বললে, প্রেম হচ্ছে প্রেম। প্রেমের কর্মকার।

'তুমি শুভোর সঙ্গে ঘুরছিলে?'

'আমি ঘুরিনি। আমরা এক সঙ্গে বাড়িই ফিরছিলুম, একটু ঘুরপথে।'

'সেটা তো তাহলে একটু অন্যায়ই হয়েছে!'

'কেন অন্যায় হয়েছে কেন?'

তোমার যে এখনও বিয়ে হয়নি মা।'

'যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তার সঙ্গেই তো ঘুরেছি। অন্য কারোর সঙ্গে নয়। আমার এক মুঠো চুল ছিঁড়ে দিয়েছে দিদি, ওই শয়তানটা।'

'দাদাকে শয়তান বলতে নেই ছিঃ।'

'আপনি জানেন না, সেই ছেলেবেলা থেকেই ও আমার শত্রু নিজে ওর থেকে বয়েসে বড় এক মহিলার সঙ্গে ঘোরে। তার একবার বিয়ে হয়েছিল। ছাড়াছড়ি হয়ে গেছে। বিয়ে করার জন্য ফোঁস ফোঁস করছে। সে যদি এসে ঢোকে হয়ে গেল। সে যা জিনিস! আমি চলে এসেছি। একেবারেই চলে এসেছি। আর জীবনে যাবো না। কিছুতেই যাবো না। একেবারে সব পাট চুকিয়ে এসেছি। দু'জনেই বললে, যা, যা বেরো বেরো। কেমন তিল থেকে তাল করলে! আমি জানি, ওদের একটা খুব বদ মতলব আছে। সেই মতলবটা আমি ধরে ফেলেছি।'

'কি মতলব বোন?'

'সে আমি এখন বলতে পারব না। ব্যাপারটা খুবই খারাপ। আমি সোজা চলে এসেছি, আমার নিজের বাড়িতে। আমি আর ফিরব না।'

'ওরা যদি থানা-পুলিস করে?'

'আমিও কেস করব দাদার নামে। মেয়েদের গায়ে হাত তোলা একেবারে বার করে দোবো।'

সেই রাতেই আমাদের সভা বসে গেল। সুরঞ্জনা আধশোয়া হয়ে রইল দিদির বিছানায়। খুবই চিন্তার ব্যাপার। সুরঞ্জনা তো আর এমনি থাকতে পারবে না। বিয়ে করে বউ করে ঘরে রাখতে হবে দিদি বললে, 'যত তাড়াতাড়ি পারিস রেজিস্ট্রিটা করিয়ে নে। পাড়া দিনকতক সরগরম থাকবে। তা আর কি হবে! এমন একটা মুখরোচক ব্যাপার!'

'সবার আগে বোলপুরে বাবা আর মাকেও তো জানাতে হবে।'

'সে তো হবেই। তাঁদের অনুমতি ছাড়া তো কিছুই হবে না।'

সুরঞ্জনা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল, 'তার মানে, তাঁরা যদি অনুমতি না দেন, তাহলে যাবো কোথায়? আমাদের বিয়ে তো একরকম হয়েই গেছে। এতে আর অনুমতি নেবার কি আছে! আমরা

তাঁদের নিমন্ত্রণ করব। সব ঠিক হয়ে যাবার পর অনুমতি চাওয়া মানে অপমান করা। তাঁরা তো বলতেই পারেন, এ আবার কি আদিখ্যেতা!'

সবই ঠিক: কিন্তু ব্যাপারটাকে এমন ভাবে সাজাতে হবে—সাপও মরবে না লাঠিও ভাঙবে না। যাঁদের ছেলে তাঁরা জানবেন না? তুমি আমার কাছে থাকবে। শুভো বীরভূমে যাবে। বীরভূম থেকে বিয়ে করতে আসবে।' সুরঞ্জনা বললে, 'তবেই হয়েছে। সে বিয়ে আর হবে না। আমি তা হলে অন্যপথ দেখি। মানে মানে সরে পড়াই ভাল। ওঁরা না বললে, কি হবে? বিয়ে হবে?'

আমি বললুম, 'অবশ্যই হবে। তখন বিনা অনুমতিতেই হবে।'

'একটা আর খুঁত থাকে কেন? দেখাই যাক না কি হয়! দিদি ঠিক ম্যানেজ করে দেবে।'

'তোমরা করবে প্রেম আর আমি করব ম্যানেজ। দেখাই যাক কি হয়। বাবা খুব উদার মানুষ। আয় আমরা এখন শুয়ে পড়ি।'

সুরঞ্জনা বললে, 'আমি চান করব।'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, তার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

দিদির ভাঁড়ার কখনও শূন্য থাকে না। সুরঞ্জনার মাঝ রাতের ভোজ নেহাত মন্দ হল না। খাওয়ার পরেই তার মনের ফূর্তি ফিরে এল। প্রায় নাচের ছন্দেই চলে গেল আমার ঘরে। দরজা ভেজিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে শাড়ি পাল্টান হল। আমি যখন শুতে এলুম সারা ঘরে মেয়েলী গন্ধ ভাসছে। বিছানায় লুটিয়ে আছে সিল্কের শাড়ি। সোফার ওপর ব্লাউজ, ব্রা! কোণের দিকে ব্যাগটা মুখ খোলা। টেবিলের ওপর চিরুনি। মুখে ক্লিনসিং ক্রিম মেখেছে ছিপিটা খোলা। বেশ বোঝাই যায় বউ ঢুকেছিল ঘরে। সব এক এক করে গুছিয়ে রাখলুম। চুল বাঁধার ফিতে আর চিরুনিটা একটা বাক্সে ফেলে রাখলুম। শুয়ে আছি। সুরঞ্জনা দিদির পাশে শুয়ে

শুয়ে গজর গজর করছে। মাঝে মাঝে হাসছে, খিলখিল করে। মেয়েরা কত সহজে সব কিছু ভুলে যেতে পারে।

সকাল বেলাই সুরঞ্জনার যমদূতের মতো দাদা এসে হাজির. বোনের হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে বললে 'বাড়ি চল। মা ডাকছে।'

সুরঞ্জনা বললে, 'হাত ছাড়! এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।'

'হ্যাঁ ভদ্রলোক তো বটেই। একটা মেয়েকে ফুসলে এনে ভদ্রলোক!'

দিদি বললে, 'একটু ভদ্র ভাষা কি আশা করা যায় না! আপনাব বোনকে তো কাল রাতে মেরে বের করে দিয়েছিলেন, তখন মনে ছিল না!'

'আমাদের মেয়ে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। শাসনের অধিকার আমাদের আছে।'

সুরঞ্জনা বললে, 'এখানে গলাবাজি কোরো না। নিজের খোঁয়াড়ে গিয়ে যত পার চেল্লাও।'

'তুই যাবি কিনা?'

না, না, না।

'তাহলে আমাকে পুলিসের সাহায্যই নিতে হচ্ছে।'

'পুলিস কিছুই করতে পারবে না। আমি সাবালিকা।'

'তাহলে আমি আমার দলের ছেলেদের নিয়ে আসি।'

'আমরা তাহলে থানাই যাই।'

দিদি বললে, 'আপনাদের আর কিছুই করার নেই এরা বিয়ে করবেই।'

'ঠিক আছে বিয়ে আমি করাচ্ছি। পরপারে গিয়ে বিয়ে হবে। পার্টির ছেলেদের খবর দিচ্ছি।' দিদি হেসে বললে, 'এর মধ্যেও পার্টি!'

'যা খুশি তাই করার অধিকার আপনাদের নেই।'

'দেখাই যাক।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন মার্চ করতে করতে। সুরঞ্জনা হাসতে হাসতে বললে, 'আঃ এইটাই চেয়েছিলুম। বেশ জমে গেছে।'

দিদি বললে, 'আশ্চর্য মেয়ে তুই হাসছিস কি বলে ?'
'হাসব না ! যেমন মোষের মতো চেহারা, তেমনি তার ব্যবহার। ওর খাটালে থাকাই উচিত।'
'ও বাধা দিচ্ছে কেন ? শুভো তো পাত্র হিসেবে খারাপ নয়।'
'স্রেফ দাদাগিরি ফলাচ্ছে। বাবা নেই তো, অভিভাবক হয়েছেন আর কি ! দাঙ্গা হাঙ্গামা একটা করবেই।'
'সে কি রে ?'
'করুক না। যা পারে করে নিক। মায়ের পেয়ারের ছেলে।'
সুরঞ্জনা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার ভয় করছে ?'
'মোটেই না। ধরে মারবে তো ! মারুক না।'
দিদি বললে, 'চল, আমরা তিন জনেই বীরভূমে যাই। সকালের ট্রেনেই। লোক হাসাহাসি করার চেয়ে ভাল।'
'ভয়ে পালাবে দিদি !'
'একে পালানো বলে না। বলে স্ট্র্যাটেজি।'

॥ তিন ॥

অনেক দিন পরে বীরভূমে এলুম। মা-বাবার কথা যেন প্রায় ভুলেই ছিলুম। একজন ছেলের পক্ষে এটা খুবই অন্যায়। কেমন যেন লজ্জা, লজ্জা করছিল। তার ওপর সঙ্গে আবার সুন্দরী এক মেয়ে। গ্রামে এসেছে সুরঞ্জনা। তার কি আনন্দ ! শরৎ পরিপূর্ণ ফুটেছে। পুকুরের জলে। কাশফুলে আকাশের মেঘে।' আমার মন কিন্তু মরে আসছে যতই এগোচ্ছি বাড়ির দিকে। দিদি নির্বাক। সুরঞ্জনা একের পর এক গান ধরছে আর ছাড়ছে।
বাড়ির সামনে এসে সুরঞ্জনা লাফিয়ে উঠল, 'আরেব্বাস ! এ তো জমিদার বাড়ি।'
সত্যিই বাড়িটা আমাদের বিশাল। ঠাকুর্দার আমলের। কথায় আছে, এক পুরুষে করে যায় পরের পুরুষে ওড়ায়। আমার বাবা নামকরা

ডাক্তার। তিনি ধরে রাখতে পেরেছেন। এখনও দোল-দুর্গোৎসব হয় ঘটা করে। চণ্ডীমণ্ডপ ডান হাতে রেখে আমরা বিশাল দেউড়ি পেরিয়ে দালানে উঠলুম।

মলয়দা মাদুর পেতে বসে আছেন। চার-পাঁচটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘিরে আছে। মলয়দার অবৈতনিক বিদ্যালয়। মলয়দার চুল আরও কিছুটা পেকেছে। চেহারা সে আগের মতোই আছে। টসকায় নি।

মলয়দা আমাদের দেখে লাফিয়ে উঠল, 'কি ব্যাপার তোমরা ?'

দিদি বললে, 'হ্যাঁ আমরা। আপনি অমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন কেন ?'

'কর্তা মশাই যে আজ সকালে তোমাদের ওখানেই গেলেন।'

'সে কি ? হঠাৎ ডাক্তারি ফেলে চেম্বার ফেলে, সাত সকালে ; মা কোথায় ?'

'মা তো আজ তিনদিন হল বিছানায়। কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে ; ছাড়ছে আবার আসছে। যাও না ভেতরে যাও।'

'এখন বাবার কি হবে ? গিয়ে তো দেখবেন তালা ঝুলছে। কেলেঙ্কারি হয়ে গেল। কেন গেলেন ?'

'ওই যে খুব একটা সুখবর আছে। শুভোর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।'

'কার সঙ্গে ? শুভো জানে না বিয়ের ঠিক হয়ে গেল ! কার সঙ্গে ?'

'নৃপেনবাবুর ছোট মেয়ের সঙ্গে। ওই যে নৃপেন উকিল। খুব নামকরা।'

'যাঃ ! সব গোলমাল হয়ে গেল।'

'ও সব ঠিক হয়ে যাবে। কর্তামশাইয়ের কলকাতায় আলো থাকার জায়গা আছে। কাল সকালেই ফিরে আসবেন ; কিছু দরকারি কেনাকাটাও আছে। তোমরা ভেতরে চলো আমি আসছি। এই মেয়েটিকে তো চিনতে পারলুম না।'

'এর নাম সুরঞ্জনা। শুভোর বউ।'

অ্যাঁ। শুভোর বউ। কবে বিয়ে হল ? আমরা জানতেও পারলুম না !'

'কাল গভীর রাতে বিয়ে গেছে।'
'সে কী! কর্তাবাবু, কর্তা মায়ের অমতে?'
'কেন, বউ খারাপ হয়েছে? আমার মতে হয়েছে।'
'ওরে বাপরে! এ মেয়ে তো রূপসী। সিনেমার নায়িকার মতো। কোথায় লাগে নৃপেনবাবুর ছোট মেয়ে। সে তো ঘোড়ার মতো দৌড়য়। জিমন্যাস্টিক করে। ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান। এ বউ বেশ ভাল হয়েছে। যাও যাও ভেতরে যাও, আমি এদের ছুটি দিয়ে আসছি।'
ভেতরের উঠোন পেরতে পেরতে সুরঞ্জনা বললে, 'আমার সামনে এখন একটাই পথ আত্মহত্যা। ডান পাশের দীঘিটা ভারি সুন্দর। ওইখানেই ভেসে উঠবে আমার দেহ। উঃ একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বিয়ে করবে, তাও কত বাধা!'
দিদি বললে, 'তুই ভাবছিস কেন? আমরা মাকে হাত করে ফেলব. সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার মা প্রেম বোঝে। সেই যুগে মায়ের সঙ্গে বাবার ভালবাসা হয়েছিল। সেই নিয়ে আমরা এখন কত হাসাহাসি করি। ঠাকুর্দা বাবাকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনিই আবার মায়ের কোলে মাথা রেখে নব্বই বছর বয়সে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। যাবার সময় মাকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন, আমার চিনতে ভুল হয়েছিল, দেবীকে ভেবেছিলুম মানবী।'
আমাদের সেই বিশাল শোবার ঘর। পাথরের টুকরো বসানো মেঝে। বিশাল বাঘ থাবা পালঙ্কে পিঠে বালিশের থাকে ঠেসান দিয়ে মা বসে আছে। পায়ের ওপর পাতলা একটা চাদর। জ্বরে একটু রোগা দেখালেও মা আমার সুন্দরী। সুরঞ্জনার সঙ্গে মিল আছে।
দিদি ভনিতা না করেই বললে, 'এর নাম সুরঞ্জনা। শুভোর আর আমার পছন্দ।'
সুরঞ্জনা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। মা হাতের ভঙ্গি করলেন। কোনও কথা নেই। সুরঞ্জনাকে দেখছেন। আমার আর দিদির নিঃশ্বাস বন্ধ। সুরঞ্জনা

ভয়ে জড়সড়। মুখ নিচু। নাকছাবির পাথরটা ঝিলিক মারছে।
মা বললেন, 'হুঁ! তাহলে এই ব্যাপার।'
সুরঞ্জনা হঠাৎ মায়ের কোলে মাথা গুঁজে ফোঁস ফোঁস করে ফুলতে লাগল। তারই মাঝে কোনওরকমে বলল, 'শুভোকে আমি ভীষণ ভালবাসি। আমার কেউ নেই। তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।'
মায়ের দুটো হাত সুরঞ্জনার চওড়া পিঠে পড়ি পড়ি করছে। হাত দুটো পিঠে পড়লেই, জানি মঞ্জুর হয়ে গেল। আর ভাবনা নেই। হাত দুটো ধীরে নেমে এল। একটা হাত পিঠে। একটা মাথায়। ওই মাথার হাতটাতেই কাজ হবে।
সুরঞ্জনা, 'মা', বলে অদ্ভুত একটা ডাক ছাড়ল। মন্দিরে মায়ের মূর্তির সামনে ভক্ত যে ভাবে ভাবাবেগে ডাকে। দুহাত দিয়ে মায়ের কোমরটা জড়িয়ে ধরল। কি পাজি মেয়ে। মাকে বোধহয় সুড়সুড়ি দিয়েছে! মা বলছেন, 'ওরে ছাড় ছাড় সুড়সুড়ি লাগছে।'
সুরঞ্জনা বললে, 'না, তোমাকে আমি ছাড়ব না। আগে আমাকে মেয়ে করবে কি না বলো?'
'একটা শর্ত। আজ বিকেলে আমার জ্বর যদি না আসে।'
সুরঞ্জনা কোল থেকে মাথা তুলে বলল, 'আমি বলছি, জ্বর আজ আসবে না।'
দিদি বললে, 'মেয়ে খুব গুণের। লেখাপড়া তো জানেই, আবার বড় নাচিয়ে।'
'নাচিয়ে তো বটেই, তা না হলে শুভোর মতো ছেলেকে নাচাতে পারে। যে সন্ন্যাসী হব বলেছিল সে সংসারী হয়ে ফিরে এল।'
'নৃপেনবাবুর গেছো মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধটা তুমি করেছিলে।'
'কর্তা। আমার মত নেই।''
'যাক বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।'
'এখনও ছাড়েনি। কর্তা না ফেরা পর্যন্ত ছাড়বে না। কর্তা এককথার

মানুষ। টনটনে মানসম্মান জ্ঞান।'
'তুমি আমাদের দিকে আছ তো!'

॥ চার ॥

ফিরলে ছটা নাগাদ ফিরবেন। আমরা দম বন্ধ করে বসে আছি। অপরাধ তো করেই ফেলেছি। সুরঞ্জনাকে তো বের করেই এনেছি। যথেষ্ট নোঙরা কাজ। সন্ধের প্রথম শাঁখটা বাজল। এই আসেন, এই আসেন। এলেন। গাড়ি থামল। দিদিই এগিয়ে গেল প্রথমে। বাবা দিদিকে ভীষণ ভালবাসেন। মলয়দা জিনিসপত্র নামাতে শুরু করেছেন।

দিদিকে দেখে বাবা বললেন, 'আশ্চর্য মেয়ে! এত বড় একটা তালা ঝুলিয়ে চলে—

বাবাকে জড়িয়ে ধরে দিদি বললে, 'কতদিন দেখি নি তোমায়!'

আমি প্রণাম করলুম। বাবা বললেন, 'এই যে দামড়া তোমাকেই আমি ধরতে গিয়েছিলুম। যাক নিজেই এসে ফাঁদে ধরা দিলে।'

সুরঞ্জনা প্রণাম করতেই বললেন, 'বাঃ, মেয়েটি কে? যেন পার্বতী।'

দিদি বললে, 'সত্যিই পার্বতী। বড় ড্যানসার। কেমন মেয়েটা?'

'খুব ভাল। আমার পুত্রবধূ করতে ইচ্ছে করছে।'

'তাই না কি? তুমি তো নৃপেনবাবুর মেয়েকে ঠিক করে এসেছ?'

'তখন তো একে দেখিনি।'

'তাহলে নাও। এই তোমার পুত্রবধূ। সব ছেড়ে চলে এসেছে!'

'সেটা তো খুব অন্যায়। গৃহত্যাগ করা তো ঠিক নয়।'

'বেচারার আর কোনও উপায় ছিল না।'

সেদিন সন্ধেবেলা মায়ের সত্যিই জ্বর এল না। সুরঞ্জনা বললে, 'প্রার্থনার জোরে কি না হয়।'

রাতে নাচের আসর বসল হলঘরে। মলয়দা সবকটা ঝাড় জ্বেলে দিলেন। হেমন্তের শীত শীত বাতাস। অনেকদিন পরে জলসাঘরে

আসর পড়ল। মা একটা পাতলা চাদর গায়ে দিদির পাশে বসে আছেন। কয়েকজন গণমান্য এসেছেন। এসেছেন নৃপেনবাবু। বাদ্যযন্ত্রীরাও এসেছেন। মলয়দা নিয়ে এসেছেন। সুরঞ্জনার নাচ শুরু হল। প্রাণমন দিয়ে নাচছে উর্বশীর মতো। যেমন পায়ের কাজ, তেমনি হাতের মুদ্রা। তেমনি চোখের ভঙ্গি। বাবা মাঝে মাঝে বলে উঠছেন, গুণী, গুণী।'

নাচের আসর দশটায় শেষ হল। বড় দালানে সবাই খেতে বসেছেন। খাঁটি ঘিয়ে লুচি ভাজা হচ্ছে। গন্ধে বাড়ি ভরে গেছে। হেমন্তের শিশিরের ওড়না গায়ে শীত আসছে। আকাশ ভরা তারা। ঘুঙুরের বোল তখনও বাতাসে ভাসছে। ফুলকো লুচিতে আঙুল ফোটাতেই ফস্ করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে গেল।

বাবা নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কেমন নাচল ?'

নৃপেনবাবুর উচ্ছ্বসিত, 'অপূর্ব, অপূর্ব একেবারে অপ্সরা।'

'মেয়েটিকে যদি পুত্রবধূ করি তোমার আপত্তি আছে ?'

ক্ষণকাল নীরব থাকলেন নৃপেনবাবু। মুখের উজ্জ্বলতা ম্লান হল। উদাস ঠোঁটে ঠেকে রইল লুচির সাদা টুকরো। অবশেষে বললেন, 'কিছুমাত্র না ?'

আমার বিয়ে না করাই উচিত ছিল। পারি নি। সুরঞ্জনা আমায় ছাড়েনি। অবসরে, নির্জনে আমার চোখে ভাসে নৃপেনবাবুর সেই মুখ। আর দেখতে পাই শ্যামলা একটি মেয়েকে, সবাইকে ছাড়িয়ে সে প্রাণপণে ছুটছে একটা ফিতেয় বুক ঠেকাতে।

পদকে নই পদানত

'পি. এম. আসছেন। পি. এম।' চার লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে সুবিশাল এক তোরণ। সারা ভারতে যেখানে যত তোরণ আছে সেইসব তোরণের ডিজাইন জগাখিচুড়ি করে বিরাট এক ভাস্কর এটি নির্মাণ করেছেন দেশলাই কাঠ আর কাগজ জুড়ে। টেম্পোরারি ব্যাপার তো। ঘণ্টা তিনেক পরে এই তোরণের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। তখন এইটাতে আগুন ধরিয়ে 'বনফায়ার' হবে। অলিম্পিক 'বনফায়ার'। সাতমণ ঘি ঢেলে একটা মহাযজ্ঞও হবে। চলবে তিনদিন।

ভারতবর্ষের নামে সঙ্কল্প করে শুরু হবে 'হুমন'। প্রার্থনা করা হবে পরবর্তী অলিম্পিকে ভারতের খোসনলচে যেন একেবারে খুলে পড়ে। খুলে পড়ে মানে, টেংরি খুলে দৌড়তে হবে। গোল্ড, গোল্ড না হলে সিলভার, সিলভার না হলে ব্রোঞ্জ। তাতে যদি টেংরি কাঁধে করে দেশে ফিরতে হয় সেও ভি আচ্ছা। খালি হাতে ফিরলে পশ্চিমবাংলায় নির্বাসন।

প্রেস অ্যাডভাইসার বিনীত ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পি. এম. স্যার পশ্চিমবাংলায় কেন স্যার!'

পি. এম. বলেছিলেন, 'সারা ভারতে ওইটাই একমাত্র রাজ্য যা কেন্দ্রের বাইরে। কেন্দ্রের বাইরে মানে ভারতের বাইরে। সেণ্টারের স্টেপডটার। সৎমায়ের কন্যা। নরক বলা চলে। সারা দিন রাত ওখানে ধেই ধেই নৃত্য আর হরিনাম সংকীর্তন চলেছে। ওখানে রিভলভারধারী পুলিস মাস্তানের ভয়ে ছুটে পালান। সেখানে পুলিসে চোর ধরে না, চোরে পুলিশ ধরে। নেতায় নেতায় লেজ কামড়া কামড়ি হয়। সর্বোচ্চ অফিসার ইউনিয়নের ক্লাস ফোর নেতাকে স্যার বলে সম্বোধন করেন। না করলে তাঁর চেয়ার চলে যায়। সেই

রাজ্যের সমস্ত রাজপথ ঢেউ খেলানো। সাত হাত অন্তর পলিটিক্যাল হাম্প। আমাকে একবার নিয়ে গিয়েছিল কোন এক চেম্বারের জুবিলিতে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা এসে খবর দিলে, যে পথে যেতে হবে সেই পথে মোট দেড়শোটা পলিটিক্যাল বাম্প আছে।'

'স্ট্রেঞ্জ, পলিটিক্যাল বাম্প, সেটা কি জিনিস?'

'উঃ, আপনাদের অজ্ঞতার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। পশ্চিমবাংলায় একটা বামজোট দেশ শাসন করছে, জানেন কি তা?'

'ইয়ে স্যার।'

'জানেন কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনও গাড়িই ট্যাফিক রুল মানেনা। মানানো যায় না। জানেন কি সেখানে গীতা, বেদান্ত, মার্কস, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, সব একসঙ্গে পরিপাক করে একটা হাঁড়িকাবাব তৈরি হয়েছে। লোক না পোক ভেবে ড্রাইভাররা রোজ দু'দশটাকে জামা পাল্টে ছেড়ে দেয়।'

'জামা পালটানোটা কি স্যার!'

'অ, আপনি তো আবার ইংলিশ-মিডিয়াম। কাল থেকে দু'পাতা করে গীতা পড়ার অভ্যাস করুন। পড়া উচিত। কাজে লাগবে। কবে আছি মশাই কবে নেই। পশ্চিমবাংলার যুবকরা ভারি সুন্দর একটা কথা বলে, মায়ের ভোগে চলে যাওয়া। ব্যাপারটা কি জানেন, মরে যাওয়া। গীতা, বেদান্ত আর মার্কস তিনটেকে এরা একেবারে গুলে খেয়েছে।

গীতা বলছেন, মৃত্যু বলে কিছু নেই। শরীর হল একটা জামা। সেই জামা পরে আছে একটা আত্মা। এই আত্মা আবার কোন আত্মা! সেই অখণ্ড আত্মার অংশ। যাকে আমরা বলি পরমাত্মা। আপনি তো আবার ইকনমিকসের লোক। আপনাকে আত্মা বোঝাতে হলে ইকনমিকসের উদাহরণ দিতে হবে। আত্মার ব্যাপারটা বোঝানোর সহজ উপায় হল, আমাদের মনিটারি সিসটেম।

আমাদের কারেন্সি হল পরমাত্মা, আর এই ষাট কোটি আত্মা হল

টাকা, দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা, পঁচিশ পয়সা। নানা মূল্যের রেজগি আর কি। সেই একের সঙ্গে যার সম্পর্ক। এক হইতেই বহু, বহু হইতেই এক। আত্মার সর্বাধুনিক মনিটারি ডেফিনিসান। শরীররূপ জামা পরা আত্মা চাকার তলায় পড়া মানে দুঃখের কিছু নয়। জামা পালটানো। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আবার নানা জাতে বিভক্ত, যেমন কংগ্রেস, সি পি এম, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি অ্যাণ্ড সো অন। চাপা পড়লেই আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ সমাধান, হাম্প।· কংগ্রেস হাম্প, সি পি এম হাম্প, ফরোয়ার্ড ব্লক হাম্প। একে বলে বাম্পইজম বা হাম্পইজম।

'তা আপনি স্যার সেই হাম্পের ওপর দিয়ে জাম্প খেতে খেতে গেলেন?'

'না হে না। আমাদের ক্ষৌরকার গিয়ে সব চেঁছে সাফ করে দিয়ে এল। যাক কাল থেকে গীতা পড়বেন। মনে রাখবেন আমাদের পিছনে শমন। পাঞ্জাবে টেররিস্ট। যে কোনওদিন আমাদেরও মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিতে পারে। গীতাই আমাদের একমাত্র ভরসা। গোরবাচেভও কিছু নয়, বোফর্সও কিছু নয়। আসল হল সেই, নৈনং ছিন্দন্তি···পরের লাইন, নেকস্ট লাইন, কাম অন, কাম অন।'

'পরের লাইনটা স্যার, দাঁড়ান আমি লিটারারি অ্যাডভাইসারকে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।'

'দেখেছেন, আপনারা আমাকে ঠিক মতো ব্রিফ করতে পারেন না। এটা আমার ফরেন প্রেস কনফারেন্স হলে, আমার ভাবমূর্তিটা কি দাঁড়াতো, একবার ভেবে দেখেছেন? ফাম্বলিং ফর লাইনস। আবার আমাকে একটা রিশাফলিং করতে হবে। আপনার জায়গায় আমাকে গজেন্দ্র গদাধরকে আনতে হবে। না, ছেলেটা হোপলেস। রোহিণী ক্যাটাপুল্টকেই নিয়ে আসি।'

পি. এম. একেবারে খাপ্পা হয়ে আছেন। সর্ব ব্যাপারে তিতিবিরক্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে গেছেন। স্বপ্নের ভারত তাঁর দু'হাজার এক অব্দের ভারত, গ্রাউণ্ড কনট্রোলের নিয়ন্ত্রণ হারা স্পেস ক্র্যাফটের

মতো মহাকাশের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে। অর্থনীতি ধেবড়ে গেছে। রাজনীতি জেবড়ে গেছে। সমাজনীতি থেবড়ে গেছে। ল অ্যাণ্ড অর্ডার বমকে গেছে। আদর্শ চটকে গেছে।
জাতীয়তা হড়কে গেছে। সম্প্রীতি সড়কে গেছে। সংস্কৃতি ল্যাংটো হয়ে গেছে! আর স্পোর্টস পটকে গেছে। সব যেন মামার বাড়ি ভেবে বসে আছে। তাই তাই তাই মামাবাড়ি যাই। মামি দিল নীল পাখি গীত শুনি ভাই। 'আমার স্ত্রী কি হোল কানট্রির মামি। ভোট দিয়ে তক্তে বসিয়ে এখন ভোট কম্বল চাপা দিয়ে কিলোবার চেষ্টা। 'ফায়ার' প্রেস অ্যাডভাইসার চমকে উঠে বললেন, 'কোন কামানে স্যার! বোফর্স গান।'
পি. এম. এমনি মিষ্টি মানুষ। জোর করে দেশ-শাসনে বসিয়ে না দিলে এক নম্বর ফিল্মস্টার হতে পারতেন। তখন সাউথের সি. এম.-দের জারিজুরি খাটত না। দেবতা সেজে ভোট কামড়ানো বেরিয়ে যেত। সন্ন্যাসী সেজে ত্যাগী ভোগী আর হতে হত না। কিন্তু পি. এম. একবার রেগে গেলে তখন আর তিনি কারোর নন। তখন একমাত্র ফার্স্ট লেডিই তাঁকে সামলাতে পারেন। ক্ল্যাসিক্যাল গান শুনিয়ে, ইতালিয়ান রাগিনীতে। পি. এম. পাথরের মতো মুখ করে প্রেস অ্যাডভাইসারকে বললেন, 'প্রথম গোটা দুয়েক লাইন ভুলে গেছি, মোদ্দা কথা হল, মূর্খরা যত কম কথা বলে ততই তাদের মানায়। আপনি দয়া করে আসুন। রাত হয়েছে। পারেন তো একটু হোম ওয়ার্ক করুন। আপনাদের অজ্ঞতা মানে আমার অজ্ঞতা। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট।' রাত আড়াইটের সময় পি. এম. আরাম কেদারায় বসে একটা ডিকটেশন দিলেন, ভারতীয় অলিম্পিক 'কমিটির কাছে,' আপনাদের অপদার্থতায় আমার পিত্তি চটে গেছে। গদি টানাটানি, আঁকড়াআঁকড়ি, কামড়াকামড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকি সত্য। বিরোধীদের সঙ্গে বক্সিং আমাকে এক মুহূর্তও রিং ছেড়ে বেরোতে দেয় না, ও ভি সত্য; কিন্তু জেনে রাখুন স্পোর্টস—ওয়ার্ল্ডের

সব খবর আমি রাখি। আমি ভারতকে যত এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, আপনারা সদলবলে ততই তাকে পেছিয়ে দেবার তালে আছেন। যেদিকটা আমি না দেখবো, সেই দিকটাই হড়কে যাবে। আবার সব ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে বিরোধীরা সমালোচনা করবেন—ব্যাটা ডিকটেটার। এখন, বোর্ডের মহামান্য সদস্যরা বলুন, সোলে আপনারা কি করে এলেন? বেশ বেড়িয়ে এলেন তাই না। ভাল ফুর্তি হল, কি বলুন। একটা ঘুঁটের মেডেলও বরাতে জুটল না! উত্তম। অতি উত্তম। রাশিয়া হলে আপনাদের কি করা হত জানেন? গুলাগে চালান দেওয়া হত। ভারত বলে বেঁচে গেলেন। কম্যুনিস্ট কান্ট্রি হলে কামড়ে ছিঁড়ে দিত। এই হল লাল আর সাদার পার্থক্য। এখন দেখছি সাদা দেশে আপনারা সব সফেদ হাতি। যাক, এই শেষ রাতে আমি সিদ্ধান্ত নিলুম খেলার ব্যাপারে আমি নাক গলাবো। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোতুম। সেই ঘুমও আমি বিসর্জন দিলুম দেশজননীর স্বার্থে। পুরো সিসটেমটাকে আমি ঢেলে সাজাবো। আপনাদের কোনও কথা শুনবো না। আপনাদের মুরোদ বোঝা গেছে। আমি এদিকে পলিটিকস করছি, আপনারা করছেন ওদিকে। আমার পলিটিকসে দেশ এগোচ্ছে, আপনাদের পলিটিকসে দেশ পেছোচ্ছে। কি খেলাই খেলছেন। আমাদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশবো। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই টেনিং দোবো। আমি সব পারি। প্রয়োজনে আমি ডিকটেটার হতে পারি, মাফিয়া হতে পারি, কম্যুনিস্ট হতে পারি। সোলে আপনারা আমার থোবনায় চুনকালি মাখিয়ে এসেছেন। আমি সব কর্মকর্তার টায়ার পাংচার করে দোবো। আমি আসছি।'

পি এম. আসছেন।

কর্মকর্তাদের একমাত্র ভরসা এই তোরণ। আমাদের পি. এম. শো-বিজনেস পছন্দ করেন। তোরণটি একেবারে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। এক ব্যাটেলিয়ান ব্ল্যাক-ক্যাট সিকিউরিটি চেক-আপের' ঠেলায় তিন

চার জায়গা ড্যামেজ করে দিয়েছে। সেই সব জায়গায় সোল অলিম্পিকের লোগো দিয়ে তালি মারা হয়েছে। পি. এম.-এর পিতৃ-পুরুষদের বড় বড় ছবি ঝোলানো হয়েছে। লাল গোলাপ দিয়ে চারপাশ লালে লাল করা হয়েছে। গোলাপের প্রতি এই পরিবারের একটা দুর্বলতা আছে। মাতামহের বাটান হোলে শত দুঃখের দিনেও একটি লাল গোলাপ গোঁজা থাকত। গোলাপ, সুন্দরী রমণী, হৃষ্টপুষ্ট ট্যাপোর-টোপর শিশু, তিনটি দুর্বলতাই সাজানো হয়েছে। সুন্দরী চিত্রতারকা। বাদ সেধেছে এক ব্যাটেলিয়ান লম্বা লম্বা ব্ল্যাক ক্যাট। কাঠখোট্টা চেহারা। মাথায় ঘাসকাটা চুল। ধূর্ত নেকড়ের মতো মুখ। কমনীয় আয়োজনে বাবলাকাঁটা। কে এক কর্মকর্তা পরামর্শ দিয়েছিলেন ইন্দিরাজীর কণ্ঠস্বর শুনলে রাজীবজী প্রসন্ন হবেন। তাঁর মন বেদনাবিধুর হয়ে উঠবে, তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার থেকে মন চলে যাবে স্বর্গীয় লোকে। সব গলতি মাপ করে দেবেন। আরে ইয়ার খেলমে তো হারজিৎ হায়ই হায়। গেম ইজ এ গেম ইজ এ গেম। এ তো চীন-জাপান যুদ্ধ নয়। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস নয়। রেগনের স্টার-ওয়ার নয়। খেলকুদমে এইসি হোতাই হায়। স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট কালটিভেট করো। পি. এম.কে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, যা সারা পৃথিবীর লোক ত্রেতা, দ্বাপর থেকে বলে আসছে। রাম বলেছেন, রাবণ বলেছেন, কৃষ্ণ বলেছেন, কর্ণ বলেছেন, যীশু বলেছেন, জরথস্ত্র বলেছেন। আমার বাবা বলেছেন, বাবার বাবা বলেছেন, তাঁর বাবা বলেছিলেন, বাপুনে ভি কহা।

'আরে ঘোড়ার ডিম কথাটা কি বলো না। ভ্যানতাড়া না করে।'

'কথাটা হল, ফেলিওর ইজ দি পিলার অফ সাকসেস। ফেল করতে করতে, সাকসেস-এর কুতুব মিনার।'

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি ইয়ার। আমার আর একটা ডায়ালগ মনে আসছে। লর্ড কৃষ্ণ বলেছিলেন—কর্মণ্যে ইয়ে, কর্মণ্যে অকর্মণ্যে...।'

'আর চেষ্টা কোরো না, পি. এম স্যাংস্কৃটে ভেরি স্ট্রং। মনে হয় আছ,

মধ্য পাশ করা। কথাটা হল, কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। সেকেণ্ড কথা হল, কর্ম হল যোগের কৌশল। কি যোগ সেটা লর্ড পরিষ্কার করে বলেননি। আমার যদ্দূর মনে হয় ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সে যোগ। ওদিকে যোগ না হলে শেষজীবনে চিবোবোটা কি? আখের ছিবড়ে!'

'গ্রেট রেডি। পি. এম আসছেন।'

ঘোষণা হল। সবাই তটস্থ। সকলেই স্পোর্টস স্যুট পরে এসেছেন। ব্লেজারের বুকে বিভিন্ন পণ্য-প্রস্তুতকারক সংস্থার এমব্লেম। এইটাই বর্তমানের রেওয়াজ। কেউ ব্লেড কোম্পানির। কেউ শেভিং-ক্রিম কোম্পানির। কেউ টিভি। কেউ জুতো। কেউ জাঙ্গিয়া, কেউ পানমশালা।

পরপর একই রকম সাত-আটটা গাড়ি ঝড়ের বেগে তোরণ ফুঁড়ে চলে এল। সাতটা গাড়িতেই সাতজন পি এম। এর মধ্যে একজন আসল। বাকি ছ'জন নকল। এর নাম ধোঁকাবাজি। এই দেখে টেররিস্টরা ভড়কে যায়। তিনজন কর্মকর্তা তিনদিক থেকে পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে তিনজন নকল পি এমকে 'আইয়ে জাঁহাপনা, আইয়ে জাঁহাপনা' বলে গাড়ি থেকে নামাতে গেলেন; ওদিকে আসল পি. এম. পাঁচ নম্বর গাড়ি থেকে নেমে, সিকিউরিটিকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কারা?'

'তিনজন কর্মকর্তা স্যার।'

'দৌড়টা লক্ষ্য করলে!'

'ইয়েস স্যার।'

'তিনটেকে আলাদা করে স্টেপলার দিয়ে পিঠে নম্বর সেঁটে একপাশে করে রাখো। নেকস্ট অলিম্পিকে একশো মিটার ইভেন্টের জন্যে তিনটেকেই পাঠাব। গোল্ড হয়তো পাবে না; তবে ব্রোঞ্জ একটা আনবেই।'

'সন্দেহ আছে স্যার। এরা মন্ত্রী দেখে দৌড়য়। অলিম্পিক কোর্টে পারবে না স্যার।'

'মন্ত্রী দেখে দৌড়য় মানে ?'

'আজ্ঞে মন্ত্রী বিশেষত প্রধানমন্ত্রী হল ভবিষ্যৎ। যে আগে ছুটে গিয়ে নামাতে পারবে তার ভবিষ্যৎ ফিরে যাবে। এই দৌড় দেখে আপনি বিচার করবেন না। এই দৌড়ে ভারতীয়রা অতুলনীয়। এর নাম আখেরের পেছনে দৌড়নো।'

পি. এম. তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এই টাকার শ্রাদ্ধটা করলে কে ? কোন ব্যবসাদার ! এ তো মনে হচ্ছে তু'নম্বরী পয়সার খেল।'

পাশেই এক কর্মকর্তা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'পি. এম. স্যার, এটা প্রোভার্বিয়াল পিলার।'

'সেটা কি বস্তু।'

'আজ্ঞে, ফেলিওর থেকে সাকসেসের যে পিলার হয়। ফেলিওর ইজ দা পিলার অফ সাকসেস। এটা সেই পিলার।'

'তোমার মুণ্ডু।'

পি. এম. রাগে গনগন করতে করতে সভাকক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রায় শ'তিনেক কর্মকর্তা ছুঁচোবাজির মতো এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ছোটাছুটি শুরু করলেন।

সকলেই চাইছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি আসতে। পরেরবারের ব্যবস্থাটা তো আসল স্পোর্টস। অ্যাথলিটিদের চেয়ে অফিসিয়াল বড়। তার চেয়ে বড় গম্ভীরমুখো আমলারা।

পি এম.-এর সামনেই তুই কর্মকর্তায় ঘুসোঘুসি সুরু হয়ে গেল।

পি. এম থমকে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, 'কি হচ্ছে বক্সিং ?'

সিকিউরিটি চিফ বললেন, 'দিশি বক্সিং স্যার।'

'তুজনকে আলাদা করে দেগে রাখো' পরেরবার পাঠানো যাবে।'

'এটা স্যার ইণ্টারন্যাশানাল বক্সিং নয়, একে বলে খাবলাখাবলি, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, আপনার নজরে আসার জন্যে।

'এটা স্পোর্টস নয় পলিটিকস।'

এনাফ অফ পলিটিকস। তুমি আমাকে পলিটিকসের কথা আর মনে করিয়ে দিও না। ঘেন্না ধরে গেছে। মা যে আমাকে কি মুকুট পরিয়ে গেলেন! এ যেন সেই সাপের ছুঁচো গেলা।'

এর মাঝে একজন কোমর সমান উঁচু ডোডোনিয়া ভিসকোসার ঝোপ এক লাফে টপকে পি, এমের, সামনে এসে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলেন। পি এম থতমত খেয়ে বললেন, 'আপনি কী সোলে গিয়েছিলেন?'

'ইয়েস স্যার।'

'কি নিয়ে এলেন?'

'বেশি কিছু পারিনি স্যার। ডলারে টান পড়ে গিয়েছিল। গোটা তিনেক টেপরেকর্ডার, একটা ক্যামেরা, তিন বোতল পারফ্যুম, দশটা শার্ট, দুটো স্যুটকেস, ছটা প্যাণ্টপিস, একটা ইলেকট্রিক সেফটিরেজার, ছ-টিউব শেভিং ফোম, এক ডজন মোজা, কিছু জুয়েলারি, আরও অনেক কিছু ছিল, পাগল করে দেবার মতো সব জিনিস। আপনার কাছে একটা অনুরোধ, সামনেরবার ওই দৈনিক দশ ডলার পকেট খরচটা অনুগ্রহ করে দশগুণ বাড়িয়ে দেবেন স্যার। তাহলে আমাদের আর কোনও অভিযোগ থাকবে না।'

'আপনি কি হার্ডলসে অংশ নিয়েছিলেন।'

'না তো। আমি তো স্পোর্টসম্যান নই। আমি তো অফিসিয়াল।'

'আই সি।'

পি. এম, হন হন করে সামনে এগিয়ে গেলেন।

এই ধরনের দ্রুত হাঁটায় তাঁর পরিবারের সকলেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর দাদু, তাঁর মা।

জনৈক অফিসিয়াল তাঁর পেছনে ছুটতে ছুটতে আর একজনকে বললেন, 'কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমাদের পি, এমকেই তো পরেরবার অলিম্পিকে পাঠিয়ে দিলে হয়।'

পি. এম, সোজা মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ বাইশ কেজি

ওজনের বিশাল একটা মালা তাঁর গলায় এসে পড়ল। মুখের নিচের দিক তলিয়ে গেল ফুলদলে। নাক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। একটু শ্বাস নেবার জন্যে তিনি ছটফট করে উঠলেন। একজন ব্ল্যাক-ক্যাট ছুটে এসে মালাটা খুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে হাততালি দিতে লাগলেন, আর কোরাসে বলতে লাগলেন, 'সেভড্ সেভড্ '
পি, এম, তো ভীষণ স্মার্ট, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সেভ দি কানট্রি, নট মি।' বলেই তিনি মাইক্রোফোনের টুঁটিটা চেপে ধরে বললেন, 'কে দায়ী! কারা দায়ী! সোলে ভারতের ক্রীড়াপ্রদীপ কারা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল! কোন হতভাগারা!'
সভার দু'ধারে দু'সার মানুষ বসে আছেন।
মাঝে প্যাসেজ। পি, এম,-এর ডানধারে অফিসিয়াল। বাঁ ধারে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটরা।
ডানধার একজোটে বলে উঠল, 'আমরা না স্যার।'
পি, এম, বললেন, 'ঠিক এইটাই আমি আশা করেছিলুম। একটা দামী ফুলদানী ভেঙে গেলে বাড়ির সকলে এইরকমই বলে : আমি ভাঙিনি। তবে কি ভূতে ভেঙেছে!'
খেলোয়াড়রা বললেন, 'কর্মকর্তারা দায়ী। দায়ী আমলারা। বিদেশে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাদের সঙ্গে ছাগলের মতো ব্যবহার করেছে।'
কর্মকর্তারা চিৎকার করে বললেন, 'মিথ্যেবাদী স্যার। ওদের কেউই আর ফর্মে নেই। সব জাঙ্ক।'
দুতরফে লেগে গেল ধুমধাড়াক্কা। এরা বলে তোমরা ওরা বলে তোমরা।
পি এম কিছুক্ষণ সহ্য করলেন। শেষে বললেন, 'স্পোর্টস আর পলিটিকস এক হয়ে গেছে। আর কোনও আশা নেই।' নিজের পি এ-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্ট্যাটিসটিকস প্লিজ। কত টাকার শ্রাদ্ধ আমরা করে এলুম সোলে!'
'অ্যাকচুয়াল ফিগারটা আপনাকে কাল দিতে পারব স্যার, তবে

এবারের বাজেটে প্রচুর টাকা ছিল। আমরা কোনও অভাব রাখিনি। একেবারে ঢেলে দিয়েছিলুম।'

'সব তুলে নাও।'

'কি করে তুলবো স্যার। সব তো ফুঁকে দিয়ে এসেছে।'

'যে যার ভিটে-মাটি বিক্রি করে ইনস্টলমেণ্টে টাকা শোধ করুক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার বারোটা বাজাচ্ছে। রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর বিদ্যুৎ করছে। আমার মান সম্মান। আমার ফ্যামিলির মান সম্মান নিয়ে টানাটানি। টাকা দিতে না পারে তো এক বালতি করে রক্ত দিয়ে আসুক। কোনও ক্ষমা নেই। কই টাইম ম্যাগাজিনটা দেখি।'

'এই যে স্যার।'

পি, এম, ম্যাগাজিন বাতাসে দুলিয়ে বললেন, 'আমাদের পারফরমেন্স সম্পর্কে আমেরিকার এই কাগজ কি লিখেছে আপনারা পড়েছেন ?'

'বিদেশী কাগজ যা-তা লেখেই স্যার। আমাদের পলিটিকস নিয়ে লিখছে, আমাদের স্পোর্টস নিয়ে লিখছে। স্বদেশ, কি, কি বিদেশ, সাংবাদিকদের ওই কাজ। আপনি তো জানেনই স্যার। কেন উত্তেজিত হচ্ছেন ! আপনি রেগে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার !'

'আমার রাগার আর দরকার নেই, ভবিষ্যৎ এমনিই অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের পপুলেশন এখন কত ?'

'কয়েকদিন পরে বলব স্যার। ওই টিভির কুইজ কনটেস্ট হবে, শুনে বলে দেবো। কোটির খবর আমরা তেমন রাখি না। মানুষের কি দাম স্যার। মানুষ তো আর টাকা নয়। আমার মাস্টারমশাই বলতেন, মাইণ্ড ইওর ওন বিজনেস। মানে নিজের ব্যবসায় মন দাও। ব্যবসা মানে টাকা। যে ব্যবসায় কোনও টাকা নেই, তাকে আমার পিতাশ্রী বলতেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। আর মাতাশ্রী বলতেন নিজের চরকায় তেল দাও।' পি এম তাঁর উপদেষ্টাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মালটা কে ?'

'এইরকম মাল আপনি কত চান স্যার ! মালের মালা হয়ে আছে।

ছেড়ে দিন ওদের কথা।'

'বেশ ছেড়েই দি। ছাড়তে ছাড়তে তো সবই প্রায় ছেড়ে দিলুম, এইবার গদিটা ছেড়ে দিলেই হয়। কি জ্বালায় যে পড়েছি। আর আমার পলিটিক্যাল স্ট্রং হোল্ড উত্তরপ্রদেশটাই যেতে বসেছে। পাঞ্জাবের তো ওই কাডাভারাস অবস্থা। কোনও রকমে একটা মিলখা সিং ছেড়ে, মার্কেটে ছেড়ে দিলে জার্নাইল সিং। কোথায় ডিসকাস ছুঁড়বে, ছুঁড়বে লোহার বল, তা না বোমা ছুঁড়ে আমার ফিউচারের বারোটা বাজাচ্ছে।'

'আপনার ফিউচার কেন বলছেন স্যার। এইটাই তো ভুল করেন! বলুন দেশের ফিউচার। এই আমি, আমি করেন বলেই জনগণ আপনাকে ভুল বোঝে, ফিউডাল লর্ড বলে। পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল জনসভায় আপনাকে রাবণ বলেছে। আবার বলে কি, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেনি। রাবণ প্রাসাদে, সীতা অশোক কাননে ইনট্যাক্ট। কিন্তু আপনি রাবণের হাতে সীতা পড়লে, হিহি, হয়ে যেত।'

'কী অসভ্য। স্টপ ইট। স্টপ ইট। এখানে আমরা এসেছি অলিম্পিক আলোচনা করতে। পশ্চিমবঙ্গ আমাকে যা খুশি তাই বলতে পারে, আমার সে স্বাধীনতা দেওয়া আছে। সি এম ইজ মাই ফ্রেণ্ড। এটা আমাদের কততম অলিম্পিক গেল?'

'আমার ছেলে জানে!'

'সে কি ছেলের বাপ জানে না?'

'আজকাল স্পোর্টসটা স্যার আর অ্যাডাল্ট-সাবজেক্ট নয়। অ্যাডাল্ট-সাবজেক্ট হল ফিল্ম, পালিটিকস। স্পোর্টস ছেলেদের একেবারে কণ্ঠস্থ। যতদূর মনে হচ্ছে এটা ছিল চবিবশতম অলিম্পিক।'

পি, এম, সভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা আজ পর্যন্ত কটা পদক পেয়েছি! কাম অন, কাম অন স্ট্যাটিসটিকস প্লিজ।'

'হকি। হকিতে আমরা পরপর কয়েকবার গোল্ড মেরে দিয়েছি। সোনা আমরা পাইনি এমন অপবাদ কেউ আমাদের দিতে পারবে না

কোনও দিন। আওয়ার গ্রেট ধ্যানচাঁদ। আওয়ার উইজার্ড অফ দি স্টিক। হিটলার পর্যন্ত যাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'হোয়্যার ইজ আওয়ার নেকস্ট ধ্যানচাঁদ?'

'প্রতিভার কি ডুপ্লিকেট হয় স্যার! দুটো রাজীবজী হয়, না দুটো ইন্দিরাজী।'

'ওসব তেল তেলে কথা ছাড়ুন। আমাদের সেই একটি মাত্র সোনা, ছাপ্পান্ন সালের পর থেকে নড়বড়ে হয়ে গেছে। আশিতে লাস্ট তারপর কাঁচকলা। এবারে আপনাদের দল কি করে এল।'

'খেলেছে স্যার। হাড্ডাহাড্ডি লড়েছে। তবে জানেন তো, খেলায় হারজিত থাকবেই। আমাদের একটা হিট গানই আছে, কোনই জিতা, কোই হারা। একেই বলে স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট। খেলায় কোনও কিছু সিরিয়াসলি নিতে নেই। পলিটিকসেও তাই। এই ধরুন ইন্দিরাজী হেরে গেলেন। গেলেন গেলেন। পরেরবার জিতে ফিরে এলেন। নো প্রবলেম। আবার আমরা যাবো। আবার আমরা খেলবো। আবার আমরা যাবো। আবার আমরা খেলবো।'

'হোয়াটস অ্যাবাউট পদক।'

'আবার সেই পদক। আপনাকে দেখছি পদকে পেয়েছে। আমাদের গীতায় আমাদের কৃষ্ণজী বলেছেন, কর্মে তোমার অধিকার নট ইন কর্মফল। এই যে ধরুন সাত সাতটা পরিকল্পনা ভারতের ওপর দিয়ে চলে গেল, তা কি হল, ডিম হল। ফল না হলেও কর্মযোগ তো হল। সেইরকম পদক না হোক ক্রীড়াযোগ তো হল।'

পি, এম, জী ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'গীতাটাকে বাইরে বের করে দিয়ে এসো।'

দুজন ব্ল্যাক-ক্যাট চ্যাংদোলো করে তাকে বাইরের ঝোপে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'ব্যাটা বাঙালি হো গিয়া।'

পি, এম, ততক্ষণে দৌড়বীরদের চেপে ধরেছেন, 'কোথায়, কোথায় আমাদের সেই ফ্লাইং এঞ্জেল। টাইম কি রকম ঝেড়েছে। ভারতের

স্বর্ণপদক ভবিষ্যৎ অলিম্পিক ট্র্যাকে সকলের শেষে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসছে। বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো, চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছে ঠেলে। কি খবর তার ?'

'সেই গোড়ালির ব্যথা। লণ্ডন সারাতে পারলে না। ইণ্ডিয়া ইনজেকশান দিয়ে দিয়ে ঝাঁঝরি করে দিল। এক গোড়ালিই তাকে শেষ করে দিলে স্যার।'

'গোড়ালি ফোড়ালি বাজে কথা, আসল কথা বেলুনে একটু বেশি হাওয়া ভরা হয়ে গেছে। একটু বেশি পাবলিসিটি হয়ে গেছে। তিনি এখন দেশে-বিদেশে সম্বর্ধনা নিতেই ব্যস্ত। বই বেরিয়ে গেছে। নাম হয়েছে, ধাম হয়েছে, টাকা হয়েছে। আর কে দৌড়য়। তা তিনি এলেন না কেন ?'

'ওই যে স্যার গোড়ালির ব্যথা ! গোড়ালিতে ননস্টপ কবিরাজি দাঁতের মাজন ঘষে চলেছে।'

'মাজন ?'

'ইয়েস স্যার। মাজনে ভয়ঙ্কর দাঁতের ব্যথা ভাল হয়, গোড়ালির ব্যথা ভালো হবে না ! এখন আর নেই, আগে বেদেনীরা নাকী স্বরে হাঁকত, দাঁত ভাল করে, পুকা বেরা করে।'

'ভারতের হয়ে এখন দৌড়বে কে !'

'বলব স্যার। কথা দিন রাগ করবেন না !'

'বলো, বলো।'

'স্লাইট অশ্লীল।'

'শ্লীল, অশ্লীল রাখো। আমি পি, এম,। আমি মডার্ন ম্যানেজমেন্ট এনেছি। ভারতকে কম্প্যুটার এজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ভারতমাতার গলায়, আই মিন মাতাশ্রীর গলায় অলিম্পিক স্বর্ণপদক আমাকে দোলাতেই হবে।'

'এবার আমরা কিছু জিয়ার্ডিয়া রোগগ্রস্ত বাঙালিকে পাঠাবো। ইভেন্টের আগের দিন রাতে ঠেসে খাওয়াবো। ক্ষীর, লুচি, মেঠাইমণ্ডা

সকালে আর বড় বাইরে করতে দেওয়া হবে না। এইবার স্টার্ট পোজিশানে নিচু হয়ে দাঁড়াবে। পেটে চাপ। আর যায় কোথায়। ওদিকে গুড়ুম। এদিকে জিয়াডিয়ার নিম্নবেগ। যাদের জিয়ার্ডিয়া আছে তারা আবার ভয় পেলে বেগ ধরে রাখতে পারে না। দেখবেন এইবার দৌড় কাকে বলে। কোথায় কার্ল লুইস, বেন জনসন। স্পিড কাকে বলে! কোনও ট্রেনিং-এর দরকার নেই। কিচ্ছু নেই। শুধু টাচ লাইনে আসা মাত্রই টান মেরে—টু লেভেটারি। অ্যাণ্ড গোল্ড। সিওর সোনা।'

'তখন যদি না পায়।'

'ও পাবেই স্যার। পেতেই হবে। এঁকেই বলে গোপালভাঁড় টেকনিক।'

'ওয়েট লিফটিং-এর কি হবে। সেখানেও তো আমরা গেছি তলিয়ে।'

'ও আড়াই হাজার ডিম আর পাস্ত দুম্বা মারা পালোয়ান দিয়ে হবে না স্যার। আমাদের যেতে হবে কলকাতার বড়বাজারে। ধরে আনতে হবে একডজন মুটে। তারা যা লোড তুলতে পারে, আপনার ওই বাহারি রিস্টব্যাণ্ড পরা, তেল চুকচুকে গালগোব্দা ওয়েট লিফটাররা পারবে না। আপনার কোনও ধারণা আছে স্যার একজন ঘি-চাপাটি-খেকো মারোয়াড়ির ওজন কত? বড়বাজারের মুটে তাকে ঝাঁকায় বসিয়ে অক্লেশে মাথায় তুলে স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত শুধু নিয়ে আসা নয়, সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় খাটে শুইয়ে দিয়ে আসতে পারে।'

'যাক। সমস্যার সমাধান। কিন্তু এবার বক্সিং-এ কি হল?'

'আমাদের বক্সারদের কোনও দোষ নেই। ঘুসি তারা ঠিকই চালিয়েছিল। কনট্যাক্ট করাতে পারেনি। সে হল গিয়ে টার্গেটের দোষ। কাওয়ার্ড। কেবল সরে যায়। পিছলে পালায়। টার্গেট স্লিপ করলে ঘুসি কি করবে স্যার!'

'তাহলে?'

'নেকস্ট টাইম আমরা বোম্বের হিরোদের পাঠাবো। অমন লাগাতার

ঘুসি পৃথিবীর কেউ চালাতে পারবে না। একুশটা রিল ধরে কেবল ঘুসি। যে আসছে তাকেই মেরে ফ্ল্যাট করে দিচ্ছে। এবার সেরা হিরোদের পাঠানো হবে। তিনখানা গোল্ড সিওর।'

'ফুটবলে কি করা যায় ?'

'টিম আমাদের ঠিকই আছে স্যার, একটাই অভাব। সেটা হল সাপোর্টার সাপোর্টাররা না মদত দিলে আমাদের টিম খেলতে পারে না, তাও আবার কলকাতার সাপোর্টার।

পরেরবার টিমের সঙ্গে হাজার দশেক কলকাতার সাপোর্টার পাঠাবেন। এমনিই তো হাজার দুয়েক ফালতু লোক টিমে ঢুকেই পড়ে। আরও হাজার দশেক না হয় ঢুকবে, তবু তো একটা গোল্ড আসবে।'

'টেনিসে কি হবে !'

'নো প্রবলেম। আবার কলকাতা। দমদম আর বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির কিছু লোক আর হাল্কা একটু ট্রেনিং। যারা সারা দিনরাত মশা মারতে পারে তারা টেনিসবলও টেরিফিক মারতে পারবে। মশা মারায় যা ব্যাকহ্যাণ্ড আর ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ লাগে, আপনার কোনও ধারণা নেই। শুধু সারভিসটা একটু শিখিয়ে দিতে হবে।'

'জিমন্যাস্টিকস ?'

'আবার কলকাতা। সিটি অফ জিমন্যাস্টিস। ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর বাসযাত্রীদের মতো জিমন্যাস্ট পৃথিবীর কোথাও নেই। ওখান থেকে আপনি ভাল রেস্টলারও পেয়ে যাবেন।'

'হাইজাম্প, লংজাম্প আর পোলভল্ট !'

'দিল্লি স্যার ! আপনার দলেই ট্যালেন্ট আছে। তারা তো অনবরতই লাফাচ্ছে। একস রাজা, মহারাজার দল।'

'তা হলে কটা গোল্ড হল ?'

'তা মন্দ হল না। দশ বারোটা নিশ্চিত।'

'সাঁতারে কিছু করা যাবে না ?'

'কেন যাবে না স্যার ! মধ্যবিত্ত বাঙালি। একমাত্র সলিউশন। দুঃখ

সাগরে অমন সাঁতার কোনও জাত কাটতে পারবে না'

'তাহলে হকিটার একটা ব্যবস্থা করতে পারলে হয়।'

'হয়ে যাবে, আমরা প্ল্যানচেট-এ ধ্যানচাঁদকে ডাকবো। স্টিকে তাঁর কি আঠা ছিল জেনে নেবো।'

পি এম-এর মুখ দেখে মনে হল বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি মাইক্রোফোনের টুঁটি ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। প্রেস অ্যাডভাইসারকে বললেন, 'একটা রিলিজ দিয়ে দিন, শতাব্দী শেষের ভারতীয় চমক। ফাঁকা বুলি নয়,বারিগর্ভ,বজ্রগর্ভ মেঘ। পঁচিশতম অলিম্পিক আমাদের। নতুন পরিকল্পনা। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। নতুন বাছাই। পুরনো ছাঁটাই। আপাতত আমাদের মুঠোয় ষোলটি গোল্ড। ব্রোঞ্জ বা সিলভারের হিসেব আমরা করছি না। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।'

পি এম মাইক্রোফোনের কাছে মুখ এনে শেষ অভিলাষটি জানালেন, 'সর্বত্র এত শুটিং হচ্ছে আমরা একটা গোল্ড··· ।'

'হবে, হবে স্যার টি ভি সিরিয়াল যাঁরা করছেন, তাঁদের মতো শুটিং কেউ করতে পারবে না। ওঁরাই আমাদের গোল্ড এনে দেবেন। বোম্বে না পারুক, বাংলা পারবেই। গম্ভীর মুখ, উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা বললেন, 'এ শুটিং কি সেই শুটিং! আয় হ্যাভ ডাউটস।'

মৃত্যুর বয়স

আজ আমি আমার স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাবো। ডাক্তারবাবু কালই বলে দিয়েছেন ছোট খাটো যা মেরামত করার ছিল, করে দিয়েছি। তবে হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ। একটা পেসমেকার বসাতে পারলে ভাল হত। ভাল তো হত! আমার যে আর কিছু নেই। কিছু নেই। কিছুই নেই। একটা প্রাইভেট কার্মে কাজ করতুম আমি। রিটায়ার করার পর যা পেয়েছি, সব জমা করে দিয়েছি ব্যাঙ্কে। মাসে স্নুদ পাই এগারোশো টাকা। সেই টাকার তিনশো যায় বাড়ি ভাড়ায়। থাকে আটশো। সেই আটশোয় আমার সংসার চলে। এই ভীষণ বাজার, ডাল-ভাত ছাড়া বিশেষ কিছু জোটে না। একটা পেসমেকারের জন্যে টাকাটা যদি ভেঙে ফেলি, তাহলে উপোস। আমি কী করি। অনেক চেষ্টা করলাম, কোথাও কিছু একটা যদি পাই। কী পাবো! শিক্ষিত যুবক ছেলেদেরই কিছু জুটছে না। আমার মতো অথর্ব বুড়োর কী জুটবে। আমার জীবনটাই একটা জগাখিচুড়ি। ছেলেটার পেছনে জীবনের সমস্ত উপার্জন খরচ করে মানুষ করলুম, সে করলে কী, সব ছেড়ে দৌড়লো প্রেম করতে। প্রেম গেল ফেঁসে। বোকা ছেলে, ছুম্ করে আত্মহত্যা করে বসল। একটা মেয়ের জন্যে অমন সোনার চাঁদ ছেলেটা চলে গেল। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম। ভাল ঘর, মেয়ে সুখের সংসারের সব আয়োজনই করা ছিল। ছেলেটা ঘোড়া টপকে ঘাস খেতে গিয়ে মরে গেল। ছেলে মরে গেলে মানুষের দুঃখ হয়, আমার খুব রাগ হয়েছিল। নিকৃষ্ট একটা গাধা। পৃথিবীতে প্রেম কি শুধু একটা মেয়েতেই আছে? আর কোথাও নেই! আমার ছেলে হয়ে একটা ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারে ছেদ টেনে দিল! তারপর

যত দিন যেতে লাগল রাগটা ঘুরে গেল সেই দুলালীর দিকে। হীরে চিনতে পারল না। এখন আমার দুঃখ হয়। ফাঁকা লাগে। হালকা লাগে। আর ছেলের শোকে আমার স্ত্রী হয়ে গেল আধপাগলী। নিজের ওপর অত্যাচার করে করে শরীরটা চুরমার। কোনও ব্যাপারেই তার কোনও আগ্রহ নেই। ফ্যালফ্যালে, উদাস চোখ। করতে হয় করে। খেতে হয় খায়। পাগলামির সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল—চিঠি লেখে। অজস্র চিঠি। কাকে লেখে? অদৃশ্য কোনও চরিত্রকে। মৃত পুত্রকে। সে-সব চিঠি কখনও পোস্ট করা হয় না। লেখাই হয়। লিখে লিখে ফেলে দেয় এখানে-ওখানে। একটা চিঠি আমি পড়েছিলুম। লিখছে তার বাবাকে। আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন নামি পণ্ডিত। আর এ তো জানা কথাই সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর চির-বিবাদ। অর্থের তেমন জোর থাকলে, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কেন!

সেই পরলোকগত পিতাকে আমার স্ত্রী লিখছে, 'তোমার নাতিটাকে ঠিক কেষ্ট ঠাকুরের মতো দেখতে হয়েছে। কী দুরন্ত! কী চঞ্চল! সারাটা দিন ওকে দেখতে হবে। তেমনি দুঃসাহস। সেদিন একটা কুকুরের লেজ ধরে টানছে। আশ্চর্য অত বড় একটা বাঘা কুকুর কিছু বলল না। কুকুরটার মুখ দেখে মনে হল খুব আনন্দ পেয়েছে। লেজ নেড়ে নেড়ে তার কী খেলা! হাঁটতে তো শিখেইছে, আবার জানলার গবাদ ধরে হনুমানের মতো ঝুলতে শিখেছে। সেদিন দুম করে পড়েছে। কত আর চোখে চোখে রাখবো বলো। সেদিন কোমরে দড়ি বেঁধে জানালার গরাদে বেঁধে রেখেছিলুম। এসে দেখি ছেলে আমার মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ঠোঁটের কোণে এক-গাছা সুড়সুড়ি পিঁপড়ে। সেই দৃশ্যটা বাবা, তুমি ভুলতে পারবে না একেবারে গোপাল ঠাকুরটি। সব কথা ফুটেছে। মা বলে সে কি হাঁক ডাক। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে যখন গালে গাল রাখে —মিষ্টি, ঠাণ্ডা। মুখে একটা ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ। রাতে উঠে দেখি—

ঘুমিয়ে আছে চিৎ হয়ে। যেন ক্ষুদে দেবতা। চোখ দুটো কাঁপে। মাঝে মাঝে হাসে। বোধহয় ভগবানের সঙ্গে কথা বলে।'
শিশুপুত্রের কথা লেখে। একের পর এক চিঠিতে। আমাদের পুত্রের বাল্যলীলা। অতীত ভুলতে পারছে না। জীবনের অতীত অধ্যায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও বর্তমানে বের করে আনতে পারছি না। এত দুঃখের ছেঁকাতেও কিছু হল না।
অনেক কসরত করে একটা ট্যাক্সি ধরলুম। আমারই মতো এক প্রবীণ মানুষ। চোখে সুতো জড়ানো চশমা। ট্যাকসিটা যেন ঈশ্বরই পাঠিয়ে দিলেন। ঝরঝরে, নড়বড়ে। যেমন তার চালক, তেমনি তার আরোহী। ভদ্রলোকের কটকটে কথা। প্রথমেই বললেন, 'মিটার যা উঠবে তার ওপর কিছু বেশি দিতে হবে।'
'কত বেশি?'
'পাঁচ-দশ দিয়ে দেবেন যা হয়।'
'বেশ ভাই, তাই হবে।'
'প্রতিবাদ করলেন না তো!'
'শক্তি নেই ভাই।'
'কারণটা জেনে রাখুন, শান্তি পাবেন। আপনার যে এলাকা, সেখান থেকে ফেরার সময় প্যাসেঞ্জার পাব না। আমাকে খালি ফিরে আসতে হবে।'
'বুঝেছি ভাই।'
গাড়ি চলছে। আমার যেমন দুর্মতি! হঠাৎ বলে বসলুম, 'গাড়িটা শেষ পর্যন্ত যাবে তো!'
'সন্দেহ থাকলে নেমে যান।'
আমি তাঁর মেজাজ দেখে নীরব হয়ে গেলুম। ভদ্রলোক তখন নিজেই বললেন, 'এই যে আপনি আর আমি, ভাবছেন সহজে ভেঙে পড়ব? না! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের ঘানি ঘুরিয়ে যেতে হবে। যেদিন কাত হব, সেদিন একেবারেই কুপোকাত।'

'আপনি এই এত বয়েস পর্যন্ত গাড়ি চালাচ্ছেন কী করে ?'
কী করব ? কে খাওয়াবে আমাকে ? পেটের দাসত্ব বড় দাসত্ব। উপায় থাকলে কেউ এই কাজ করে ? আমার যেমন বরাত ! মানুষ তো ভাগ্য নিয়ে আসে। প্যানপ্যান করে তো লাভ নেই। রাস্তার যা ছিরি। গাড়ি একবার ডানদিকে কাত মারে, একবার বাঁদিকে। কখনও গর্তে, কখনও জলে। ভদ্রলোক বললেন, 'বাপের জন্মে এমন রাস্তা দেখেছেন ? এর নাম না কি রাস্তা !'
হাসপাতালের ভেতরে গাড়ি ঢুকল। হাসপাতালে ঢুকলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। জঘন্য পরিবেশ। উপায় নেই। করতেই হবে। কেউ তো নেই আমার হয়ে করার। গত এক মাস, রোজ আমি সকাল, বিকেল এসেছি। যাবার সময় সুরমা আমার হাত দুটো ধরে বলত, 'এরই মধ্যে চলে যাবে ?' বোঝে না যে, হাসপাতালে আর কিছু না থাকুক যাবার ঘণ্টাটা ঠিকই আছে। আসলে ওইরকম একটা হট্টরোলে সুরমা হাঁপিয়ে উঠত। আমাদের বাড়িটা তো বেশ নির্জন, নিরিবিলি। কতকালের ভাড়াটে আমরা। ছেড়ে দিলেই হাজার বারশো টাকা ভাড়া অক্লেশে পাবে। আমাদের বাড়িঅলা বেশ বুঝতে পারি—দিন গুনছেন কবে বুড়ো আর বুড়ি ছুটি পাবে এই পৃথিবী থেকে !
সুরমার জিনিসপত্র ভর্তি ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে নিলুম। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে সুরমার মাথায় কোনও গোলযোগ আছে। বেশ একটা অভিজাত চেহারা। বরং সেই তুলনায় আমি এক খেঁকুরে ভৃত্য। কারণটা আবিষ্কার করেছি। আমি আছি বর্তমানে। আমার যত জ্বালা-যন্ত্রণা-দুঃখ নিয়ে। সুরমা আছে অতীতে। জীবনের প্রথম দিকে।
সুরমা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এল। একমাসে সকলের সঙ্গেই বেশ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 'আবার আসবেন' এ-কথা কেউ বলতে পারছে না। সবাই বলছেন, 'আসুন' আসুন, সাবধানে

থাকবেন। অত্যাচার করবেন না।'

আমার কাঁধে হাত রেখে সুরমা ধীর গতিতে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত বেশ গেল। তারপর হঠাৎ থেমে পড়ে বললো 'সেই ঘরটা একবার দেখে যাই, যে-ঘরে খোকা হয়েছিল।

'সে তো এখানে নয়। খোকা তো চন্দননগরের হাসপাতালে হয়েছিল।

'তুমি -আজকাল সব ভুলে যাও। এই তো সেই সিঁড়ি।'

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুরমাকে ট্যাক্‌সিতে তুললুম। ট্যাক্‌সির চালক সুরমাকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। দরজা ধরে রেখে. হাত ধরে, ধীরে ধীরে বসতে সাহায্য করলেন। হাত জোড় করে নিজের কপালে ঠেকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আহা! সাক্ষাৎ জগজ্জননী।' পুরনো আমলের মানুষ তো, কিছু কিছু বোধ এখনও বেঁচে আছে। মায়ের মূর্তি চিনতে ভুল হয় না। আর সুরমা তো শতভাগ মা। ছেলেটা মারা গেছে সেই কবে! সেই থেকেই তো সুরমা দিন-রাত তাকে নিয়েই আছে। একটার পর একটা সোয়েটার বুনে চলেছে। ট্রাউজারের কাপড় কিনছে সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে দাগ মারছে। সবই করছে নীরবে। সব সময়ে তাকে অসংলগ্ন মনে হয় না। মাঝে মাঝে একটু অদ্ভুত মনে হয়। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সাড়া দেয়, 'যাই বাবা।'

আমি তখন বোকার মতো বলি, 'কাকে সাড়া দিলে?'

একটু যেন রেগে যায়, 'তুমি শুনতে পেলে না। খোকা ডাকল।'

গাড়ি যেই মিউজিয়ামের সামনে এসেছে সুরমা বললে, 'এই তো সেই বাড়ি। মিউজিয়াম না!'

চালক বললেন, 'হ্যাঁ মা।'

'থামাবেন একটু।'

'এখানে তো গাড়ি রাখা যাবে না মা। পুলিস ফাইন করে দেবে।'

আমি বললুম, 'তুমি মিউজিয়ামে কী করবে?'

'তোমার মনে নেই, খোকাকে নিয়ে শীতকালে একবার বেড়াতে এসে ছিলুম। সেই ঘরগুলো একবার দেখে যেতুম।'

'বেশ তো, এই শীতে একবার আসবো। তখন তোমার শরীরটাও একটু ভাল হয়ে যাবে।'

সুরমা গুম মেরে গেল। গাড়ি তখন সেই বিশাল বাড়িটাকে পেছনে ফেলে চলে এসেছে। সুরমা হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করছে। এই রকম করলেই বুঝতে পারি, সুরমা অতীতে ফিরে চলেছে। যখন আমার যৌবন ছিল। যখন সুরমা সুন্দরী এক বধূ। সুরমার কোলে খোকা। খরগোসের মতো চোখ। ফর্সা গোল, গোল হাত। সেই হাতে লোহার একটা ছোট্ট বালা। মায়ের কোলে শুয়ে নিজের হাত আর পা নিয়ে খেলা করছে আপন মনে। মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ। মাঝে মাঝে অলৌকিক কোনও আনন্দে ঝিকি মেরে উঠছে। অকারণ হাসির কপচানি। একটানা একটা যে যে শব্দ। গোল পুতুলের মতো মুখ। টকটকে লাল ঠোঁট। মুখের ভেতরটা লাল টুকটুকে। নিজের বুড়ো আঙুল চুষছে। লালঝোল মাখামাখি।

গাড়ি হাতিবাগানের কাছে এসে গেছে। দু'পাশে জামাকাপড়ের দোকান। সুরমা বিমর্ষ মুখে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। হঠাৎ করুণ গলায় বললে, 'গাড়িটা একবার দাঁড় করানো যাবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, এখানে যাবে।'

আমি বললুম, 'এখানে তুমি কী করবে?'

'একটা দোকানে খুব সুন্দর একটা লাল জামা ঝুলছে। ওই জামাটা আমি খোকার জন্যে কিনবো।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'খোকার জন্যে?'

'হ্যাঁ, খোকার জন্যে। খোকার জন্যে একটা কিছু নিয়ে যেতে হবে তো।'

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, 'তোমার আর নামার দরকার নেই। কোন জামাটা বলো, আমি নিয়ে আসি।'

'তুমি পারবে না। তুমি খোকার মাপই জান না।'
কথাটা ঠিক, তার মনের খোকা এখন কত বড়, আমার তো জানা নেই।
সেই সুরমা নামল। মনের আবেগে হেঁটে চলল গটগট করে। টলছে।
চালক ভদ্রলোক আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'ধরুন, ধরুন। মাকে ধরুন।'
এক মাসের হাসপাতাল-বাসে বাইরের চেহারায় অসম্ভব এক উজ্জ্বলতা এসেছে। মনে হচ্ছে যেন কোনও মহারাণী যাচ্ছেন।
দোকানের মালিক জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলের বয়েস কত মা?'
'এই ধরুন সাত, সাড়ে সাত। আটে পা দেবে আর কি।'
দেখলুম, যা ভেবেছি তাই। সুরমার মনে খোকার মৃত্যুর দিনটিই জন্মদিন হয়ে উঠেছে। খোকা চলে গেছে আজ প্রায় আট বছর হল। মৃত্যুর বয়স হল আট।
গাড়িতে ফিরে এসে সুরমা যেন এলিয়ে পড়ল। হার্টের অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়। ডাক্তার বলেই দিয়েছেন কতদিন আর ফেলে রাখবেন হাসপাতালে! এর তো তেমন কোনও চিকিৎসা নেই। একমাত্র চিকিৎসা টাকা। টাকার তেলে জীবনদীপ জ্বলবে।
চালক ভদ্রলোক কিছুতেই বাড়তি টাকা নিলেন না। শেষে একরকম রেগেই গেলেন, 'আচ্ছা আজব লোক। আমি নেবো না, তবু আপনি আমাকে জোর করে দেবেন।'
সুরমাকে দেখে মানুষটার হঠাৎ কী রকম পরিবর্তন হয়ে গেল!
তিন-চার দিন খুব ভাবলুম। কী ভাবে একটা পেসমেকার জোগাড় করা যায়। হঠাৎ মনে হল, আমার বাড়িঅলা তো আমাকে তুলতে চান। কিছুদিন আগে বলেছিলেন, বিশ, তিরিশ হাজার দিচ্ছি, আপনারা তো মাত্র দু'জন, একটা ছোটখাট, এক কামরার বাড়ি দেখে নিন না। একটা ঘর, বাথরুম, রান্নার জায়গা, এর বেশি আর কী প্রয়োজন। শুধু, শুধু এত বড় একটা বাড়ি আটকে রেখেছেন।
ঠিকই। ওই টাকাটা পেলে সুরমার বুকে সহজেই একটা পেসমেকার বসানো যায়। বাড়িঅলার বিশাল দোকানে গেলুম। তিনি তো

সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আজ বললে কালই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। শুধু তাই নয় ভদ্রলোক আমাকে একটা ছোট বাড়ির সন্ধান দিলেন। বাড়িটাও দেখে এলুম। একানে একটা বাড়ি। বাড়িটার বয়স হয়েছে। বয়স হলেও মন্দ নয়। ছোট একটা কৌটোর মতো। হালকা ভাবে থাকা যাবে। কিছু মালপত্র ফেলে দিলেই হল। খোকার হাজার চারেক বইই একটা সমস্যা। বইগুলো কোনও লাইব্রেরিতে দিয়ে দিলেই হল। বইয়ের আর কী প্রয়োজন! আমার চোখ গেছে, সুরমার মাথা গেছে। যাক, অভ্যাসটা একটু পালটাতে পারলে, একটু কষ্ট করতে পারলে, সুরমা হয় তো আরও কিছুদিন বাঁচবে।

যে সময়টা সুরমা অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসে, সেই সময় তাকে পরিকল্পনাটা জানালুম। জীবনে যখন যা করেছি, দু'জনে পরামর্শ করে করেছি। এখনই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? সুরমা কোনও কথা না বলে গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

'তোমার আপত্তিটা কিসের? আমরা তো দুটো প্রাণী। এত বড় বাড়ি, পরিষ্কার রাখাও তো এক সমস্যা।'

সুরমা উঠে চলে গেল। মাঝে মাঝে আমার রাগ হয়। রাগ এখন খুব কমিয়ে ফেলেছি, তবু হয়। নিজের অক্ষমতার ওপর রাগ। সুরমা পাগল হতে চায় তো পুরোপুরি পাগল হয়ে যাক। তখন আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকবে না। আর তা না হলে, আমার অবস্থাটা বুঝুক একটু বুঝদার হোক।

আমি একটু জোর গলাতেই বললুম, 'তোমার কতকগুলো জিনিস আমার মাথায় আসে না। অভিনয় করো, না সত্যি সত্যিই করো!'

আমি রাগ করে শুয়ে পড়লুম। যা হয় হোক। ফিক্সড ডিপোজিট আমি ভাঙতে পারব না। সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। গভীর রাত। সুরমা বিছানায় নেই। ঘুম ভেঙেছিল একটা শব্দে। ভারি একটা কিছু পড়ে যাবার শব্দ। অন্ধকার। কোথাও কোনও আলো নেই।

এই ঘোর অন্ধকারে সে গেল কোথায়?' বুকটা কেমন করে উঠল। আমারই বা হৃদয়ের জোর কোথায়। হাতড়ে, হাতড়ে গিয়ে ঘরের আলোটা জ্বালালুম। ঘরের বাইরে এলুম। দূরে বাথরুম। বাথরুমের সামনে সুরমা পড়ে আছে একপাশে কাত হয়ে।

বাথরুমের আলোটা জ্বেলে দিলুম। এক ঝলক আলো মুখে পড়ছে। পাশে বসে সবার আগে হাতটা টেনে নিলুম। কবজির কাছে জীবনের কল থেমে গেছে। কনুইতেও নেই। সব স্থির। মুখে যে যন্ত্রণাটা ছিল, সেটা ধীরে ধীরে হাসি হয়ে ফুটছে। আমাকে অপরাধী করে তাহলে তুমি গেলে! কী করবো! আমিও খোকাকে পেয়েছিলুম। লোক আগে গাছকে ভালবাসে, যত্ন করে, পরিচর্যা করে, তবেই না আসে ফল। তুমি আমার তিক্ত কথাটুকুই নিয়ে গেলে। সেটা যে আমার ভালবাসা, তা কি বুঝেছিলে!

আমাকে লেখা তার জীবনের প্রথম চিঠিটা সে ওই রাতেই লিখেছিল আমি যখন ঘুমিয়েছিলুম—

'তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, এই বাড়িটা ছেড় না। এখানে আমার খোকা আছে। টেবিলে বসে লেখাপড়া করে খাটে শুয়ে গান গায়। বাথরুমে চান করে। সব সময় সে আছে সে যায়নি। তোমার ওপর অভিমান করে সে লুকিয়ে আছে তুমি দেখতে পাওনা, আমি পাই। বাড়িটা ছেড় না। খোকাকে আশ্রয়হীন কোরো না।'

চিঠিটা টেবিল থেকে বেরলো। কী করবো আমি। আর তো কিছু করার নেই। এতদিনে খোকার মৃত্যু হল। বাড়িঅলা ভদ্রলোক এলেন, 'ক্যাশ টাকা এনেছি। সোজা ব্যাঙ্কে জমা করে দিন।'

'মশাই। এতই যখন করলেন আর কটা দিন অপেক্ষা করুন বিনা টাকাতেই পেয়ে যাবেন। আর ক'টা দিন। সবুরে মৃত্যু ফলে।'

বিশ্বকাপ ভাঙল

বিশ্বকাপের কুফল ও সুফল সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখ।

ছেলেটি লিখছে : আমার বাবা অতিশয় গেতো। সংসারের ব্যাপারে কোনওকালেই তাঁর তেমন গা ছিল না। দম দিয়ে যতটুকু করানো যায়। সংসার অফিস হলে বাবার কবেই চাকরি চলে যেত। আমার মা, বাবার 'বস'। বাবা তাঁর পেয়ারের লোক, মন্ত্রীদের যেমন পেয়ারের লোক থাকে ঠিক সেইরকম। তাই বাবার চেয়ারটা আছে। তা না হলে, কবেই দখল হয়ে যেত। বিশ্বকাপের ঠিক পঁচিশ দিন আগে আমাদের টিভি চোখ বোজালো। বাবা বললেন, আপদ গেল। সিরিয়ালের ঠেলায় সিরিয়াস কোনও কাজ করার উপায় ছিল না। বিশ্বকাপ আসছে। মহাভারতে কর্ণবধ হবে। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হবে। বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল।

আমরা যে-দোকান থেকে টিভি কিনেছিলুম, তাঁরা এখন আর চিনতে পারেন না। সেইটাই তো নিয়ম। মাল বেচে দিয়েছি। মামলা মিটে গেছে। নিজের ম্যাও নিজে সামলাও। গরজ আমার। দোকানের মালিক দারোগার মতো মুখ করে বললেন, 'ও-সব পেটি কেস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। এখন পেটি-পেটি নতুন টিভি বিক্রি হচ্ছে। গেরান্টি শেষ হয়ে গেছে তো! গন্ধমাদন ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে কোম্পানির সার্ভিসিং-এ ফেলে দিয়ে এসো।'

আমি মোলায়েম করে বললুম, 'জেঠু, সে যে অনেক দূরে। ক্যামাক স্ট্রিটে। আপনি না দেখলে কে দেখবে!'

তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। ফটাং করে পানমশলার ডাব্বা খুলে এক চামচে মুখে ফেলে বললেন, 'হু ইজ ইওর জেঠু! দিস ইজ দোকান। আই হ্যাভ নো ভাইপো। গো টু ক্যামাক স্ট্রিট, পুট ইট অন দেয়ার ঘাড়।'

আমি উচ্চিংড়ের মতো এক লাফে দোকানের বাইরে। মিষ্টি মুখের, মিষ্টি কথায় ব্যবসাদারের চিঁড়ে ভেজে না। তিনি এলো খোঁপা এক সুন্দরীকে, পরপর সাতটা টিভি 'অন' করে লেকচার দিতে শুরু করলেন। মহিলার হাতে ধরিয়েছেন ঠাণ্ডা বোতল। তিনি টিকলি ঠোঁটে নল ঠেকিয়ে সুড়ৎ সুড়ৎ টানছেন। মাথা দুলিয়ে হাসছেন। খোঁপা ঘাড়ে লাথি মারছে। ইয়াররিং দুলছে। মনে মনে বললুম, 'ম্যাডাম, ওই একবারই। তিন টাকার বোতল আর দেবে না। গ্যারান্টি পিরিয়াডে, তিনবার আমাদের টিভি হেঁচকি তুলেছিল। এক এক খেপে দু'তিন মাস করে মাল মশলা হয়ে গুদোমে গুমখুন হয়েছিল।'

খুঁজে খুঁজে ক্যামাক স্ট্রিটে গেলুম। বোম্বের কোম্পানি। এখানে সার্ভিসিং। মিলিটারি মেজাজে বললেন, 'একশো টাকা জমা দিয়ে ডায়েরি করে যান। যবে হোক লোক যাবে।'

'দাদা, কবে যাবে?'

'নো দাদা বিজনেস। সময় হলে যাবে। নো দাদা, নো ভাই।'

আমি আর একটু তেল দেবার চেষ্টা করে এক দাবড়ানি খেলুম.. 'আমাদের লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট।'

বিশ্বকাপের প্রথম সুফল, মানুষ চেনা যায়। কোন্ মানুষ। যাঁরা ভারতের ব্যবসা চালাচ্ছেন।

সাতদিন আমরা হাঁ করে বসে রইলুম, বসে আছি পথ চেয়ে, কখন আসেন টিভি মেকানিক :

একদিন তিনি রাত সাতটা, সাড়ে সাতটার সময় স্কুটার ফটফটিয়ে এলেন। আমাদের এলাকা তখন লোডশেডিং-এর কম্বলের তলায়। আমরা তখন মোমবাতি মন্ত্রীর গুনগানে ব্যস্ত। সেদিন সকালেই ফেরিওলা হাঁকছিল। ঠিক যেন বলেছিল—প্রেমিক চাই, প্রেমিকা চাই। ঘোর অন্ধকারে মানুষ আর কি চাইবে, প্রেমিক, প্রেমিকা ছাড়া! পরে আর একটু ভাল করে শুনে বুঝলাম, মাদুর চাই, পাটি চাই।

সেই অন্ধকারে মেকানিক ভদ্রলোককে আমরা প্রায় ভারতের রাষ্ট্রপতির মতো সম্বর্ধনা জানালাম। খালি সাতবার কামান দাগা ছাড়া; আমাদের আদর আপ্যায়নে তাঁর ব্যবসায়িক ভিত আদৌ টলল না। তিনি স্কুটার থেকে অবতীর্ণই হলেন না। কিড়কিড়ে গলায় বললেন, 'লোডশেডিং? তাহলে আর কি হবে!' আমরা জনে জনে তাকে নানারকম খাদ্যদ্রব্যের লোভ দেখাতে লাগলুম, গরম কফি, প্যাস্ট্রি, কড়াপাক সন্দেশ। খেতে খেতেই আলো চলে আসবে। কোনওরকমে তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা। সেই বলে না, কলা দাও, মুলো দাও। ভবি ভোলার নয়। 'পরে দেখা যাবে, বলে ফুড়ুক করে স্কুটার ছুটিয়ে দিলেন। প্রিয়জন শ্মশানে চলে গেলে মানুষ যেমন সাশ্রুনয়নে দুয়ারপথে দাঁড়িয়ে থাকে, আমরাও সেইরকম অপস্রিয়মাণ স্কুটারেব লাল আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বিশ্বকাপের সুফল, অজ্ঞাতকুলশীল, প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়; প্রিয়েরও অধিক;

তিনদিন পরে আবার তিনি এলেন, মোটামুটি সেই একই সময়ে। সেই একই লোডশেডিং-এর অন্ধকার। সেকালের মানুষ অভিশাপ দিতেন—তোর বংশে সন্ধ্যার বাতি দেবার কেউ থাকবে না। সেই সব অভিশাপ ফলছে আমাদের জীবনে—নো কেরোসিন, নো গ্যাস, নো ইলেকট্রিসিটি। এবার আর তিনি স্কুটার থামালেন না। বোঁ করে স্কুটার ঘুরিয়ে ফড়্ড় করে চলে যেতে-যেতে বললেন, 'আমার পক্ষে আর আসা সম্ভব নয়। টিভিটাকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের সেণ্টারে।' 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'-ভাব নিয়ে আমরা বসে রইলুম। মা বললেন, 'অপদার্থ!' কার প্রতি প্রযুক্ত হল এই অতি প্রচলিত মনোহর বিশেষণটি জানা দরকার, 'কে অপদার্থ মা?' অন্ধকারে বোমা ফাটল, 'কে আবার? তোমার বাবা। কর্ণবধ হয়ে গেল!'

'আর আমাদের বিশ্বকাপ !'

'ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে ইতালির বিশ্বকাপ দেখ। কোন্ দেশে জন্মেছ খেয়াল আছে? এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে না কো খুঁজে। মুখপোড়া।'

'কে মা?'

'সবাই, সবাই। যারা ভোট দেয়। যারা গদিতে যায়, সবাই।'

বিশ্বকাপের সুফল—ক্লাসলেস সোসাইটিকে চিনতে সাহায্য করে। আমরা সবাই মুখপোড়া। আমরা সবাই রাজা। অনেকটা সেই-রকম। অমৃতস্য পুত্রাঃ নই, মুখপোড়া।

রাতে আমাদের মিটিং বসল। টিভিটাকে গাড়ি ভাড়া করে ক্যামাক স্ট্রিটে দিয়ে আসার একটা খরচ আছে। আচ্ছা, দিয়ে আসা হল। তারপর? মাল পড়ে রইল গাদায়। কবে ডেলিভারি দেবে তার কোনও স্থিরতা নেই। যা সব মিলিটারি মেজাজ। তাগাদা দিতে গেলে, বাজারে ষাঁড়ের গায়ে যে-ভাবে গরমজল ঢালে সেইভাবে হয়তো জলই ঢেলে দেবে। তাহলে?

মা বললেন, 'আমি ওসব জানি না, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, আই মাস্ট সি। সমস্ত নারী জাতির অপমানের প্রতীক ওই উরু। সামনের রবিবার টেবিলের ওপর সকাল ন'টার সময় আমি চলন্ত টিভি চাই। সে নতুন হোক, পুরনো হোক আমার জানার দরকার নেই।'

'মা' আমাদের বিশ্বকাপ?'

'যারা চায়ের কাপ ছাড়া কিছু জানে না, তাদের আবার বিশ্বকাপ!'

বিশ্বকাপের সুফল, প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের মুরোদ ধরা পড়ে যায়।

বাবা বললেন, 'বেস্ট হল, একজন টিভি মেকানিককে ধরে আনা। দেখা যাবে কিছুই হয়তো হয়নি। পেছনটা খুলবে, একটা ফুঁ মারবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মা বললেন, 'এ তোমার মানুষের শরীর নয় যে ঝাড়ফুঁকে ঠিক হয়ে যাবে। এর নাম টিভি। এক জোচ্চোর কোম্পানি। তখনই বলেছিলুম, বিজ্ঞাপনে মজে মোরো না।'

শেষে মা নিজের গরজেই এক এক্সপার্ট ধরে নিয়ে এলেন। তিনি যত সহজে পেছনটা খুলতে পারলেন, তত সহজে গোলমালটা ধরতে পারলেন না। গলদঘর্ম অবস্থা। এর মধ্যে, চঞ্চল পড়ুয়ার মতো বিদ্যুৎ বার কয়েক এলো আর গেল। শেষে, তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেটটা আমি আমার ওয়ার্কশপে নিয়ে যাই।

মা বললেন, 'সে তো হবে না ভাই। তাহলে, তোমাকে আমি কেন নিয়ে এলুম। আমাকে দিদি যখন বলো, তখন না সারানো পর্যন্ত, তোমার তো মুক্তি নেই।'

এ যেন সেই কথা—দেহে যখন ঢুকেছ, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মুক্তি নেই।

তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেন। 'বিশ্বাস করুন, এখানে হবার হলে হয়ে যেত। কেস খুব সিরিয়াস। হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হবে।'

বিশ্বকাপের সুফল, নিজেদের বরাত জানা যায়।

বাবা বললেন, 'আমাদের যা বরাত, আমাদের কোনও কাজ তো সহজে হবার নয়। এ দেখবে বিশ্বকাপও শেষ হবে টিভিও ঠিক হবে, তার আগে নয়।'

পরের দিন গিয়ে দেখা গেল, টিভি নাড়িভুঁড়ি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। জনডিস না বিকোলাই বোঝা যাচ্ছে না। মা খানিক চিৎকার চেঁচামেচি করে বিকল্প একটা রঙীন টিভি ম্যানেজ করলেন। আমারটা দেবে তোমারটা নিয়ে যাবে। এ যেন সেই 'হোস্টেজ'-এর মতো। তোমারটা ধরে রাখলুম। আমারটা 'আগে ছাড়ো।'

সেই মেকানিক ভদ্রলোক বললেন, 'বউদি, এই যে টিভিটা নিয়ে যাচ্ছেন, এটার সবই ভাল, কেবল একটাই ব্যায়রাম, স্ক্রিনটা মাঝে মাঝে প্যানোর‍্যামিক হয়ে যায়। লম্বা ফালির মতো। তখন করবেন

কি। কষে ব্রহ্মতালুতে মারবেন গোটাকয় থাপ্পড়। নিজের ব্রহ্মতালুতে নয়, টিভির ব্রহ্মতালুতে।'

বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। মা হো তো অ্যায়সি। কেমন একটা টিভি ম্যানেজ করে নিয়ে এল! সাদা-কালো নয়, রঙীনের বদলে রঙীন। বাবা বললেন, 'তুমিই আমার একমাত্র বউ!' মা এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন এইমাত্র এভারেস্টের মাথায় উঠে ভারতের পতাকা ওড়ালেন! আমরা একবার কোরাসে গেয়ে উঠলুম, জয় হে, জয় হে, জয় জয়, জয় জয়, জয় হে!

আমরা কর্ণবধ দেখতে বসলুম। একেশ্বরবাদীর মতো, এই টিভিটায় একটাই মাত্র রঙ আসে। সে-রঙ হল সবুজ। গোটা পর্দা জুড়েই শুরু হয়েছিল অর্জুন আর কর্ণের তীর ছোঁড়াছুঁড়ি। যেই কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন, অমনি টিভিও নেমে পড়ল। পাড়ের ফালির মতো একটুকরো জায়গায় অত বড় একটা কুরুক্ষেত্র কর্ণের মুখ দু'পাশে লম্বা বেসবলের মতো হয়ে। সেই প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্তে সবাই চিৎকার করে উঠলেন, 'মার থাপ্পড়, মার থাপ্পড়।' আমি অমনি উঠে গিয়ে দমাদ্দম চাঁটা মারতে লাগলুম। ছবি এই বড় হয়, এই ছোট হয়। তখন পালা করে থাপ্পড় মারা শুরু হল। দেখা গেল, এই টিভি বিদ্যুতে চলে না, চলে থাপ্পড়ে।

বাবা বললেন, 'জীবনে অনেক বাঁদর দেখেছি, এমন বাঁদর কখনও দেখিনি।' টিভির ডানদিকের নিচে একটা চৌকোমতো জায়গায় একসার ফুটো। একটা ফুটোয় একটা প্লাস্টিকের খড়কে কাঠি। সেই কাঠিটা বের করে মা একবারে বাঁদিকের প্রথম ফুটোয় ঢুকিয়ে কান চুলকোবার মতো করে কুড়কুড়ি দিতে লাগল। ছবি বড় হল, শব্দ চলে গেল। নিঃশব্দে কর্ণের মুণ্ডু কাটা গেল। কোনও বিলাপ নেই, কোনও আস্ফালন নেই।

বাবা বললেন, 'মৃত্যু নিঃশব্দে হওয়াই ভাল। এ তো বিয়ে নয় যে ঢাকঢোল বাজবে!'

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দ্বিতীয় চ্যানেলে। দ্বিতীয় চ্যানেল অনেক সাধ্যসাধনার পর এল।

বাবা বললেন, 'এ কি রে? এ তো ছানা কেটে গেছে!'

সত্যিই তাই। সেই ফালি স্ক্রিন। ঘোলের প্লেটে চরিত্ররা সব সাঁতার কাটছে। উদ্বোধনী খেলা শুরু হল। আমাদের টিভির কল্যাণে সবই যেন কমিক স্ট্রিপ। অর্ধেকটা আবার অন্ধকারে। সেখানে কি যে হচ্ছে, বোঝার উপায় নেই। ছবিটাকে যেন মিক্সারে ফেলা হয়েছে। সব গোল হয়ে ঘুরছে। চোখ জ্বলে যাচ্ছে। থেকে থেকে সব উঠছে। বাথরুমে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসছে।

অনেক খোঁচাখুঁচির পর ট্যাক্সি চেপে আমাদের টিভিটা এল। সবই না কি ঠিক হয়ে গেছে! বিকল্প টিভি সরে গেল। টেবিলে বসল আমাদেরটা। সবাই বললেন, 'আঃ, ঘরের ছেলে ঘরে এল। তোমার বাবা তুলনা হয় না। তুমি যেন দেবদূত।'

সুইচ দেওয়া হল। এক ঝলক ছবি এসেই, পটাং করে একটা শব্দ হল। সব অন্ধকার। আমরা সবাই হায় হায় করে উঠলুম, 'কি হল গো!'

তিনি গম্ভীর মুখে পেছনটা উদোম করলেন। উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, 'যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওই যে ট্যাক্সিতে নিয়ে এলুম, রাস্তার যা অবস্থা! বললুম, আস্তে চালাও। ঝালাই খুলে গেছে। তাতাল আছে?'

গরজ বড় বালাই। আমরা ছুটলুম তাতালের সন্ধানে। পাওয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ টুপুর টাপুর করে এটা ঝাললেন, ওটা ঝাললেন। কাঁচকলা হল। টিভি বোদা মেরে রইল। 'ওরে বাপ্‌রে, দেরি হয়ে গেল। আমার আর একটা কল আছে।' মেকানিক ঠিকরে বেরিয়ে গেলেন। টিভির পেছনটা খোলাই রইল। বিকল্প টিভিটা তার পাশে এসে বসল। কিল, চড়, ঘুষি চলতে লাগল। গোলের মুখে বল আসা মাত্রই টিভি ভয়ে কাঁপতে থাকে। পর্দা বিবর্ণ সাদা হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ দেখার পরই মনে হয় অন্ধ হয়ে যাবো।
বাবা বললেন, 'এক মাস এইভাবে খেলা দেখলে আমরা ব্লাইণ্ড হয়ে যাবো।'
আমাদের পাড়ায় এক পরোপকারী যুবক আছে। 'তারা মা' আর আমার মা, দু'জনেরই ভক্ত। ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা। তাঁর ওই দৈর্ঘ্য দেখলে মনে বেশ একটা প্রশান্তি আসে। আগে তাঁর পুরোটাই আমরা পেতুম, ইদানীং অর্ধাঙ্গিনী এসে থ্রি-ফোর্থই নিয়ে নিয়েছেন। মাঝে মধ্যে তাঁর ওয়ানফোর্থ বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। সেও কম নয়। সেই যুবক করুণ মুখ দেখে বললেন, 'ভাগনে কি হয়েছে?'
সব শুনে বললেন, 'এই তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এখুনি একজনকে পাঠাচ্ছি যে কাটা টিভি, ফাটা টিভি সবই জোড়া লাগাতে পারে নিমেষে।'
তিনি একটা ব্রিফকেস হাতে এলেন বিকেলবেলা। সরেজমিন তদন্ত করে বললেন, 'এখুনি, এক মুহূর্তে করা যেত, কিন্তু আগে যিনি খুলেছিলেন, তিনি ছুটো ট্র্যানজিস্টার সরিয়েছেন। সেই ছুটো আনতে হবে, তার নম্বর দেখে অরিজিন্যাল মাল আনতে হবে কোম্পানি থেকে। তারপর দেখা যাবে।' আমাদের মাথায় হাত। বাবা অমনি বললেন, 'এই আমার এক বউ হয়েছিল! সব সর্বনাশ করে দিলে।' এক রাউণ্ড খাইখাঁচা হয়ে গেল। বাবার সঙ্গে ঘিঞ্চিকিড়ি হলে, মা ভীষণ ভাল রাঁধেন, নানারকম রাঁধেন; কিন্তু নিজে উপোস করে থাকেন। সে অনশন সহজে ভাঙানো যায় না। এক ভিসিয়াস সার্কেলের মতো হয়ে দাঁড়ায়। কি রকম? একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। উপবাসের পর হঠাৎ ভারি কিছু খেতে নেই। তাহলে পরের দিনও উপোস। ছু'দিন উপোসের পর তো আরও সাংঘাতিক অবস্থা। পেট তো একেবারেই খালি। সেই পেটে হঠাৎ কিছু পড়া মানে ভোঁচকানি লেগে যাওয়া। এটা আমার মায়ের ভাষা। মা আবার তাঁর মায়ের কাছ থেকে শিখেছেন। বংশপরম্পরায় চলে আসছে। অভিধানে নেই! আমার মায়ের বংশ আবার উপোসের বংশ। মা আমাদের ভোঁচকানির প্যাঁচে ফেলে আমরণের দিকে

ঠেলার চেষ্টা করবেন। কারণ উপোস ভাঙ্গার চেষ্টা করলে ভোঁচকানি লেগে মৃত্যু, আর না ভাঙ্গার চেষ্টা করলে অনাহারে মৃত্যু। এ যেন নেপালির ভোজালি! খাপ থেকে বের করলে রক্ত না নিয়ে ঢুকবে না। আমাদের তখন একটাই পথ—হোমিওপ্যাথি। বিষে বিষে বিষক্ষয়। আমরাও অনশন শুরু করি। কম্বলে বসে রামধুন গাইতে থাকি—রঘুপতি রাঘব রাজারাম, দানাপানি না পেয়ে যায় যাক প্রাণ। রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

বাবাকে বললুম, 'কি বোকার মতো কাজ করছ। বিশ্বকাপ যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তুমি না বলেছিলে একমাস কাপডিশ ভাঙাভাঙির মধ্যে যাবে না। পরিবেশ ফাউল্‌ করবে না। এক মাস লাগাতার আমাদের রাত জাগতে হবে। খেয়াল আছে তোমার। মা অনশন করলে কি হবে। প্যাচ আপ, প্যাচ আপ।'

বাবার হুঁশ হল। তিনি অমনি বলতে লাগলেন, 'আমার একমাত্র ভাল মানুষ বউটা, যার সার্ভিসে আমাদের এত লপচপানি, তাকে এইভাবে যে ট্র্যানজিস্টারের চোট দিয়ে যেতে পারে সে মানুষ নয়, মনুষ্যরূপী বরাহ। নিপাত যাক, নিপাত যাক।' বাবাকে প্রায়ই মিছিলে যেতে হয়। বাঙালি তো আসলে কাঙালি। সপ্তাহে একবার অন্তত অফিসপাড়া প্রদক্ষিণ করতেই হয়। ছুটির সময় গেট বন্ধ করে, সকলকে আটকে মিছিলে পোরা হয়। একটু হাঁটাও হয়। গলা সাধাও হয়—চলবে না, চলবে না। নিপাত যাক, নিপাত যাক। নিপাত যাকটা আন্তরিকভাবে সাধা ছিল বলে মায়ের অন্তর স্পর্শ করল। তিনি সব ফেলে ছুটলেন ট্রানজিস্টার উদ্ধারে।

তিন দিন গেল। আমরা চড়, চাপড় মেরে মেরে গোটা ছয়েক ঝাপসা ম্যাচ দেখলুম। প্রত্যেকের পাশেই আইড্রপস। চোখ যায় সে-ও ভাল তবু দেখব! প্রচারে, প্রচারে ছয়লাপ। ইতালি মাঠে উড়বে। জার্মানির পাঁচিল ভাঙা স্ট্রেংথ। ব্রাজিলের পায়ে গিটকিরি। আর্জেন্টিনার পায়ে গমক। স্পেনের পায়ে লয়কারি। রাশিয়ার ম্যারাথন। এমন দৌড়োবে, মাঠ ফুরিয়ে যাবে।

বিশ্বকাপের সুফল : বিশ্বশান্তি আনতে না পারুক, পারিবারিক শান্তি আনতে পেরেছিল।

অবশ্য সব বাড়িতে নয়। আমাদের পাড়ায় একটা মজার বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে ঝগড়া চলে পারমুটেশন কম্বিনেশানে। বাপ-ছেলে, বাপ-ছেলের বউ, বাপ-মা, মা-ছেলের বউ। কখনও সবাই একসঙ্গে, ফুল কনসার্ট।

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার খেলার দিন সকাল থেকেই ওই বাড়িতে ঠুসঠাস চলছিল। সন্ধের দিকে ঝেঁপে শুরু হয়ে গেল। সব ফ্রন্টই ওপেন হয়ে গেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকের মতো। যত রাত বাড়ে ততই ফায়ারিং বাড়ে। ম্যাচ যখন শুরু হল তখন ধুন্ধুমার। টিভি চলছে, ঝগড়াও চলছে। বাবা বলছেন ছেলেকে, 'তোমার বউ যদি মনে করে থাকে মাথায় পা দিয়ে চলবে, আমি সেই পা থেঁতো করে দোবো। আমার মাথাটা ন্যাশনাল হাইওয়ে নয়।' বাড়ির প্রবীণা বলছেন, 'ও গো, তোমরা চুপ করো গো। তোমাদের পায়ে পড়ি গো। পাড়ার লোক এরপর তোমাদের দূর করে দেবে।'

কর্তা বললেন, 'পাড়ার লোকের আমি খাই না পড়ি!'

এরই মাঝে কর্তা চিৎকার করে নাতিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রাজিলের কি অবস্থা! এনি গোল ?'

কর্তার ছেলে উত্তরটা দিলেন, 'তোমার ব্রাজিল আর সে ব্রাজিল নেই। হেরে ভূত হবে।'

'আরে চল্। মরা হাতি লাখ টাকা। পায়ে পেলের টাচ্। আই অ্যাম এ বরন্ সাপোর্টার অফ ব্রাজিল।'

ছেলে এক হুঙ্কার ছাড়ল, 'আই অ্যাম এ বরন্ সাপোর্টার অফ আরজেন্টিনা।'

কর্তা অমনি ভীষণ চিৎকার করে বললেন, 'ওরে আমার ম্যারাদোনা রে। তোর বউকে আগে বাগে রাখ।'

'তোমার মুখটাকে আগে বাগে রাখো।'
নাতি চিৎকার করল, 'দাদু ব্রাজিল আর একটু হলে গোল দিচ্ছিল।'
নাতির বাবার এক ধমক, 'অ্যায়, তুই কার সাপোর্টার ?'
নাতি বুক ফুলিয়ে বললে, 'দাদুর সাপোর্টার।'
চড়ের শব্দ। চিল চিৎকার। প্রবীণার আর্তনাদ, 'ওরে গেল রে। সব গেল।'

বিশ্বকাপের কুফল : যাঁরা ঝগড়া করতে চান বিশ্বকাপকে সাক্ষী রেখে, রাত আড়াইটে পর্যন্ত চালাতে পারেন। বিশ্বকাপ দিনের দৈর্ঘ্য বাড়িয়েছিল।

আমাদের আসল টিভিটা অবশেষে আরোগ্যলাভ করে ফাইনালের আগেই। আবার যেন না যায়, মা সত্যনারায়ণ মানসিক করলেন।
বিল হল আড়াইশো। কোম্পানি ধমক মেরে একশো গায়েব করেছে। সাড়ে তিনশো। ছবি তখনও মসলিনের মতো মিহি হয়নি। মিহিদানার মতো দানাদানা। ভদ্রলোক অ্যান্টেনা ইনসপেকশান করে এলেন। সে আর দশভুজা নেই, মাত্র দ্বিভুজ। বাবা তখন মিহি ফুটবল দেখার জন্যে দিলদরিয়া। নতুন পাখা বসে গেল। আড়াইশো।

বিশ্বকাপের সুফল : তুচ্ছ টাকা পয়সার হিসেব থেকে কর্তাদের মুক্তি দেয়। দিলদরাজ করে।

টিভির থেকে ছয় কি সাত হাত দূরে একটা ডিভান পাতা হয়েছে। এক-সঙ্গে চারজন স্বচ্ছন্দে বসা যায়। দু'পাশে আরও অনেক বসার জায়গা। বিশ্বকাপের মায়ফেল বসেছে। বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, বলতে পারো, কেন এত কষ্ট পাচ্ছি।'
সকলেই উদ্‌গ্রীব। সংসার যাকে ঘিরে ঘুরছে সেই মানুষটা কিসে কষ্ট পাচ্ছে জানা দরকার, 'তোমার কি চোখের কষ্ট হচ্ছে ? একটু চোখ বুজিয়ে শুয়ে পড় না। চোখ তো ছানাবড়া হয়ে আছে। সব খেলাই তো

একরকম। আমাদের উল বোনার মত। সাতটা সোজা একটা উলটো। সাত আটপা এগলো কি ল্যাং খেয়ে উলটে গেল। এদিক যায় ওদিক যায়, বল নিয়ে হেলুনি মারে কড়ার আলুর মতো। গোলপোস্টের সঠিক ধারণা তো কারোর নেই। চওড়া কতটা, কতটা উঁচু। গোলপোস্ট স্বর্গে থাকে না, মর্ত্যে। মারছে বেধড়ক শট, বল বেরিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। ইলেকট্রনিক গোলপোস্ট না হলে গোলের আশা কম। চোখে জলপটি লাগিয়ে চিৎ হয়ে প্রাণে আগে বাঁচো।'

বাবা বললেন, 'আরে এসব কষ্ট আমি গ্রাহ্য করি না। আমি কষ্ট পাচ্ছি সাপোর্টার হয়ে। কেন যে ব্রাজিলকে সাপোর্ট করে বসে আছি। কে বলেছিল আমাকে ব্রাজিলের সাপোর্টার হতে। মারাদোনার এখন স্টার তুঙ্গে।'

আমরা সাতজন বসে আছি শহর কলকাতার এক পল্লীতে। অথচ আমরা এক একজন এক এক দলের সাপোর্টার হয়ে বসে আছি। মা বললেন, 'রোজ সকালে গীতা পড়ছ, জানো তো কর্মে আমাদের অধিকার কর্মফলে আমাদের অধিকার নেই। খেলা দেখাই হল কর্ম। কর্মফল গোল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? নিরাসক্ত হয়ে যাও।'

আমার পিসতুতো ভাই মারাদোনার সাপোর্টার। পাড়ার ছেলেরা তার বাড়ির সামনে সাড়ম্বরে মারাদোনার কুশপুত্তলিকা দাহ করে গেল। পাড়ার ব্রজেনবাবু আমাদের বাড়িতে টিভি দেখতে আসেন মানবিক কারণে। স্ত্রী অসুস্থ। রাত আড়াইটে পর্যন্ত টিভি চালালে বধূহত্যার দায়ে পড়তে হবে। তিনি ডবল ব্যারেল গানের মতো, ডবল ব্যারেল একটা ফ্লাস্কে কফি নিয়ে আসেন। বললেন, 'লাস্ট চা খেয়েছি সেই সিক্সটিতে। তারপর আর ছুঁইনি। তখনও পর্যন্ত ছিল—টু খাড অ্যাণ্ড এ লিফ। এখন তো হোল ট্রি। পুরো গাছটা মুড়িয়ে মেশিনে ঢুকিয়ে কিমা করে দেয়।'

সেই কফি আমরা চুমুকে চুমুকে খাই আর যে যার মতো এক একটা দেশের সাপোর্টার হয়ে দম বন্ধ করে বসে থাকি। আমার এক কাকা

বসামাত্রই ঢুলতে থাকেন। রোজই তাঁকে বলা হত, না ঘুমিয়ে পুরো খেলাটা দেখতে পারলে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হবে। প্রথমটায় তিনি খুব চেষ্টা করতেন, শেষ ধ্যুততেরিকা টাকা বলে সোফায় গিয়ে লম্বা হতেন। নাক ডাকাবার আগে জড়ানো গলায় বলতেন, 'হোয়াট ইজ ইন এ ফুটবল !'

সামনের রাস্তায় চাপা অথচ গম্ভীর গলায় শোনা গেল হরিধ্বনি। বাবা চমকে উঠলেন, 'কে গেলেন ?'

'সত্যবাবু।'

'অ্যাঁ সে কি ! ফাইনালটা না দেখেই চলে গেলেন।'

বিশ্বকাপের সুফল : সব কিছু বাঁধা হয়েছিল বিশ্বকাপের সুরে। পারিবারিক সম্প্রীতি বেড়েছিল। প্রতিটি সন্ধ্যায় পরিবারে নেমে আসত উৎসবের পরিবেশ। ছোট ছোট সমস্যা, ছোট অসুখ সবই আমরা ভুলতে পেরেছিলুম। সকালবেলা বাড়িটাকে মনে হত শিবির। এ এখানে, সে ওখানে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। ভাতে ভাতেও কারো আপত্তি ছিল না।

বিশ্বকাপের কুফল : এক একটা বিশ্বকাপ মানে আমাদের চির অন্ধকার। লাগাতার আলোর পর লাগাতার অন্ধকার। সব পাওয়ার প্ল্যাণ্ট ভেঙে চুরমার। লোডশেডিং-এর বিশ্বরেকর্ড, বাইশ ঘণ্টা, বাহাত্তর ঘণ্টা, আটচল্লিশ ঘণ্টা।

ললিপপ

আমার নাম সম্বরণ সেন। আমার মনে হচ্ছে, একটু পরেই আমি মারা যাবো। আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। তা প্রায় মাস তিনেক হ'ল ভুগছি। বিছানায় পড়ে আছি। বয়েস আমার হয়েছে তবে যাওয়ার বয়েস হয়নি। আরও দশবছর থাকা যেত। আজকাল মানুষ সত্তর, আশি বছর হেসে খেলে চালিয়ে দেয়। দেখছি তো চারপাশে। দোষটা আমারই। এত বেশি ভোগ আমার সহ্য হ'ল না। দারিদ্র্যে মানুষ মরে না। মানুষ মরে অতিরিক্ত ভোগে। ভোগ এক প্রকার দুর্ভোগ বিশেষ।

আমি যে মরতে চলেছি, আমার বাড়ির লোকের তার জন্যে তেমন কোনও উদ্বেগ নেই। আমার বাড়িটা তেমন ছোট নয়। চারদিকে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সময়টা সন্ধ্যে। টিভি চলছে। গল্পগুজব হচ্ছে। সবই আমার কানে আসছে। আমার এইভাবে পড়ে পড়ে বেঁচে থাকাটা কারোরই তেমন পছন্দ হচ্ছে না। আমাকে আর প্রয়োজন নেই। দেনা-পাওনা মোটামুটি চুকে গেছে। এই যে আমি চলে যাচ্ছি কারোরই তাতে কোনও অসুবিধে নেই। বাড়ি রইল। গাড়ি রইল। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও মোটামুটি ভালই রইল। ছেলেরা বেশ তালেবর হয়েছে। মেয়ে দুটো নিজেরাই ভাল বিয়ে করেছে। দু'জনেই বিদেশে। ভাল ছেলেরা আজকাল স্বদেশ পছন্দ করে না। বেশির ভাগই সব আমেরিকায় থাকে। মেয়ে দুটো বছরে একবার করে আসে। দাড়ি কামাবার সাবান, ব্লেড, গায়ে মাখা সাবান, সেন্ট, এইসব গুচ্ছের দিয়ে যায়। পাঁচমিশেলী কথা বলে। আমেরিকান ইংরিজি। যার কিছুই আমি বুঝি না। আসে, এখানে ওখানে বেড়ায় আবার উড়ে চলে যায়। এবারেও এসেছিল। এসে বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিল। আমি ভুগছি কিন্তু মরছি না। কত

আর অপেক্ষা করবে। ছুটি ফুরিয়ে আসছে। নাতি, নাতনীর স্কুল, জামাইয়ের চাকরি। যাবার আগে সব বলে গেল, 'বাপি তুমি সাবধানে থাকবে। ভাল করে চিকিৎসা করাবে। কোনও ওষুধ লাগলে জানাবে। তোমাকে একবার ওখানে নিয়ে যেতে পারলে সাতদিনে চাঙ্গা করে দিতুম।' আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। তারা আমার কপালে হাত বোলাল। হাত তুটো কিছুক্ষণ ধরে রইল। চোখ তুটোয় সামান্য জল চিকচিক করল। অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম, কেমন সব পর হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে নিজের চেয়ে আপনার কে আর আছে। এই যে আমি যাচ্ছি, এতে করে কি! আমার আমিটাই যেতে বসেছে। আমার আমিটাই চলে যাবে!

আমার বউ কোনওকালেই খুব একটা সুস্থ ছিল না। বড় লোকের মেয়ে। আমার অবস্থাও ভাল ছিল। এই ভাল অবস্থাই শরীরের কাল হয়। আয়েসে বাতে ধরে। সুগার হয়, প্রেসার হয়। হার্ট কমজোর হয়। চোখ খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

বার্ধক্যের আগেই অথর্ব হয়ে পড়ে। তাই হয়েওছে। আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসে, ওঘর থেকে এঘরে, দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মত। আমার শরীরের কথা তিনটে হলে, নিজের শরীরের কথা তিরিশটা হয়। বেশ বুঝতে পারি বাঁচার ইচ্ছা প্রবল। সহজে মানুষ কি মরতে চায়। আমাদের তু'জনের মধ্যে তেমন একটা দহরম মহরম প্রেম ছিল না। পাশাপাশি বসবাস করতুম। সম্পর্কটা ছিল দেনাপাওনার। এক তরফা কর্তব্যের বন্ধন। কার যে দোষ, তা আমি বলতে পারব না। সংসারের বিচারে আমিই অপরাধী। এই যে আমি চলে যাবো, মহিলার মনে সামান্য হয়তো লাগবে, তবে অন্য সকলে বেশ একটু আরামই পাবে। আমার তুই পুত্রবধূই শিক্ষিতা, সুন্দরী। একালের মেয়ে সেবাটেবায় তেমন অভ্যস্ত নয়। ভদ্রতার খাতিরে সারা দিনে একবার তুবার আসে, যেন হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্সের

ভিজিটার। সেজেগুজেই আসে। তারা সব সময়েই খুব সেজে থাকে, কেন তা বলতে পারব না। আমাকে দেখার জন্যে একজন নার্স রেখেছে। পয়সায় কি আর সেবা পাওয়া যায়। মেয়েদের একটা ব্যাপারে বেশ মজা লাগে, যখন তারা শ্বশুর বাড়িতে তখন তারা বাপের জন্যে হেদিয়ে মরে। আবার যখন তারা বাপের বাড়িতে তখন শ্বশুরমাইয়ের জন্যে দরদ উথলে ওঠে। আসল ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলেছি। তাদের সবটাই ভাসা ভাসা উড়ু, উড়ু। মনগুলোই সব মরে গেছে। তাদের কাছে কোনও কিছুই আর কিছু নয়।
যে পৃথিবীতে আমি জন্মেছিলুম, সে পৃথিবী আর নেই। এক জীবনেই সব উল্টেপাল্টে গেল। কে যে আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে তাও জানি না। ছেলে দুটোকে তো কাল থেকেই দেখছি না। কানে একটা কথা এসেছিল। বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যেই, 'বাবা এখন সহজে যাবে না। ওই পড়ে পড়ে কত বছর চালায় একবার দেখ।' আর একজন বলছে, 'এইভাবে পড়ে থাকার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল, সুনার দি বেটার।' আমি যে শুনতে পাচ্ছি এই বোধটাও ওদের ছিল না, বা আমাকে শোনাবার জন্যেই বলছিল। আমি শুনবো, লজ্জা পাবো। সে লজ্জায় তাড়াতাড়ি মরে যাবো। মুশকিল হ'ল—জন্ম আর মৃত্যু দুটোই মানুষের হাতের বাইরে। খুব গর্ব নিয়ে বেঁচে ছিলুম। এখন যথেষ্ট লজ্জা নিয়েই চলে যাই। কানে নানারকম শব্দ আসছে। বাচ্চাদের হইচই। মেয়েদের ঝগড়া। আজ বোধহয় ওরা কোন বিয়ে বাড়িতে যাবে। দুপুরে সব চীনে দোকান থেকে চুলের কায়দা করিয়ে এসেছে।
আমার দুই ছেলেই পছন্দমতো বিয়ে করে এসেছে। আমাকে তারা জানিয়েছিল। মত, অমতের কোনও প্রশ্ন ছিল না। তুমি শুধু শুনে রাখো। আমরা আমাদের বউ আনছি। নির্বাচন আমাদের। উৎসবাদির খরচপত্তর সব তোমার। বড় বউটি খুব খড়খড়ে। পুরুষালী গলা। আমার ছেলের ওপর তার খুব কর্তৃত্ব। ছোট বউটার মৃদু স্বভাব।

একটু চাপা ধরনের। মাঝেমধ্যে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। রবীন্দ্র সঙ্গীতে বেশ পারদর্শী।

এই মেয়েটাই মাঝেমধ্যে আমার কাছে আসে। একটু সেবা করার ইচ্ছেও দেখায়। সময় পায় না। ছোট ছেলেটা তার ভারি নেওটা। সে যতক্ষণ বাড়ি থাকবে ছোটর টিকির দেখা পাওয়া যাবে না। বাড়ির কাজকর্ম ওদের করতেই হয় না। কাজের লোকের অভাব নেই।

আমার চেতনা ক্রমশই আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। কারো সম্পর্কেই আমার আর বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। এখুনি চলে যেতে হবে বলে, আমার কোন দুঃখও নেই। আমার বাঁচা আমার পঞ্চাশ বছর বয়সেই শেষ করে ফেলেছি। মানুষ বেগে চললে, তিন দিনের পথ একদিনেই অতিক্রম করতে পারে। আমিও তাই করেছি। আমার জীবনে কিছু পাপ ছিল। ভোগীদের যা থাকে। আমার তাই ভয়—মৃত্যুর পর আমার কি গতি হবে—স্বর্গে না নরকে!

আমার অতীত ভেসে আসছে। আমার বাবাকে আমি কি করে-ছিলুম। আমাদের কাগজের ব্যবসা। বাবা অথর্ব হয়ে বসে গেলেন। আমরা দু'ভাই বসে গেলুম দোকানে। আমি ব্যবসা সামলাই, দাদা সামলায় বাজার। আমি অ্যাকাউন্টস, দাদা সেলস্। অ্যাকাউন্টসের কারচুপি শুরু করে দিলুম। পারিবারিক ব্যবসায় কতদিন ভূতের বেগার খাটা যায়। নিজের ব্যবসা চাই, যে ব্যবসায় কোনও অংশীদার থাকবে না।

টাকা সরাতে লাগলুম। দাদাটা গোবেচারা মত ছিল। গাধার মত খাটতে পারত। হিসেবটিসেব তেমন বুঝতো না।

কারচুপিটা বাবাই ধরলেন। যখন ধরলেন ব্যবসা তখন ফোঁপরা। গাড়িটাড়ি সব বিক্রি হয়ে গেল। বাবা আমাকে স্রেফ দূর করে দিলেন। এক্ষেত্রে স্নেহ নিম্নগামী হল না। বিলিতি মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি।

আমি তো এইটাই চেয়েছিলুম। আমার নিজের ব্যবসা তখন শুরু

হয়ে গেছে। সব খদ্দের আমার হাতের মুঠোয়। বাবা আর্থ্রাইটিসে পঙ্গু। আমি দেখলুম এই মওকা। আলাদা হয়ে যাই। জয়েন্ট থাকলেই ওই অথর্বের সেবায় অকারণ খরচ হবে। খেটে মরতে হবে। বড়র ওপর যখন টান, তখন বড়ই দেখুক। ঝপ করে এই ফ্ল্যাটটা কিনে ফেললুম। একদিন সামান্য ছুতোয় তুলকালাম একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলুম। সেই দিনই গৃহত্যাগ।

বাবা আমাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। আমি গ্রাহ্যও করিনি, তখন আমার রমরমা চলছে। ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে। দু'নম্বরী পয়সায় সাঁতার কাটছি। পৃথিবীতে বাপমায়ের আশীর্বাদের এক কানাকড়িও দাম নেই। পয়সাই হ'ল সব। মদ আর মহিলা দিয়ে বড় বড় পার্টিকে ঘায়েল করি। বড়র ব্যবসা লাটে উঠে গেল।

চীনেবাজারে ছোট্ট একটা দোকানে এসে দাঁড়াল। বাবা বললেন, ওই চোরের আমি আর মুখদর্শন করব না। ভালই হ'ল।

কোনও ঝুট্ ঝামেলা আর সামলাতে হ'ল না। মদ মেয়েমানুষে খরচের ব্যাপারে মানুষ দিলদরিয়া. বাপমায়ের ব্যাপারে যত কৃপণতা। হাত গলে একটা নয়া পয়সাও বেরোতে চায় না। বাবা কি বেদনা নিয়ে গেলেন, তখন আমার বোঝার মতো বোধ ছিল না। শ্মশানে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম। নিতান্তই এক দর্শকের মতো। দুঃখ-টুঃখ কিছুই হল না। মনে হয়েছিল, কে কার বাবা! কে কার ছেলে। পৃথিবীতে সবাই জীব। জন্মাবে মরবে। এর মধ্যে আর কোনও ব্যাপার নেই। শ্রাদ্ধের ঝামেলাটা দাদার ঘাড়েই চাপল। পিতৃভক্ত ছেলে তুমি। পিতার আশীর্বাদ তো দেখছ। হাঁড়ি চড়ে না তোমার এমন অবস্থা। আমি কিছু চাঁদা দিতে চেয়েছিলুম। বারোয়ারী পুজোয় হাজার হাজার টাকা চাঁদা দি. পিতার শ্রাদ্ধে না হয় কিছু দিলুম। তা তেনার প্রেস্টিজে লেগে গেল। বললে, 'টাকা কি হবে, পাপের টাকা।' শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর দিলুম একটা কেস ঠুকে। বিষয় সম্পত্তি বলতে বসতবাটি আর চীনেবাজারের দোকানের

আধখানা। আমার প্রাপ্য। কিছু কি অন্যায় করেছিলুম ভগবান। পৃথিবীতে নিজের ভাইয়ের চেয়ে ঘৃণার আর কি আছে। দাদা আমার সঙ্গে টাকার লড়াইয়ে পারবে কেন। কোর্টের রায়ে সব দু'আধখানা হল। বাড়ি দু'ভাগ, দোকান দু'ভাগ। শেষে রফা হ'ল টাকা দিয়ে পুরোটাই আমি কিনে নোব। দাদা তার অংশটা আমাকে বেচে দিয়ে বুদ্ধিমানের মত সরে পড়ল। আমার আনন্দ আর ধরে না। ভাইকে পথে বসাতে পেরেছি। দাদা যে-টাকা পেয়েছিল সেই টাকায় কলকাতার মত শহরে কিছু হয় না। দাদা চলে গেল বর্ধমানে, তার এক ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে।

কিন্তু শেষমেষ কে জিতল ?

দাদাই জিতল। দাদার ছেলে আর মেয়ে দু'জনেই মানুষ হয়েছে. ছেলে বিজ্ঞানী। মেয়ে আধুনিক ইতিহাসে ডক্টরেট। দু'জনেই আমেরিকায়। দাদা ও বউদি আমেরিকায় ছেলের কাছে মহা আরামে। আর আমি ? আমি পড়ে আছি অবহেলায়। পড়ে পড়ে খাবি খাচ্ছি। আর কতক্ষণ ! মরার আগে মানুষের অতীত চোখের সামনে খেলা করে যায়। যন্ত্রণা দেয়। এখন আমার পাপপুণ্যের বিচার হচ্ছে। যৌবনে যা পাপ মনে হয়নি, এখন মনে হচ্ছে পাপ ভয়ঙ্কর রকমের পাপ। আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে যে-সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল তাতে আমি দু'জনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি—আমার স্ত্রীর সঙ্গে, আমার সেই ভালমানুষ বন্ধুর সঙ্গে। সেই বোকাটা তার স্ত্রীকে ভীষণ বিশ্বাস করত। উন্মাদের মতো ভালবাসত। আমি সেই সুযোগটাই নিয়েছিলুম। কেন নিয়েছিলুম !

সেই প্রশ্নটাই আমি এখন আমাকে করছি। উত্তরও খুঁজে পেয়েছি—আমার মনের বিকৃতি। পবিত্রকে অপবিত্র করার আনন্দ। মানুষের ঘর ভেঙে দেবার পৈশাচিক আনন্দ ? মানুষের সমস্ত গোপনীয়তাকে তছনছ করে দেবার আনন্দ। ফল কি হল ! নিজের সংসারটাই এলোমেলো হয়ে গেল।

আমি চোর। আমি লম্পট। আমার তো স্বর্গে স্থান হবে না। আমি লোভী। আত্মপর স্বার্থপর। আর তো সংশোধনের উপায় নেই। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছি।

একবার মনে হল আমার পরলোকগতা মা আমার মাথার কাছে এসে বসেছেন। আমার কপালে রেখেছেন তাঁর স্নিগ্ধ কোমল হাত। ওই হাত একদিন আমি ঘৃণায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলুম। সেই স্মৃতি আমার মনে ভেসে উঠছে। জীবনের শেষের দিকটায় মায়ের শুচি-বাই হয়েছিল। আমার তখন ভীষণ অসুখ। মা আমাকে দেখতে এলেন। আমার নামে কালীঘাটে পুজো দিয়েছেন। মায়ের পায়ের ফুল আমার মাথায় ঠেকিয়ে আকুল হয়ে বললেন—মা ছেলেটাকে ভাল করে দাও। আমি মনে মনে হাসলুম—বড় বড় ডাক্তার আমাকে দেখছেন, বৃদ্ধার কি কুসংস্কার। একটা জবা ফুল আমাকে ভাল করে দেবে! মা তারপর আমার কপালে হাত রাখলেন। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে হাজা। আমি হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম—আমাকে বিরক্ত কোরো না। একটু একা থাকতে দাও আমাকে। তুমি ও-ঘরে গিয়ে বোসো। মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে উঠে চলে গেলেন পাশের ঘরে। তখন আমার কিছু মনে হয়নি। পরেও মনে হয়নি। আজ মনে হচ্ছে। আজ আমার চোখে জল আসছে। মায়ের কথা মনে পড়ছে। ছোট ছেলে বলে মা আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। সেই মাকে আমি দেখিনি।

জীবনের নেশায় ভুলে ছিলুম। মা যখন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়, আমি তখন ব্যাঙ্গালোরে ফুর্তি করছি। একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত বৃদ্ধা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এ আর এমন কি ঘটনা।

আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। বুকের ওপর পড়ে আছে আমার অবশ দুটো হাত। জীবনের ঘড়িতে শেষ যে দু'এক পাক দম আছে ধীরে ধীরে তা খুলে যাচ্ছে। একটু পরেই পেণ্ডুলাম থেমে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে ভাসছে এক রক্তাক্ত দৃশ্য।

চৌত্রিশ নম্বর হাইওয়ে ধরে আমার নতুন গাড়ি চালিয়ে আমি চলেছি। একটু মত্ত অবস্থা আমার। আমার পাশে বসে আছে সন্দেহজনক চরিত্রের এক মহিলা। মালদার কাছে দূর থেকে দেখছি মা তার শিশুটির হাত ধরে চলেছে। স্পিডোমিটারে কাঁটা পঁচাত্তর আশির মধ্যে দুলছে। হঠাৎ শিশুটি মায়ের হাত ছেড়ে রাস্তার দিকে সরে এল। আমি ব্রেক কষতে পারতুম। হয়তো গাড়িটা উল্টে যেত। আমি ডানদিকে একটু কাটাতে পারতুম। কি যে করতে পারতুম আমি জানি না। আমার গাড়ি শিশুটিকে থেঁতলে দিয়ে ঝড়ের বেগে সামনে ছুটে গেল।

সেই মহিলা, যে আমার পাশে বসে নেশায় টাল খাচ্ছিল, সে একটা ছোট্ট চিৎকার করল। জড়ানো গলায় বললে, এই তুমি কি করলে! আজ আমি আমার পথের পাশে সেই মাকে দেখতে পাচ্ছি, রক্তাক্ত সন্তানের দেহটি বুকে ধরে বসে আছে। সর্বোচ্চ আদালতে বিচারের আশায়।

আচ্ছা! ওটা তো ছিল দুর্ঘটনা। খুন তো নয়। তবু কেন খুন করেছি বলে মনে হচ্ছে। কিছুতেই দৃশ্যটা সরাতে পারছি না চোখের সামনে থেকে। শিশুটি কি চাপা পড়ার সময় দু'হাত তুলে মা বলে ডেকেছিল?

আমার তরুণ বয়সের চেহারাটা ভেসে উঠছে। এক মাথা চুল। অসুন্দর একটা মানুষের সুন্দর একটা মুখ। চেহারাটা তো সাংঘাতিক ভাল ছিল। হিরোর মতো। সুন্দর চেহারা হলেই যে সুন্দর মানুষ হবে এমন কোনও কথা নেই। তার প্রমাণ আমি নিজে।

আর কতক্ষণ। একটা গান শুনতে ইচ্ছে করছে—ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে? কে শোনাবে। কেউ তো নেই। আমি চলে যাবার অনেক পরে কেউ হয় তো এক ফাঁকে আসবে। এসে দেখবে আমি নেই। এবারের খেলা সাঙ্গ করে চলে গেছি।

আমার একটা ফুটফুটে সুন্দর নাতি আছে। দেবশিশুর মতো দেখতে। ছোট ছেলের ছেলে। মা খুব সুন্দরী। শুনেছি একটা দুটো সিনেমায় অভিনয় করছে। ছোট ছেলে প্রেম করে বিয়ে করেছে। ছোটর ঘাড়ে সিনেমার ভূত এখনও চেপে আছে। হিরো সে হবেই। নাতিটা এই বছর চারেক হ'ল পৃথিবীর খাতা খুলেছে। খরগোসের মত চোখ। সিল্কের মতো মসৃণ গায়ের ত্বক। ভেতরের যন্ত্রপাতি সব ঝকঝকে নতুন। প্রাণশক্তিতে একেবারে নতুন মটোর গাড়ির মতো। হঠাৎ আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। ছেলেটা মাঝে মাঝেই আসে। আদো আদো গলায় যত আবোল তাবোল বকে। ওই আমার একমাত্র সঙ্গী। প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দেয়। যখন আমার শক্তি ছিল সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করতুম। বাছা বাছা গল্প শোনাতুম। পৃথিবীর সৎ সুন্দর জীবনের গল্প। সাহসের গল্প, বীরত্বের গল্প। ভালবাসার গল্প। মনে হত, যে-পৃথিবীকে আমি ভুলে ছিলুম, সেই পৃথিবীর গল্প শোনাতে শোনাতে ক্রমশই আমি পবিত্র হয়ে উঠছি। একটু একটু করে আমার সমস্ত পাপ মুছে যাচ্ছে। শিশুটি বুঝতে পারে না, কেন আমি সব সময় শুয়ে থাকি। কেবলই ঠেলবে, আর বলবে, খালি খালি শুয়ে আছে! বেড়াতে যায় না, কিছু না। ওঠো না ওঠো!' কচি কচি পা দিয়ে আমাকে প্রাণপণে ঠেলতে থাকবে। ঠেলতে ঠেলতে এক সময় নিজেই শুয়ে পড়বে। তার পা দুটো আমার পেটের ওপর শিথিল হয়ে পড়ে থাকবে। নিজের গোল গোল হাত দুটো নিয়ে খেলা করবে। আপন মনে গান গাইবে। তারপর এক সময় হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

সে এখন আমার মাথার কাছে। কি একটা চুষছে চকচক করে। বাঁ হাতটা একবার আমার কপালে রাখল। ঠাণ্ডা নরম কচি একটা হাত। পদ্ম ফুলের কুঁড়ির মতো। অনুযোগের গলায় বললে, এঃ এখন ঘুমোচ্ছে। এখন কেউ ঘুমোয় না কি বোকা!

আমি তার হাতটা ধরার চেষ্টা করলুম। অবশ হাত উঠল না।

সে বললে, 'ললিপপ খাবে?'
আমি বলতে চাইলুম, 'তুমি খাও।'
অদ্ভুত একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরলো না কণ্ঠ দিয়ে।
সে বললে, 'বাবা ভয় করছে।'
ভয় তো করবেই। সবে এসেছে পৃথিবীতে। মৃত্যু তো দেখেনি। মানুষের, পাপী মানুষের চলে যাওয়াটা যে ভয়ঙ্কর। একটু একটু করে, তিলে তিলে প্রাণ বেরোয়। বহুক্ষণ বহুক্ষণ পথ খোঁজে কোথা দিয়ে বেরোবে। চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে নাক দিয়ে, কান দিয়ে।
নিজের মুখ থেকে আধ চোষা ললিপপটা বের করে সে আমার ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। বড় চঞ্চল। জরুরি কোনও কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।
আর কিছুক্ষণ থাকলে সে দেখতে পেত। মৃত্যুর আতঙ্কে আমার চোখ বিস্ফারিত হচ্ছে। ঠেলে বেরিয়ে আসছে বাইরে। আমার ঠোঁটে গোঁজা ললিপপ।
জীবন বড় তিক্ত ছিল। মরণের মধুর স্বাদ ঠোঁটে নিয়ে চিরবিদায়।

তোমার তরবারি

কাঁধের ভারি ঝোলাব্যাগটা কোনও রকমে একপাশে নামিয়ে রেখে বাবা সেই ধুলোভর্তি রকের ওপরেই শুয়ে পড়লেন। বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাঁড়া একটু জিরিয়ে নি।' সেই ছিল তাঁর জীবনের শেষ কথা। আমি তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লুম। ভাঙাচোরা একটা মুখ। অল্প, অল্প দাড়ি। দুটো চোখ কোন গভীরে তলিয়ে আছে। সাদা মোটা কাপড়ের শার্ট। মালকোঁচা মারা ধুতি। আধময়লা। কব্জিতে কতকাল আগের পুরনো মডেলের একটা ঘড়ি।

আমি বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললুম, 'তুমি একটু জল খাবে?'

কোনও উত্তর নেই। 'বাবা, তুমি একটু জল খাবে?'

দশ-বারো বার ওই একই কথা বলার পর, যখন কোনও উত্তর পেলুম না, তখন আমি আকাশের দিকে তাকালুম। খাঁ খাঁ করছে রোদ। একটা চিল কি কাকও উড়ছে না। বাবার হাতঘড়িতে সময় তিনটে। এ রাস্তায় ট্রাম, বাস কিছুই চলে না। দু'চারজন লোক কেবল চলছে নিজের কাজে হনহন করে। মাঝেমধ্যে একটা দুটো রিকশা যাচ্ছে টুংটাং করে। এলিয়ে আছে যাত্রী। পাড়াটা অফিসপাড়া নয়। এমনি পাড়া। একটু দূরেই অবশ্য ভয়ঙ্কর কলকাতা। কলকল করে ছুটছে। গর্জন করছে। একটু আগে আমরা ওই কলকাতারই একটা অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই দিকে চলে এসেছি। রাস্তার ধারে নতুন, পুরনো বাড়ি।

যে বাড়ির রকে বাবা শুয়ে পড়েছিলেন সেই বাড়ির বাইরের ঘরের জানালা খুলে গেল। এক বৃদ্ধা মহিলা উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমরা?' সুন্দর রং, সুন্দর চেহারা, চোখে পুরু চশমা। কি

বলবো? আমরা কে? আমরা উটকো লোক। আমাকে অবাক তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি ফেরিওলা?'
উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে সরে গিয়ে বললুম, 'মা, আমার বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।' মা বলায় ভদ্রমহিলার মুখের চেহারা পাল্টে গেল। তিনি সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পায়ে নরম চটি। পরিষ্কার ধবধবে সাদা কাপড়। ফুরফুরে কাঁচাপাকা চুল। মুখে মনে হয় কোনও মশলা। অল্প, অল্প চিবোচ্ছেন। তাঁর পায়ের কাছে আমার বাবা চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তিনি নিচু হলেন। আরও নিচু। আরও নিচু। বসে পড়লেন বাবার মাথার সামনে। পাথর বসানো সোনার আংটি পরা একটা আঙুল বাবার নাকের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রেখে আবার মুখের দিকে তাকালেন। বড় বড় চোখ। তাকিয়ে আছেন। তাকিয়েই আছেন। হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়ালেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমার বাবা মারা গেছেন বাবা।'
'মারা গেছেন?'
মাথা ঘুরে হয়তো পড়েই যেতুম। এক ফোঁটা জলও আমি বাবার মুখে দিতে পারলুম না। আমার বাবা বিলিতি বইয়ের ব্যবসা করতেন। ঝোলায় নানা রকম বই নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরতেন। ব্যাঙ্কে, খবরের কাগজের অফিসে। অন্য অফিসে। যাঁরা বড় চাকরি করেন, অনেক টাকা মাইনে পান, বেশ বড়লোক, অথচ লেখাপড়া করতে ভালোবাসেন, তাঁরা সব বাবার কাছ থেকে বই নিতেন। বাবা নিজেও খুব পড়তেন। বলতে পারতেন, কোন বই ভাল, কোন বই কার পড়া উচিত। সেই কারণে বাবাকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। আমার বাবার চেহারার মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। আগে একটা বেসরকারী অফিসে খুব ভাল চাকরি করতেন। গাড়ি ছিল। হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে দিলেন। অশিক্ষিত মালিক

বাবাকে অপমান করেছিল কি একটা ব্যাপারে। পয়সার গরমে যা-তা বলেছিল। সকলকেই বলত। অন্য সবাই সহ্য করত। প্রতিবাদ করত না। সেই পয়সাঅলা লোকটা কর্মচারীদের কুত্তা ভেবে খুব আনন্দ পেত। জানত, এই বাজারে মোটা টাকার মাইনে ছেড়ে কেউ যেতে পারবে না। টাকার লোভে সবাই গালাগাল হজম করবে আর লেজ নাড়বে। বাবাকে সে চিনত না! নাকের ডগায় চাকরি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক কথায় চলে এসেছিলেন। রইল তোর চাকরি। আমার মা-ও খুব তেজী। মা বলেছিলেন, 'বেশ করেছ। অসম্মানের অন্নের চেয়ে সম্মানের উপোস ভাল।' বাবা আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'উৎপল, জীবনটাকে এমনভাবে তৈরি করো যাতে স্বাধীন জীবিকায় যেতে পারো। দাসত্ব যেন করতে না হয়। বড় দাস, ছোট দাস, দাসের দাস, পৃথিবীটা দাসে দাসে ভরে গেল। যে যত বড় দাস, তার ভেতরটা তত ছোট। লোকটা একেবারে কেঁচো হয়ে যায়। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেও ভুলে যায়। নিজে প্রতি মুহূর্তে যেমন অপমানিত হয়, অন্যকেও সেই রকম অপমান করে। ভাল খায়, ভাল পরে, গাড়ি চাপে, বিদেশ যায়; কিন্তু সব সময় একটা ভয়, একটা আতঙ্ক তাকে তাড়া করে ফেরে।' ইচ্ছে করলে বাবা অন্য কোথাও চাকরি করতে পারতেন। তা আর করলেন না। করলেন বইয়ের ব্যবসা। কোনও দোকান নয়! বাড়িতেই বই, ম্যাগাজিন সব এনে জড়ো করতেন। তারপর বিশাল একটা কাঁধ-ব্যাগে ভরে বেরিয়ে পড়তেন রাস্তায়। ব্যাগটা কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকত; তেমনি ভারি হতো বইয়ের ওজনে। সেই ভারে বাবা একপাশে একটু হেলে যেতেন। ব্যায়াম করা শরীর। বাবা কিছু গ্রাহ্য করতেন না। মা মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলতেন বাবার কষ্ট দেখে। গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, বাবা ঘুরছেন পথে পথে। গর্ব করে বলতেন, 'আমি মা সরস্বতীর ফেরিঅলা।' মায়ের চোখে জল দেখলে বলতেন, 'বোকা, সবসময় জানবে, সুখের জীবন ভোঁতা, দুঃখের জীবন ধারাল। দুঃখের যে সুখ সেটা একেবারে খাঁটি,

নির্ভেজাল।' বাবা যখন চাকরিতে ছিলেন, তখন আমাদের জীবন ছিল বড়লোকদের মতো। বাড়িতে তিন তিনজন কাজের লোক। ঝকঝকে খাবার টেবিল। ফ্রিজ। ঠাণ্ডা জলের বোতল। সকালে পুরু মাখন লাগানো টোস্ট। ডিম, কলা। রাতে মুরগীর ঝোল। পদ্মফুলের মতো ফুলকো পাঁউরুটি। সাদা একটা মটোরগাড়ি গোয়ালের গরুর মতো সর্বক্ষণ বাঁধা। কত সুখ; অথচ সে-সুখ আমরা তেমন বুঝতে পারতুম না। বিরক্তি লাগত, একঘেয়ে লাগত, মন খারাপও হতো। রাগ হতো। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবরা খুব আসত। অকারণে বাবার প্রশংসা করত। মাকে বলত, মা লক্ষ্মী। এমন দেবীর মতো মেয়ে তারা বইয়ে পড়েছে। দেখেনি কোনও দিন, এই প্রথম দেখছে। মাকে কোনও কাজ করতে দেখলে অন্য বউরা ছুটে এসে বলত, 'ও মা! তুমি করবে কি? আমরা কি জন্যে রয়েছি! অমন চাঁপার কলির মতো আঙুলে কেউ বাসন মাজে! ও মা! তুমি রাঁধছ কেন! রান্নার লোক আসেনি!' কত শত আদিখ্যেতা করত তারা। যেই বাবা চাকরি ছাড়লেন, টান মেরে ফেলে দিলেন জীবনের সব বিলাসিতা, তাদের আর টিকির দেখাও পাওয়া যেত না। পথেঘাটে দেখা হয়ে গেলে বলত, 'আর একেবারেই সময় পাই না। সাত কাজে ভয়ংকর ব্যস্ত।' বাবা হাসতেন, "জগতের নিয়ম কিছুই পাল্টাল না। যা ছিল তাই আছে। সুখের পায়রারা সুখের পায়রাই রয়ে গেল। দুঃখের দিনে সেই চড়াই পাখি। দিনের পর দিন লুচি-কচুরি, আম, রাজভোগ, কাটলেট, ফিশফ্রাই কত উড়িয়ে গেল! পেটে কিছুই রইল না। বেরিয়ে গেল মল হয়ে। মলত্যাগ না বলে কৃতজ্ঞতা ত্যাগ বলাই ঠিক।

আমি বোকার মতো একই প্রশ্ন আবার করলুম, 'মারা গেছেন? মারা কেন যাবেন?'

বৃদ্ধা আমাকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা মানুষের নেই বাবা।'

'এখন তাহলে কি হবে ?'

'একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রৌঢ়া দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটু উঁচু গলায় ডাকলেন. 'জগন্নাথ, জগন্নাথ!'

সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। খাটো ধুতি পরা. গায়ে গেঞ্জি, কোমরে তোয়ালে জড়ানো, 'কি বলছ মা ?'

'শোনো, এই ভদ্রলোককে তুমি তুলে বিছানায় শুইয়ে দাও। ইনি মারা গেছেন।'

'বিছানায় শোয়াবো মা ?'

'অবশ্যই! আমি যখন মারা যাবো, কোথায় মরবো ? বিছানাতেই মরবো নিশ্চয়!'

বাবাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে জগন্নাথবাবু বাইরের ঘরের ডিভানে শুইয়ে দিলেন। মনে মনে ভাবলুম, ইস্, এত ভাল বিছানাটা নষ্ট হয়ে গেল। প্রৌঢ়া চেয়ারে বসে বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলুম. সৎকার সমিতির গাড়ি আনিয়ে তোমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দোবো। তাতে মনে হয় অসুবিধে হবে। ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া তারা হয়তো নিতে রাজী হবে না। আমি আমাদের ডাক্তারকে কল দিচ্ছি, তুমি আর জগন্নাথ গিয়ে মাকে ডেকে আনো। ট্যাকসিতে যাবে, ট্যাকসিতেই আসবে।'

সমস্ত টাকা-পয়সা বাবার পকেটে। আমি বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ভাবছি, কি করে হাত দোবো বাবার গায়ে! খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে ; কিন্তু কাঁদতে পারছি না। এখন তো কান্নার সময় নেই। সমস্যা সমাধান করতে হবে। অনেক কাজ। জানি, বাবার বুকপকেটে টাকা আছে। মৃত মানুষের পকেট থেকে টাকা নোবো কি করে, চোরের মতো!

মহিলা বললেন, 'তোমার সমস্যাটা বুঝেছি আমি। টাকার সমস্যা! তোমাকে ভাবতে হবে না, জগন্নাথই সব করবে। জগন্নাথ,

গায়ে একটা জামা চড়িয়ে এসো। যাবার পথে ডক্টর মিত্রকে বলে যাও, এখুনি একবার আসতে। কি হয়েছে কিছু বলার দরকার নেই।'

ট্যাকসি আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। সদর দরজা বন্ধ। মা মনে হয় ভেতরে কোনও কাজে ব্যস্ত। দু'তিন বার কড়া নাড়ার পর মা দরজা খুললেন। দেখেই মনে হলো একটু আগে বাথরুম থেকে গা ধুয়ে বেরিয়েছেন। খুব পরিষ্কার দেখাচ্ছে মাকে। চোখে চশমা। এক হাতে চিরুনি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চলে এসেছেন। কপালে এখনও পরা হয়নি বিকেলের সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতেও লাগান হয়নি। মা এইসব খুব মানেন। সামনে ট্যাকসি আর অপরিচিত জগন্নাথকে দেখে মা একটু অবাক হলেন, 'কি ব্যাপার?'

অনেক কষ্টে নিজেকে চেপে রেখে বললুম, 'তুমি একবার চলো মা, এঁদের বাড়িতে বাবা খুব অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন।'

'কি হয়েছে?' মায়ের মুখটা কালো হয়ে গেল।

'তুমি চলো, শরীর খুব খারাপ লাগছিল বলে শুয়ে পড়েছেন।'

মা তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগিয়ে ট্যাকসিতে উঠলেন। আমাদের বাড়ির সামনে সন্তোষদার বিড়ি, সিগারেট, ধুপ, দেশলাই-এর দোকান। আমাদের ভীষণ ভালবাসেন। বাবাকে বলেন, 'আমার দেবতা'। মা সন্তোষদাকে বাড়িটার দিকে একটু চোখ রাখতে বললেন।

ট্যাকসি থেকে নেমে আমরা যখন বাইরের ঘরে ঢুকলুম, তখন ডাক্তারবাবুর সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছেন সোফায়। একটু দূরে বসে আছেন সেই বৃদ্ধা। বাবার শরীরে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়েছেন। মুখটাই কেবল জেগে আছে। মাকে দেখেই বৃদ্ধা উঠে এসে হাত ধরলেন। তিনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মা বললেন, 'জানি। আমি জানতুম, প্রস্তুত ছিলুম। আজ আর কাল। তবে এইখানেই হবে তা জানতুম না।' মা বাবার পাশে গিয়ে বসলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে। এতক্ষণ মায়ের চোখে জল

ছিল না। এইবার জল এল। গাল বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল। মা বাবার বুকে হাত রেখে বললেন, 'কারোর কথা তুমি শুনলে না। কারোর কথা! এখন একলা আমি করি কি?'

আর কোনও কথা নয়। মা উঠে দাঁড়ালেন। চোখ মুছে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধার দিকে, 'মা, আপনি আমায় যা করলেন, এ যুগে কেউ কখনও করে না। আমি আপনাকে প্রণাম করি।'

বৃদ্ধা মাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'মানুষ মাত্রই করবে। অমানুষ হলে করবে না। তোমার মতো এমন সংযত মহিলা আমি দেখিনি মা। অন্য কেউ হলে কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে যেত। তুমি সাধিকা। ঠিক যেন আনন্দময়ী মা।'

ডাক্তারবাবু ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন। জগন্নাথবাবু চলে গেছেন সৎকার সমিতির গাড়ি আনতে। বাবার বইভর্তি ঝোলা-ব্যাগটা রক থেকে তুলে এনে সোফার ওপর রাখা হয়েছে। বৃদ্ধা মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকার প্রয়োজন আছে?'

আমি মাকে বললুম, 'বাবার বুকপকেটে অনেক টাকা আছে।'

মা এগিয়ে গিয়ে বাবা যেন বেঁচে আছেন, এইভাবেই বললেন, 'তোমার পকেটে একবার হাত দিচ্ছি, কিছু মনে কোরো না।' বলেই মা চোখের জল চাপবার জন্যে মুখ নিচু করলেন।

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই মহিলার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যত খারাপই হোক, এঁর ভাল হবে। নারীশক্তি চিরকাল শুনেই আসছি, এই প্রথম দেখার সৌভাগ্য হলো।'

বাবার বুকপকেট থেকে প্রচুর কাগজপত্রের সঙ্গে টাকাও বেরলো। মা বললেন, 'খোকা, গুনে দেখ্।' টাকাগুলো আমার হাতে দিলেন। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। কেমন করে গুনবো। এই সময় টাকাপয়সার কথা ভাবা যায়! তবু টাকা কি জিনিস! শেষের সময়েও টাকা!

অনেক কষ্টে গুনে বললুম, 'মা, সাড়ে তিন হাজার।'

'দিদিকে এক হাজার দিয়ে দাও।'

বৃদ্ধা বললেন, 'আমাকে? আমি টাকা নিয়ে কি করবো?'

'এই গদিটা যে পাল্টাতে হবে দিদি।'

বৃদ্ধা যেন ধমকে উঠলেন, 'সেটা আমার ভাবনা! তুমি খুবই শক্ত। তবে একটু বেশি শক্ত। গদির ভাবনাটা এখন না ভাবলেও চলে। তুমি ফুলের ভাবনা ভাবো।'

এই ধমকটার প্রয়োজন ছিল। মা সেই স্বর্গীয় বৃদ্ধার বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। বৃদ্ধার হাত মায়ের পিঠে। হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'যতটা পারিস কেঁদে নে বোন। সব দুঃখ ধুয়ে যাক।'

সংকার সমিতির গাড়ি এসে গেল। জগন্নাথ নিজেই বুদ্ধি করে ফুল কিনে এনেছেন। বাবাকে নিয়ে প্রথমে আমরা বাড়িতে এলুম। আমার মাথাটা শূন্য হয়ে গেছে। যে যা বলছেন তাই করে যাচ্ছি যন্ত্রের মতো। সন্তোষদার দোকান বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল রাজেনবাবুর চায়ের দোকান। বাবা যাঁদের ভালবাসতেন, যাঁদের সত্যিকারের মানুষ ভাবতেন, তাঁরা সবাই এসে গেলেন। ফুলে ফুলে বাবা ঢাকা পড়ে গেছেন। সকলেই বলতে লাগলেন, 'একজন মানুষের মতো মানুষ চলে গেলেন।'

কত বড় একটা মিছিল তৈরি হলো। বড় মানুষদের মৃত্যু-মিছিল যেরকম হয়। বড় রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই ভাবছেন, কে যাচ্ছে! ওই দুঃখেও আমার কি গর্ব! আমার বাবা যাচ্ছেন। আর কোনওদিন ফিরবেন না।

॥ দুই ॥

আমি আর আমার মা আর একটা বাড়ি আর অনেক বই, আর পাঁচ হাজার টাকা, এই নিয়ে শুরু হলো আমাদের জীবন। নতুন জীবন। মা বললেন, 'খোকা, আমাদের এখন খুব কষ্ট করতে হবে। পাঁচ

হাজারে পাঁচ মাস চলবে। তারপর? বিরাট এক প্রশ্ন। জানালার বাইরে শহর কলকাতা তালগোল পাকিয়ে সারাটা দিন ছুটছে। টাকায় ছোটাচ্ছে। টাকা ধরার জন্যে ছুটছে মানুষ। সেই রাত বারোটার পর একটু শান্ত হয়। আবার ভোর না হতেই শুরু হয়ে যায়।

মা বাবার হিসেবের খাতাটা খুলে বসলেন। এখন বাইরের বাতাস থাকলে আমরা পাখা খুলি না। পাখায় খুব বিদ্যুৎ খরচ হয়। আলোও আমরা হিসেব করে জ্বালি। যেখানে যতটুকু কাজ সেইখানে ততটুকু আলো। সব দিক থেকে খরচ কমিয়ে আনা হচ্ছে। সরু চালের বদলে, বাজার থেকে মোটা চাল কিনে এনেছি। অল্প খেলেই অনেকক্ষণ পেট ভার থাকে। ডাল, ভাত, পাতিলেবু আর শাকপাতার একটা ঘাঁট। মা আমার অসম্ভব ভালো রান্না করতে পারেন। কোথায় লাগে অমৃত! এক টিন ছাতু কিনে রাখা হয়েছে। পেট খালি হলেই ছাতুর একটা ছোট মণ্ডে তাল ঢুকিয়ে দি, সব ঠাণ্ডা। আমরা যখন খুব বড়লোক ছিলুম, তখন আমাদের অনেক ভাল ভাল কাপ, ডিশ, স্যুপ খাবার বাটি, ডিনার প্লেট, সাইড ডিশ, সব কেনা হয়েছিল, ঝকঝকে কাটা-চামচ। খাবার ঘরের আলমারিতে সব সাজানো আছে। দেখি আর হাসি। ওসবে কি হয়! না থাকলেই বা কিসের অসুবিধে! আমার বাবা যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা সোনার চেয়েও দামী। মুরগীর ঠ্যাং-এর চেয়ে গাছের ডাঁটা অনেক সুস্বাদু। বাবার একটা কথা সব সময় আমার কানে বাজে, 'খোকা হেরে যেও না। পৃথিবী সব সময় তোমাকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তুমি এগোতে চাইলে পেছন থেকে টেনে ধরবে। মনের জোরে এগিয়ে যাবে। কেবল বলবে, আমি হারবো না। হারবো না আমি কিছুতেই। খুব কম মানুষই তোমাকে সাহায্য করবে। মানুষের ওপর নির্ভর করবে না। একলা চলো রে।'

হিসেবের খাতায় দেখা গেল, অনেকের কাছেই বাবার টাকা পাওনা আছে। যোগ করে দেখলুম, প্রায় তিরিশ হাজার টাকা তো হবেই। বাবার আগের অফিসের এক পশুপতি বোস মেয়ের বিয়ের জন্যে দশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। মা বললেন, 'তুই কালই একবার বাবার পুরনো অফিসে যা। গিয়ে খোঁজ কর তো। এতগুলো টাকা, এই দুঃসময়ে পেলে কাজে লাগবে।' মনে মনে ভাবলুম, বাবা বলতেন, 'টাকা যখন ধার দেবে, মনে করবে একেবারে দিয়ে দিলুম। খুব কম মানুষই ধার শোধ করতে চায় বা পারে।'
পরের দিন, বারোটা একটার সময় বাবার পুরনো অফিসে গেলুম। লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে মন যেন আর চাইছিল না, ছোটলোকের ওই অফিসে ঢুকতে। বাবা সেই যে একবার বেরিয়ে এসেছিলেন, আর কোনওদিন ঢোকেননি। সেই শেষ। গুড বাই চাকরি। মনকে অনেক বুঝিয়ে-টুঝিয়ে সাততলায় নিজেকে টেনে তুললুম। ঝকঝকে অফিস। কোম্পানির অবস্থা বেশ ভালই যাচ্ছে। দু'নম্বরী পয়সায় খুব বোলবোলা। আসার সময় পার্কিং-এ দেখলুম ঝকঝকে সব মটোরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই রিসেপশন। সেজেগুজে এক মহিলা বসে আছেন। নানা রঙের টেলিফোন। সামনে দাঁড়াতেই খুব স্টাইলে, ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?' ভেবেছিলেন, ইংরেজি শুনে আমি ঘাবড়ে যাবো। আমার পরনে একটা কম দামের ট্রাউজার, একটা টি-শার্ট। বাবার শ্রাদ্ধের পর মাথায় এখনও পুরো চুল গজায়নি। একটা আনস্মার্ট মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলে। আমার বাবা বলতেন, 'বাইরেটা ঢেকে রাখবি, বুঝতে দিবি না তোর ভেতরে কি আছে।' আমিও চোস্ত ইংরেজিতে বললুম, আমি কি চাই! মহিলা একটু ঘাবড়ে গেলেন। এতটা আশা করেননি। ভদ্রমহিলা তখন আমাকে বসতে বললেন। ইংরেজি ছেড়ে বাঙলা ধরলেন। বললেন, 'আমি তো বেশিদিন আসিনি। পুরনো কারোকে তেমন চিনি না।' একটু দূরে একটা টুলে মাঝবয়সী একজন বেয়ারা

বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'পশুপতিবাবুর চাকরি শেষ হয়ে গেছে। তা প্রায় তিন বছর তো হলো' ভদ্রলোক আমাকে ঠিকানা এনে দিলেন ভেতর থেকে।

সেই মুরারীপুকুরের একেবারে শেষ প্রান্তে পশুপতিবাবুর বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। বনেদী বাড়ি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। অনেকটা ভেতরে পশুপতিবাবুর অংশ। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এসে বললেন. 'কি চাই বাবা!'

'আমি পশুপতিবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'এসো।'

মহিলা আমাকে ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। দেয়ালে রঙ নেই। মেঝেতে পালিশ নেই। ভদ্রলোক সাবেক আমলের একটা খাটে পাথরের মতো পড়ে আছেন। ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে আপন মনে কবিতা পড়ে যাচ্ছে। এক বছর হলো পশুপতিবাবু এইভাবে শুয়ে আছেন। পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'কেন আমি এসেছি! কে আমি!' বাবার নাম বলতেই চিনতে পারলেন। পশুপতিবাবুর মুখ দিয়ে অব্যক্ত একটা আওয়াজ বেরলো। কিছু বলতে চাইছেন। ভাষা নেই, শুধু শব্দ। মহিলা বললেন, 'তুমি বসো বাবা। তোমাকে কত ছোট দেখেছি। কত বড় হয়ে গেছো! বাবা কেমন আছেন?'

যেই শুনলেন, বাবা আর নেই, মুখটা কেমন করুণ হয়ে গেল। পশুপতিবাবু আবার একটা শব্দ করলেন। বাচ্চা মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'তুমি চুপ করো না দাদু। আমি তোমাকে ছড়া শোনাচ্ছি না! কথা বলতে পারে না, খালি খালি কথা বলছে।'

ফিরে এসে মাকে সব বললুম। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন. ধার দেনা করে। ঘটা করে। সেই মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। রেখে গেছে একটি মেয়ে। পশুপতিবাবুর প্যারালিসিস। মা বললেন, 'ছেড়ে দে। ওই টাকার আশা আর করিসনি। উপায় থাকলে

আরও কিছু টাকা দিয়ে আসা যেত।'

বাকি যাঁদের কাছে টাকা পাওনা ছিল, তাঁরা সব বাবার বইয়ের খদ্দের। মা আমাকে একটা লিস্ট তৈরি করে দিলেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা নাম। কলকাতার বিভিন্ন অফিসে। বেরোচ্ছিই যখন, বাবার ঝোলাটা কাঁধে নি, কেউ যদি কিছু বই নেন। প্রথমেই গেলুম প্রশান্ত মিত্রের অফিসে। প্রায় আড়াই হাজার টাকার মতো পাওনা। প্রশান্ত মিত্র কলকাতার একজন বড় অ্যাটর্নি। তাঁর বড়বাবু প্রায় একঘণ্টা বসিয়ে রাখলেন অকারণে। ক্ষমতা দেখালেন। অবশেষে প্রশান্তবাবুর কামরায় ঢোকার অনুমতি পেলুম। ভদ্রলোক একটা তালশাঁস সন্দেশে কামড় মারতে মারতে বললেন, 'অ, তোমার বাবা মারা গেছেন ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড। তা অল্প বয়সেই বাবাকে হারালে! এতে তোমার ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। হয় মানুষ হবে, না হয় বখে যাবে। মানুষ হবারই চেষ্টা করো। কি জন্যে এসেছ? সাহায্যের জন্যে?'

তারিয়ে তারিয়ে সন্দেশ খাচ্ছেন। একবার বসতেও বললেন না। এই হলো বড়লোকদের ধরন। গা জ্বলে যাচ্ছিল।

'আজ্ঞে না, সাহায্যের জন্যে আসিনি! বাবা আপনার কাছে আড়াই হাজার টাকা পেতেন। আপনি বই নিয়েছিলেন।'

'ইজ ইট? তাই নাকি? তুমি সেই টাকাটা নিতে এসেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'একটু অসুবিধে আছে। আমার দেওয়ায় নয়, তোমার নেওয়ায়।'

'টাকা নেওয়ায় কিসের অসুবিধে?'

'অনেক অসুবিধে। তোমার বাবার নামে কোম্পানি। তোমাকে আগে সাকসেসান সার্টিফিকেট নিতে হবে। আগে আইনমোতাবেক উত্তরাধিকারী হও, তারপর দেনাপাওনা। ধরো, তোমাকে আমি টাকাটা দিলুম, তারপর কেউ যদি এসে বলে, আমিই হলুম উত্তরাধিকারী তাহলে কি হবে? বেআইনী কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'আমি বসতে পারি ?'

'বসে কি হবে ? ওভাবে টাকা আমি দোবো না। তুমি আগে আইনের জট ছাড়িয়ে এসো।'

আমি চেয়ার টেনে বসলুম। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। ঝোলা থেকে একটুকরো কাগজ বের করে লিখলুম, 'শ্রীপ্রশান্ত মিত্রকে সন্দেশ খাওয়ার জন্যে আড়াই হাজার টাকা দান করলুম। উৎপল চট্টোপাধ্যায়। পিতা 'প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়।' কাগজটা ভদ্রলোকের সামনে ফেলে দিয়ে আমি দরজার দিকে এগোচ্ছি, ভদ্রলোক হুঙ্কার ছাড়লেন, 'শোনো ছোকরা, ঔদ্ধত্যের একটা সীমা আছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম, 'ছোটলোকমিরও একটা সীমা আছে।'

ভদ্রলোক জোরে ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারা দিয়ে আমাকে বের করে দেবেন। হঠাৎ আমার ভেতরে বসে কে যেন বললেন, 'বল্, আপনার খুব দুঃসময় আসছে।' আমি বললুম, 'আপনি যত পারেন ঘণ্টা বাজান, তবে শুনে রাখুন, খুব বড় রকমের একটা বিপদ আসছে আপনার। সাবধান!'

ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'গেট আউট: গেট আউট আই সে।'

আশ্চর্য ব্যাপার, আমি শুধু অবাক নয়, বেশ ভয়ও পেয়ে গেলুম। ভদ্রলোক একটু আগে সন্দেশ খাচ্ছিলেন। সেই সন্দেশই বোধহয় মুখে ছিল। জোরে গেট আউট বলায় গলায় আটকাল। কাশতে শুরু করলেন। সাঙ্ঘাতিক কাশি। কাশতে কাশতে দম আটকে যাবার মতো হলো। এদিকে ঘণ্টি শুনে বেয়ারা ছুটে এসেছে। আমি জানি বড়লোকরা বাইরে খুব গোলগাল দেখতে হলেও, ভেতরে ফোঁপরা। তাদের দুটো হার্টই থাকে না। যে হার্ট ধুকপুক করে সেটাও অকেজো, আর যে হৃদয় থাকলে মানুষের দুঃখকষ্ট বোঝা যায় সেটাও থাকে না। আমার আর দেখার দরকার নেই। সোজা রাস্তায়।

কৌতূহল হলো, শেষটা কি হয় দেখার। হাইকোর্টের তলায় অজস্র মানুষের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আধঘণ্টার মতো হয়েছে, ওঁয়া ওঁয়া করে একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে! হাইকোর্টের রাস্তায় ঢুকে নীরব হয়ে গেল। এখানে শব্দ চলবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে প্রশান্ত মিত্র হাসপাতালের দিকে, কি নার্সিংহোমের দিকে চলে গেলেন। আমার আর তখন আনন্দ নয়, বেশ ভয় করছে। হাত-পা প্রায় ঠাণ্ডা। ভাবছি, আমার ওপর প্রেতাত্মার ভর হলো নাকি!

রাতে মাকে ঘটনাটা বললুম। মা বললেন, 'ও কিছু নয়। ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কদর বাড়ে। একে বলে কাকতালীয়।'

সেই বৃদ্ধা মহিলা একদিন এলেন, সঙ্গে সেই জগন্নাথদা।

ভদ্রমহিলার নামটা ভীষণ সুন্দর, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মাসী। মাসীতে ওনার আপত্তি।

'তুই আমাকে মা বলবি। কেউ আমাকে মা বললে ভীষণ ভাল লাগে।'

মা বললেন, 'আমি আপনাকে মা বলব। আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনি শুধু আমার মা নয়, জগতের মা।'

আমাদের বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে বললেন, 'ভীষণ সুন্দর করে রেখেছ। ঠিক এইভাবে রাখার চেষ্টা করো। কোনওভাবে দারিদ্র্যকে ঢুকতে দিও না।'

মা বললেন, 'সেইটাই তো ভয়। ঠেকাবো কেমন করে! কোনও তো রোজগার নেই। ছেলেটা তো ছাত্র! কবে পাশ করবে, চাকরি করবে, রোজগার করবে, কিছুই জানি না। অত দিন টানবো কি করে?'

'দারিদ্র্যকে ঠেকাতে হবে কর্ম দিয়ে। ওর বাবার ব্যবসাটাকে বড় করা যায় না?' অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হলো। আমরা চারজন একের পর এক পরিকল্পনা করে চলেছি।

আমাদের শত্রু হলো সময়। এক একটা দিন যাবে আমাদের টাকা কমবে। টাকার চৌবাচ্চায় টাকা ঢালতে হবে। এমনি করে আরও দশটা বছর কাটাতে হবে। তিন হাজার ছশো দিন।

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'ভাবিসনি বেশি। তাহলে একটা গল্প শোন্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা উড়োজাহাজ সাহারা মরুভূমির ওপর ভেঙে পড়ল। একজন মাত্র পাইলট। তিনি অক্ষত অবস্থায় প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে গেলেন। বাঁচলে কি হবে! দিগদিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। ম্যাপ নেই। কম্পাস নেই। কোনও রসদ নেই। কেবল তিনি আছেন আর আছে মরুভূমি। লোকালয় কোথায়, কত দূরে কিছুই জানা নেই। মাথার ওপর সাহারার সূর্য। পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালি। জল নেই, খাবার নেই, কোনও সঙ্গী নেই। অবস্থাটা একবার ভাবো। সেই মানুষটির মাথা ঘুরে গেল। তিনি ভাবলেন, বিমান দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেও, রোদে পুড়ে, অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ তাঁকে বাঁচাতে আসবে না। মৃত্যু নিশ্চিত। চারপাশে বালি আর বালি, আগুনের মতো জ্বলছে। পরের পর, পরের পর, ঢেউ খেলে পড়ে আছে বালিয়াড়ি। উটের পিঠের মতো বালির পাহাড়। এত উঁচু যে আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে। বাতাসে বালির ঘূর্ণী। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। লোকটি যে কোনও একদিকে হাঁটা শুরু করলেন। মাথার ওপর সূর্য। বোঝার উপায় নেই যাচ্ছেন কোনদিকে! তবু হাঁটছেন সেই বিমানচালক। কর্মই ধর্ম, ধর্মই কর্ম। হয়তো গীতার কথাই ঠিক—কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। হাঁটা যাক, তারপর দেখা যাক কি হয়, কিন্তু কত দূর হাঁটবেন। চারপাশে অসীম বালির সমুদ্র। আচ্ছা! প্রথমে ওই বালিয়াড়িটা পর্যন্ত যাওয়া যাক। লোকটি হাঁটতে হাঁটতে প্রথম বালিয়াড়ি পর্যন্ত গেলেন। সেখান থেকে দ্বিতীয়। দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়। তৃতীয় থেকে চতুর্থ। চতুর্থ থেকে পঞ্চম। দু'মাস পরে মানুষটি লোকালয়ের দরজায় এসে জ্ঞান হারালেন। শুকনো এক কঙ্কাল।

রোদে পুড়ে কালো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তিন মাস লাগল তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। এরপরে তিনি একটি বই লিখলেন, ভারি সুন্দর। সেই লেখায় তিনি বললেন, জীবনের পথ অতি দীর্ঘ, ওই মরুভূমির পথের মতোই। চলার সময় গোটা পথের কথা চিন্তা করলে, ভয় পেয়ে যাবে, আর হাঁটতেই পারবে না। কৌশলটা হলো, প্রথম ল্যাম্পপোস্টটির কথা চিন্তা করো। দূরে প্রথম যে ল্যাম্পপোস্টটি চোখে পড়ছে, মনে করো, তুমি সেই পর্যন্তই যেতে চাও। সেই অবধি গিয়ে পরেরটার কথা ভাবো। এই ভাবে প্রথম থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, দেখবে একদিন তুমি পৌঁছে গেছো পথের শেষে। যেমন আমি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলুম লোকালয়ে। তাঁর বইটার নাম, থিঙ্ক অফ দি নেক্সট ল্যাম্পপোস্ট। পরের বাতিস্তম্ভের কথা ভাবো। পুরো পথটা ভেবো না। তোকে এই গল্পটা কেন বললুম জানিস, তুই শুধু কালকের কথা ভাব। কাল গেলে আবার কাল। কাল কাল করতে করতে পৌঁছে যাবি মহাকালে। আর, একটা বিশ্বাস একটা আদর্শকে ধরে থাকে। সেইটাই হলো চলার শক্তি। আর, আমাকে দেখ, কেউ কোথাও নেই আমার, আমি কিন্তু মরে যাইনি, বেশ ভালই বেঁচে আছি। আমি নিজেই রোজগার করি—আমার একটা ছোট ছাপাখানা আছে। সেখানে তিনজন মহিলা আর এই জগন্নাথ কাজ করে। ডাল, ভাত, একটা তরকারি আর বছরে চার, পাঁচখানা কাপড় এই তো আমাদের জীবনের প্রয়োজন। তোমার বাবা আমাকেও তোমাদের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে গেছেন, তোমাদের ভয় কিসের! সবই ঠিক হয়ে যাবে!'

শ্রদ্ধা মা চলে গেলেন। বেশ একটা শক্তি দিয়ে গেলেন মনে। সত্যিই তো, কেউ কি সহজে মরতে চায়? বাবার বইয়ের ব্যবসাটাকেই ধরে থাকি। সারাদিন ঘুরবো, রাতে পড়ব। তিন-চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। ঘুম একটা অভ্যাস। কোথা থেকে বই তুলতেন আমি জানি।

কাদের বই দিতেন তাও আমি জানি।

কলকাতার সবচেয়ে বড় ইংরেজি বইয়ের ব্যবসায়ী একজন অবাঙালী। গোলগাল সুন্দর চেহারা। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রঙ। এমনি দেখলে মনে হবে ভীষণ গম্ভীর। একটু কথা বললেই হাসবেন। আর হাসলে তাঁর ওই গম্ভীর চেহারা থেকে বেরিয়ে আসবে সুন্দর এক বন্ধু। ভদ্রলোকের নাম, ঘনশ্যাম যোশী। যোশীজী আমার নাম জানেন। 'বসো উৎপল'। একটু ব্যস্ত ছিলেন। কাজ শেষ হবার পর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

'বাবা নেই।'

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। মুখে একটা বেদনার ছায়া নেমে এল।

'তুমি কি চালাবে ব্যবসাটা!'

'তা ছাড়া তো আমাদের সংসার চলবে না।'

'তোমাকে আমি সাহায্য করবো। বাইরের সমস্ত পাবলিশার্সের আমি এজেন্ট। এমন কোনও ভাল বই নেই যা আমার কাছে আসে না। তোমার বাবার কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। সে টাকা তোমাকে এখন দিতে হবে না। এক বছর তোমাকে নতুন বইয়ের জন্যে কোনও টাকা দিতে হবে না। ওই টাকাটা তুমি ব্যবসায় রোল করাও।

'বাবার মতো তো আমার জ্ঞান নেই। কি বই বেরোচ্ছে? কোন বই খুব ভাল। কোন বই লোকে চাইবে?'

'তোমাকে আমি জ্ঞানও ধার দোবো। ইংরেজি কেমন জানো?'

'কাকু, ওইটা বাবা আমাকে ভালই শিখিয়েছেন।'

যোশীজীকে কাকু বলায় ভীষণ খুশি হলেন। বড় বড় চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ইউ আর মাই সান। তোমাকে আমি তৈরি করে দোবো। ইংরেজি যখন জানো, তোমার সমস্যা তো অনেক কমে গেল। তুমি এখানে আসবে। এই ঘরে, ওই চেয়ারে বসবে। তোমাকে আমি টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট,

লিটারারি ওয়ার্ল্ড পাবলিশার্সদের লিটারেচার, সব দিয়ে দোবো। বসে বসে পড়বে। যত পড়বে, ততই তুমি জানতে পারবে বুক ওয়ার্ল্ডের খবর। আজকে তোমাকে আমি কুড়িখানা বই দিচ্ছি। একেবারে বাছাই করা। তুমি বসে বসে সব কটা বইয়ের মলাটের পেছন দিকটা পড়ে ফেল। জানতে পারবে কোন বইয়ে কি আছে। আমাদের দেশের মানুষ এইসব লেখকের বই খুব পছন্দ করেন।'

চকচকে মলাটের কুড়িখানা বই নিয়ে আমি বসে গেলুম কোণের একটা টেবিলে। ছোট্ট একটা খাতা বের করে নোট নিতে শুরু করলুম। কত রকম বিষয়ের বই, রাজনীতি, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নভেল, থ্রিলার, জীবনী। এক সময় যোশীজী আমার কাছে একটা খাবারের বাক্স পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যের মুখে রাস্তায় নেমে এলুম। ঝোলা বেশ ভারি। কুড়িখানা বই ঢুকেছে। কাল আমাকে সকালেই বেরোতে হবে। একদিনে কুড়িখানা বই যদি কেটে যায় আমার খুব ভাল লাগবে। নিজের ওপর একটা বিশ্বাস এসে যাবে।

খিচির মিচির কলকাতা। বাসে-ট্রামে অফিস-ভাঙা ভিড়। এমনিই চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দেয়, কাঁধে অত বড় একটা ঝোলাব্যাগ। বাবা বলেছিলেন, 'ফেরিওয়ালার পা দুটোই ভরসা।' হাঁটছি তো হাটছিই। পথ আর ফুরোয় না। বাবার সঙ্গে যখন হাঁটতুম, তখন পথ কখন ফুরিয়ে যেত টেরও পেতুম না। কত গল্প, কত মজার মজার ঘটনা। পথ চলতে চলতে ইংরেজি শেখাতেন। ইংরেজিতে কথা হতো আমাদের দু'জনের। ইতিহাস আলোচনা হতো। দু'জনে দু'জনের জেনারেল নলেজ পরীক্ষা করতুম। বাবা নেই, আজ আমি একা। মাথা খুলে গেল। বাবা শরীরে নেই ঠিকই কিন্তু যতদিন আমি পৃথিবীতে আছি, ততদিন আমার বাবাকেও থাকতে হবে, আমাকে ঘিরে, আমার ভেতরে। সেই অদৃশ্য বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে, ভবিষ্যতের প্ল্যান করতে করতে কখন বাড়ি পৌঁছে গেলুম

বুঝতে পারলুম না। ঠনঠনের কাছাকাছি এসে বাবা আমাকে বললেন, 'চলো, প্রণাম করে আসি। আজ খুব ভাল দিন। যোগী তোমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন।'

কাঁধে অত বড় একটা বোঝা নিয়ে সেই কোথা থেকে হাঁটছি। বাড়িতে এসেই ঠাণ্ডা মেঝেতে উল্টে পড়লুম! আজকাল তো সবেতেই গোলমাল। সামান্য আলো কি একটা পাখা থাকলেও চালাবার উপায় নেই। বিদ্যুৎ এই আছে তো এই নেই। মা একটা হাতপাখা এনে মাথার কাছে বসলেন। মায়ের মন তো, আমার এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারলেও, মা সহ্য করতে পারছেন না। এক সময় আমি ইংরেজি স্কুলে পড়তুম। ডিম, মাখন, আইসক্রিম ছিল আমার খাদ্য। এক মাইলও হাঁটতে হতো না। সব সময় গাড়ি!

মা বললেন, 'এই কাজ তোর শরীর নেবে না খোকা।'

'নেবে মা। জানোই তো, কথায় আছে, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। অত আদুরে করে রাখলে কেউ খাওয়াবে না মা। বাবার কথা চিন্তা করো। কি ছিলেন, কি হয়েছিলেন। একজন অত বড় অফিসার থেকে ফেরিওলা! শেষে এই বইয়ের ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথের ধারে মৃত্যু। এই ঝোলা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাবার কাঁধে ছিল। এই ব্যবসাটা আমার কাছে ব্যবসা নয়, ব্রত! এ আমি ছাড়তে পারবো না মা।'

মা আমার কপালে হাত রাখলেন। নরম। ঠাণ্ডা। ঘুম এসে গেল। আমার ঘুমোতেও লজ্জা করে আজকাল। দিন যদি চব্বিশ ঘণ্টার চেয়েও লম্বা হতো আমার পক্ষে ভাল হতো। লেখাপড়া তো আর ছাড়তে পারবো না। বাবা বলেছিলেন, 'হেরে যেও না।' শিক্ষিত বড়লোক, অশিক্ষিত বড়লোক, যারা আমার বাবাকে অপমান করেছিল, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল, বলা চলে খুনই করেছিল, তাদের দেখিয়ে দিতে হবে, তোমাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। একটা পরিবারকে তোমরা ভিখিরি করতে চেয়েছিলে, প্রায় করেও এনেছিলে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত

পারলে না।

রাত দেড়টার সময় আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। প্রাইভেটেই পরীক্ষা দোবো। এছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। ইতিহাস আমার ভীষণ ভাল লাগে। রাত যত বাড়তে থাকে আমি ক্রমশই সরে যেতে থাকি সময়ের দূর অধ্যায়ে। কতদিন ধরে মানুষ পথ হাঁটছে! শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে আজ এই বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। এ চলার শেষ নেই। সভ্যতার উত্থান-পতন। এক রাজা যায়, তো আর এক রাজা আসে। সিংহাসন খালি থাকে না। এই মানুষের অতীত থেকে বর্তমানে হেঁটে আসার কাহিনী পড়তে আমার রোমাঞ্চ হয়। আমার স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক দ্বিজেনবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার লাইন ইতিহাস। আমি হয়তো থাকব না, তুমি চালিয়ে যেও। মডার্ন হিস্ট্রি নেবে। রিসার্চ করবে। স্কলারশিপ নিয়ে চলে যাবে আমেরিকা। পেনসিলভ্যানিয়া। বিদেশে গবেষণার অনেক সুযোগ, অধ্যাপনারও অনেক সুখ।' আমি শুয়ে শুয়ে আমার ঈশ্বর, আমার পিতাকে ডাকি—জীবনের সমস্ত নোংরামি আর তুচ্ছতা থেকে আমাকে বেরোবার পথ করে দিন। বাবা আমাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন :

মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা :
যে করে ভয় দুঃখ নিতে, দুঃখ দিতে,
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে ?

বাবা আমাকে সাধু সেন্ট লরেন্সের কথা বলতেন। সর্বদাই যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতেন। জীবনের প্রথম ভাগে বড়লোকের চাকর ছিলেন। মারধোর খেতেন কাজে ভুল করার জন্যে। পরে তিনি রাঁধুনীর কাজ করেছেন। হঠাৎ একদিন তাঁর জীবনে অদ্ভুত এক পরিবর্তন এল। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসী। প্রচণ্ড শীত বরফে

সব ঢেকে গেছে। সেণ্ট লরেন্স দেখলেন বরফে ঢাকা প্রান্তরে পাতাঝরা একটা গাছের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর চোখে জল এসে গেল এই ভেবে, কি অদ্ভুত! আর কিছুদিন পরেই বসন্ত এসে যাবে, আর তখন ওই পত্রশূন্য গাছ সবুজ সবুজ পাতায় সেজে উঠবে। যা এখন ভাবাই যায় না। কে এমন করেন? করেন সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! লরেন্স সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। সেণ্ট লরেন্স বলতেন, ঈশ্বর, আমি জানি, তুমি আমাকে অনেক দুঃখকষ্টে ফেলবে। সেইটাই আমার কর্মফল' কিন্তু এও জানি, তুমি আমাকে সহ্য করার শক্তিও দেবে: সেণ্ট লরেন্সের মতো আমিও বলি:, ভগবান তুমি আমাকে আরও দুঃখ দাও, কিন্তু সহ্য করার শক্তিও দিও। তা না হলে ভেসে যাবো: এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

তিন

সকাল সাড়ে আটটা-নটার সময় অদ্ভুত চেহারার এক ভদ্রলোক এল: দেখেই মনে হলো লোকটা সুবিধের নয়। ভাগ্য ভাল সেই সময় আমার শ্রদ্ধা মা ছিলেন। আমাদের বাইরের ঘরে বসে, এদিক-ওদিক চাইছে চোরের মতো। বললে, 'খুব গোপনীয় কথা আছে তোমার মায়ের সঙ্গে।'

শ্রদ্ধা মা মাকে বললেন, 'তোমাকে যেতে হবে না। আমি দেখছি।'

লোকটি শ্রদ্ধা মাকে বললে, 'খুব একটা সুখবর আছে ম্যাডাম।'

'কি সুখবর স্যার?'

শ্রদ্ধা মায়ের কাটা কাটা প্রশ্ন শুনে লোকটা একটু চুপসে গেল: তবু নাটকীয় ভঙ্গিতে বললে, 'চার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা।'

'এই বাজারে সাড়ে চার লাখ নস্যি।'

'তিন কাঠা জমি আর এই বাড়ি, বড়জোর পাঁচ লাখ তাও বেশি হয়ে যায়।'

'চিমনলাল ষাট লাখ বলে গেছেন। আর একটু চাপাচাপি করলে

সত্তরে উঠবে।'

'ও, চিমনলাল এরই মধ্যে এসে গেছে। ওর একবারে বেড়ালের নাক। আমরা সবে কাল খবরটা পেলুম।'

'কি খবর? যে এই বাড়িটা বিক্রি হবে?'

'উঁহু, আমরা তো ওই খবরে কাজ করি না। আমাদের খবর হলো, বাড়ির কর্তা মারা গেছে। পড়ে আছে এক বিধবা আর এক নাবালক ছেলে। তার মানে, এক বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার পথে বসতে চলেছে। ভীষণ বিপদে পড়েছে। তখনই আমরা সাহায্য করতে ছুটে আসি।'

'ও, এটা হলো সাহায্য!'

'সাহায্যই তো! এই বাড়ি আপনাকে কি দিচ্ছে? কিছুই না। বাড়ি হলো বাঙালির ব্যামো। বাড়ি করবো, বাড়ি করবো। একগাদা টাকা বাড়িতে ব্লক হয়ে গেল। আচ্ছা সাড়ে চার নয়, ঢনঢনিয়াকে বলেকয়ে আমি পাঁচই করে দিলুম। ও আমার কথা শুনবে। সেই পাঁচ ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দিলে মাসে মাসে সুদের টাকায় তোফা সংসার চলে যাবে। যারা বুদ্ধিমান তারা সব ভাড়া বাড়িতে থাকে, আর নগদ টাকা সুদে খাটায়। বাড়ি রাখতে বাড়ির পেছনে মাসে মাসে কত টাকা যায়, সে হিসেব রেখেছেন। এইরকম একটা জায়গা ধরে রাখাটাও অপরাধ। এখানে একটা বহুতল বাড়ি হলে কত লোক আশ্রয় পাবে! আচ্ছা যাক, আমি ঢনঢনিয়াকে বলে বিনা পয়সায় আপনাদের একটা ফ্ল্যাটও পাইয়ে দোবো। সব মিলিয়ে তাহলে দশ লাখ হলো। পাঁচ লাখ ক্যাশ, পাঁচ লাখ ফ্ল্যাট। চিমনলাল লোক ভাল নয় মা। ঢনঢনিয়া দেবতা। মানুষের মতো দেখতে হলেও একেবারে তুলসীপাতা। কাছে গেলে মনে হয়, মন্দির। ফুল-বেলপাতা একসঙ্গে চটকে দিলে যে-রকম গন্ধ বেরোয়, সেই রকম গন্ধ।'

'সব শুনলুম। আর ভালো লাগছে না। এই বাড়ি বিক্রি হবে না।

কোনও মতেই না।'

এইবার তাহলে বলি। শেষ কথা। প্রেমসে কোনও কাজ না হলে, জোরসে আমরা সেই কাজ করি। ঢনঢনিয়া বলেন, চিল আমাদের দেবতা। চিল যখন ছোঁ মারে, তখন কিছু যদি নাও পায় তো কুটো নিয়ে ওড়ে। তা এখানে তো মাস আছে। আমরা এখন করব কি? আমাদের পার্টিকে লেলিয়ে দোবো লুঃ লুঃ। মাসখানেক তাদের লাগবে। তারপর আপনারা নিজেরাই বাপ্ বাপ্ বলে উঠে পালাবেন।'

শ্রদ্ধা মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি তাহলে আসুন।'

'হ্যাঁ, আসবোই তো। আবার আসবো। এসে দাঁড়াবো—একতলায়, দোতলায়, তিনতলায়, পাঁচতলায়, শেষ সাততলায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়বো, গুডবাই, গুডবাই। আমাদের ব্রত, কলকাতায় একটাও বাঙালি ছারপোকা যেন না থাকে। মচ্ছিখোর, গন্ধী বাঙালী।'

'আপনাদের ব্রত সফল হোক, এই কামনা করি। আপনি তো বাঙালি?'

'বাঙালি হয়ে জন্মেছিলুম, এখন বাঙালিকে ঘেন্না করতে করতে অ-বাঙালি হয়ে গেছি।'

'বাঃ, আপনার সাধনা সফল হোক।'

'আমি আমার হাতের তাস ফেলে গেলুম ম্যাডাম, নিজের হাত এখন সামলান।'

লোকটা অসভ্য অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বেরিয়ে গেল। খুব ইচ্ছে করছিল, পেছন থেকে এক গোঁত্তা মারি। বাবা বলতেন, 'রাগবে না। সব সময় শান্ত থাকবে। রাগলে বুদ্ধি বিপর্যয় হয়।' বাবা আমাকে গীতা মুখস্থ করাতেন। গীতায় আছে,

> ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
> স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
> প্রণশ্যতি॥

ক্রোধ মানে রেগে গেলে মানুষের ভুল ধারণা হয়. ভুল পথে ছোটে। ভুল পথে ছুটলে ধর্মশাস্ত্রের বিধান সম্বন্ধেও ভুল ধারণা হয়. অবিশ্বাস জন্মায়, মানুষ স্মৃতিভ্রংশ হয়। স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশ মানে, সব তালগোল পাকিয়ে ধ্বংস।

দাঁতে দাঁত চেপে আমি লোকটার চলে যাওয়া দেখলুম। অবিকল কাতলা মাছের মতো চেহারা। ব্যাঙের মতো চোখ। গা থেকে ভরভর করে সিগারেটের গন্ধ বেরোচ্ছে। চনর্চনিয়ার দালাল।

'শ্রদ্ধা মা, লোকটাকে তুমি এই সব কি বললে? চিমনলাল কে গো?

'কেউ নয়। কলকাতায় একটা চড় কাজ করছে। যেখানে যত পড়তি বাঙালি বড়লোকের বাড়ি কায়দা করে সব কিনে নিয়ে বড় বাড়ি তৈরি করে ফ্ল্যাট বিক্রি। তলায় বাজার। আলোর চারপাশে শ্যামাপোকার মতো কলকাতায় টাকা উড়ছে। টাকা, টাকা, টাকা। লোকটা খুব গোলমেলে, ভোগাবে।'

'কি করে ভোগাবে? আমরা বাড়ি বিক্রি করবো না।'

'ত্বনিয়াটা আর অত সোজা নেইরে খোকা। পাপে ছেয়ে গেছে। লোভ। ভোগ আরও ভোগ। খুন, জখম, রাহাজানি। দেখিস না, মানুষ আজকাল হাসতে হাসতে মানুষ মারে। দেখা যাক কি হয়। আমিও তৈরি আছি। প্রয়োজন হলে আমি রোজই একবার করে আসবো। তোরা কারোকে কিছু বলবি না। কেউ কিছু বলতে এলে বলবি আমরা জানি না। আমার বড়মা জানে।'

তু-তিন দিনের মাথায় বোঝা গেল পরিকল্পনাটা কী? রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় একদল ছেলে এসে বাড়ির সামনে জটলা শুরু করল। যেমন তাদের গলা, সেই রকম তাদের ভাষা। খিস্তি খেউড়ের ফোয়ারা ছুটল। একটা দল সন্তোষদার দোকানের সামনে, আর একটা দল রাজেনবাবুর চায়ের দোকানের বেঞ্চে। মাঝে মাঝে

শেয়ালের মতো চিৎকার। অকারণে। আজ কোনও খেলা ছিল না। কেউ মারা যায়নি। সামনে নির্বাচন নেই।
'মা, এর তো প্রতিবাদ করা উচিত। এই রকম চিৎকার আর খিস্তি হলে, লেখাপড়া করবো কি করে?'
'ওই বোকামি কোরো না। ওরা দলে আছে, তুমি একা। দলছাড়া প্রতিবাদ সম্ভব নয়। ওরা এখন এইরকমই করবে। আমাদের উত্যক্ত করাই ওদের উদ্দেশ্য। আমরা ওদিকে যত কান দেবো ওরা তত পেয়ে বসবে। উপেক্ষা করতে শেখো। সব ব্যাপারে কান দিও না। তোর বাবা বলতেন, হাটে বসেও ধ্যান করা যায়। অভ্যাস। সংযম। কান দোবো না তো দোবো না। রাস্তার দিকের জানালা সব বন্ধ করে দাও। নিজের পড়ার মধ্যে ডুবে যাও।' খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গায়ে গরম ভাতের ফ্যান ঢেলে দি। অ্যাসিড ছিটিয়ে দি। কোনওভাবে গোটা চারেক বোমা এনে সব কটাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দি। আবার নিজেকে সংযত করলুম। একা পারবো না। যতই মনের জোর থাক, দেহের জোরের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে দলের।
পড়তে বসে গেলুম। সামনেই বাবার ছবি। বাবা ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প বলতেন—অবধূতের চব্বিশটি উপগুরু ছিল। তাঁর মধ্যে একজন হলেন ব্যাধ। একদিন মাঠের ওপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখতে পেলে সামনে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে খুব জাঁকজমক করে একটি বর আসছে, আর একদিকে এক ব্যাধ একমনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে এত জাঁক করে যে বর আসছে, সেদিকে একবারও চেয়ে দেখছে না! অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার করে বললে, 'তুমি আমার গুরু যখন আমি ভগবানের ধ্যানে বসবো তখন যেন তাঁর প্রতি ঐরূপ লক্ষ্য থাকে।'
আবার একজন মাছ ধরছে। অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই, অমুক জায়গায় কোন পথ দিয়ে যাব?' সে ব্যক্তির

ফাতনায় তখন মাছ খাচ্ছে। সে তার কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে একমনে ফাতনার দিকে তাকিয়ে রইল। মাছ গেঁথে তখন পেছন ফিরে বললে, 'আপনি কি বলছেন ?' অবধূত প্রণাম করে বললে, 'আপনি আমার গুরু, আমি যখন আপনার ইষ্টের ধ্যানে বসবো, তখন যেন ঐরূপ কাজ পেশ না করে অন্যদিকে মন না দিই।'

ঠাকুর এই উপদেশ দিয়েছিলেন ভক্তমণ্ডলীকে। মনে হওয়া মাত্রই আমার মনে একটা একাগ্রতা এসে গেল। সামনের রাস্তার হল্লা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল।

খুব ভোরে সন্তোষদা এসে বললেন, 'এ পাড়ায় এমন উৎপাত আগে আসেনি। সবাই মনে হলো বেপাড়ার ছেলে। আপনাদের বাড়ির দিকেই লক্ষ্য। কি ব্যাপার বলুন তো ?'

মা সব খুলে বললেন।

সন্তোষদা বললেন, 'এই ব্যাপার ; তাহলে তো একটা ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে।'

মা বললেন, 'মারামারির মধ্যে খবরদার যেও না। ওরা বদ। যে কোনও কাজই ওদের পক্ষে করা সম্ভব তোমার ওপর ছোরাছুরি চালিয়ে দিতে পারে।'

'আমি-ও পথে যাবোই না। আমার প্ল্যান আলাদা।'

সেইদিন সন্ধ্যের বেশ কিছু আগে মাঝারি ধরনের একটা মিছিল এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে। খোল, করতাল, ঘণ্টা, ঢোল সব একসঙ্গে বাজাতে বাজাতে মিছিল এসে হাজির। উদ্দাম নাম-সংকীর্তন হরে কৃষ্ণ, হরে রাম। 'জয় নিতাই' বলে সন্তোষদা দোকান ছেড়ে নেমে এলেন। মূল গায়েনের পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে খানিক নেচে নিলেন। সেই বাজে ছেলেগুলো যথারীতি গুলতানি করছিল একটু আগে। আজ আবার রবারের একটা বল এনে ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল। ইচ্ছে করে আমাদের দরজায়, জানালায় মারছিল। ভাগ্য ভাল আমাদের কাঁচ ভাঙেনি। ওরা

একটা ছেলেকে আমার বাবার নাম ধরে ডাকছিল। ডাকার আগে নামের সঙ্গে এক একটা বিশ্রী গালাগাল যোগ করছিল। সহ্য করা খুব কঠিন বলেই মনে হচ্ছিল। যে কোনও মুহূর্তে লেগে যেতে পারত। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কির মারামারি করতে করতে আমাদের বন্ধ সদর দরজার ওপর পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, দরজাটা বুঝি ভেঙেই যায়।

প্রায় জনা কুড়ি লোকের সেই উদ্দাম কীর্তনে আর রাস্তা জুড়ে নৃত্যে ছেলেগুলো হকচকিয়ে গেল। কীর্তনীয়াদের একজনের বুকের কাছে ধরা আছে মহাপ্রভুর বাঁধানো ছবি। জনাকুড়ি ভক্তের প্রত্যেকেরই চেহারা সাঙ্ঘাতিক ভাল। দেখলেই মনে হয় ব্যায়াম করা শরীর। তিন-চারজনের হাতে মোটা লাঠি। তার ডগায় একটা করে লাল পতাকা। প্রয়োজনে উল্টো দিকটা বেশ ভালই ব্যবহার করা যাবে। দরজা খুলে দিতেই কীর্তনীয়ারা ঘর ভরে দিলেন। এখন বুঝলুম, কেন সন্তোষদা দুপুরবেলাই একজন লোককে নিয়ে মাইক লাগিয়ে গিয়েছিলেন, ছাদের ওপর থেকে রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, একটা স্পিকার। সন্তোষদা বলেছিলেন, 'এখন আমি কিছু বলব না, তখন দেখবেন। অধর্মকে ধর্ম দিয়ে তাড়াব।' চেয়ার টেবিল সরিয়ে ফরাস পাতা হয়েছিল। বাইরের ঘরটা খুব একটা ছোট নয়। ঘেঁষাঘেঁষি করে সকলেরই জায়গা হয়ে গেল। শুরু হল নাম সংকীর্তন পাড়া একেবারে ফেটে গেল। নে, এইবার কত খিস্তি খেউড় করতে পারিস কর!

আমাদের পাড়ায় বিদঘুটে একটা লোক আড়ের মাথায়, বিশাল একটা সাবেক বাড়িতে থাকেন। সেই বাড়ির দরজা-জানালা সারা দিনই বন্ধ থাকে। ভদ্রলোক ভূতের মতো যাওয়া আসা করেন।

ছোট্ট একটা গাড়ি আছে ভদ্রলোকের। রোজ মজার পোশাক পরেন। চকরবকর জামা। জিনের প্যান্ট। ঢ্যাপ্‌পোল জুতো। এদিকে যখন নামগান চলছে, ভদ্রলোক তখন থানায় ফোন করেছেন। ধর্মীয়

অত্যাচারে পাড়ায় তিষ্ঠানো যাচ্ছে না। থানার অফিসার-ইন-চার্জ এসে হাজির।

'মাইক চালাবার অনুমতি নিয়েছিলেন? আপনাদের নামে কমপ্লেন আছে। বন্ধ করুন-চিৎকার।' অফিসার-ইন-চার্জের পাশে সেই চকরাবকরা লোকটা। শ্রদ্ধা মা এসেছিলেন। তিনি ভেতরে ছিলেন। গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলেন, 'কি হয়েছে অফিসার?' মায়ের টকটকে চেহারা দেখে অফিসার থতমত খেয়ে গেলেন।

'পাড়ায় কোন মাইক আপনাদের অনুমতিতে চলে? বিয়ে পইতে, পুজো। ধর্মীয় ব্যাপারে বাধা দেবার অধিকার আপনার নেই। সংবিধান পড়া আছে? দশটা পর্যন্ত আমরা মাইক চালাবো।'

'এই ভদ্রলোক যখন আপত্তি তুলেছেন, তখন আমাদের কিছু করার নেই।'

'কে এই ভদ্রলোক?'

'এই পাড়ার বিশিষ্ট মানুষ। বিশ্বম্ভর চৌধুরী।'

শ্রদ্ধা মা চৌধুরী মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় ছিলেন আপনি?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'আমি আমার বাড়িতে ছিলুম।'

'ওই ছেলেগুলো কাল থেকে অসভ্যতার চরমে চলে গেছে। বাড়িতে টেঁকতে দিচ্ছে না। আপনি শুনতে পাননি?'

'যৌবনের ধর্ম। সবকালেই যুবক ছেলেরা একটু হইহল্লা করে থাকে। প্রাণপ্রাচুর্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এইটুকু স্বাধীনতা তাদের দিতেই হবে।

'প্রাণপ্রাচুর্যে যুবকরা যদি অষ্টপ্রহর খিস্তি করতে পারে' তাহলে বুড়োরা আত্মরক্ষার জন্যে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন করতে পারে। আগে ওদের পেটাতে পেটাতে পাড়াছাড়া করুন, তারপর ভাবা যাবে কীর্তন বন্ধ করা যায় কিনা।'

অফিসার বললেন, 'আপনারা কমপ্লেন করেননি কেন?'

'কারণ, কোনও কাজ হবে না, উল্টে ওরা আমাদের কারোর লাশ ফেলে দেবে। ওরা তো নাচের পুতুল! সুতো তো অন্য লোকের হাতে। আবার সেই হাত ধরে আছে আপনাদের চুলের মুঠি, নেতাদের চুলের মুঠি।'

'আপনার তো ভীষণ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।'

'আগে ছিল না, এখন হয়েছে।'

'তাহলে কি হবে?'

'কীর্তন চলবে। আরও জোর চলবে। একদিন, দু'দিন, একমাস, দু'মাস. এক বছর। না থেমে সারা দিন-রাত।'

হঠাৎ সাদা রঙের একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। গাড়ির মাথায় লাল আলো। অফিসার চনমন করে উঠলেন। দরজা খুলে নেমে এলেন জাঁদরেল চেহারার এক ভদ্রমহিলা। সমীহ করার মতো ব্যক্তিত্ব।

মহিলা বাড়ির দিকে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন, 'কি হলো শ্রদ্ধাদি, পুলিস কেন?'

অফিসার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি?'

'ভূত দেখলেন নাকি?'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'অনেকটা তাই। আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন।'

'অ্যারেস্ট? অপরাধ?'

'এই যে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। সেই অপরাধে।'

'আচ্ছা, আজকাল বুঝি এইরকম হয়েছে। ধর্ম করলে জেলে যেতে হবে, অধর্ম করলে স্বর্গে।'

অফিসার বললেন, 'না, না, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, এর মধ্যে কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'একটা চক্রান্ত। এক চনচনিয়া এই বাড়িটা কিনে

ফ্ল্যাট তৈরি করবে। আমরা বিক্রি করবো না। তখন ঢনঢনিয়া এই গ্রুপ পাঠিয়ে দিলে, খিস্তি পার্টি। ওই যে সব ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে; সারাদিন বাড়ির সামনে ভূতের নৃত্য। আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলবার প্ল্যান। আর এই যে দেখছ, এঁর নাম বিশ্বম্ভরবাবু, মনে হয় ঢনঢনিয়ার এজেন্ট। হরিনাম করে আমরা ওই অসভ্যতাকে ঠেলতে চেয়েছিলুম। বিশ্বম্ভরবাবু পুলিস ডেকে এনেছেন।'

ভদ্রমহিলা অফিসারকে বললেন, 'এসব আপনি জানতেন না?'

'এর আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস করুন।'

'ওরা যে টাকা ছড়াচ্ছে, সেই টাকা তাহলে আপনাদের দিকে যায়নি।'

'এসব আপনি কি বলছেন?'

'তাহলে দেখবেন, ব্যাপারটা কেমন ম্যাজিকের মতো ঘুরে যাবে? বিশ্বম্ভর, তুমি বলো।'

আমরা সবাই মুহূর্তে হতভম্ব। বিশ্বম্ভর হাসতে হাসতে বললেন, 'ওই চক্রান্ত যে হবে আমি জানতুম। ক্যাপিট্যালিস্টরা এই ভাবেই এগোয়। পুলিস, মাস্তান, এজেন্ট এদের পে-রোলে আছে। মাসকাবারি ব্যবস্থা। এই ছেলেগুলো যখন পাড়ায় ঢুকে চরম অসভ্যতা করছিল, আমি ফোন করেছিলুম। থানা আমাকে যা বলেছিল, আমি আমার মাকে ঠিক সেই কথাগুলোই বলেছি। এরপর আমি যখন বিশ্বম্ভর চৌধুরী নামে ফোন করলুম সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো। এই নামটা আমি জানতুম। চক্রান্তের এজেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো। জিপ বেরিয়ে পড়ল। আইন নেমে এল। হইচই শুরু হয়ে গেল। দেশের এখন এই অবস্থা। উমাদি আপনারা মন্ত্রী হয়ে দপ্তরে বসে আছেন। ফাইল ধরে টানাটানি করছেন। ভাবছেন, দেশ চালাচ্ছেন আপনারা? দেশ চালাচ্ছে অদৃশ্য এক শক্তি।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'অনাথ, তোমাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার উমাকে। সে যে সব কাজ ছেড়ে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছে, না এলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেত।'

সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী উমা রায় বললেন, 'অফিসার, আপনি যে ধরা পড়ে গেলেন। এইবার কি হবে!'
'আপনি ভালই জানেন, আমার হাত-পা বাঁধা। আমি এখুনি ওই জানোয়ারদের পেটাতে পেটাতে নিয়ে গিয়ে লক-আপে ভরে দিতে পারি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোন। ছেড়ে দিতে হবে। যাবার সময় কলা দেখিয়ে যাবে। ছেড়ে না দিলে সুন্দরবনে ট্র্যানসফার আপনি সব জানেন।'
'এর সমাধান?'
'সমাধান, সকলের চাকরি। চাকরির অভ্যাস যতই চলে যাবে, সর্বনাশ আরও ঘনিয়ে আসবে! পরে চাকরি দিলেও আর চাকরি করতে চাইবে না। কারণ, দমকা টাকার লোভ। এক একটা এই ধরনের কাজ করবে, দশ-বিশ হাজার পেয়ে যাবে। কে করে দশটা-পাঁচটা। আর তাতে মাইনেই বা কত! আপাততঃ আমি এদের খেদিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনাদেরও সাবধানে থাকতে হবে। কাঁচা টাকার লোভে, ওরা সবকিছু করতে পারে।'
'বুঝেছি; আমরা আমাদের ছেলেদের খবর দিচ্ছি।'
'দিতে পারেন। পেটাপিটি হোক, তারপর কি করা যায় দেখি। কালো টাকা যত দিন না দেশ থেকে যাচ্ছে, তত দিন এদেশের ভাল হবার কোনও আশা নেই।'
অফিসারের চেহারা হঠাৎ পাল্টে গেল। রুদ্রমূর্তিতে ছেলেগুলোকে তাড়া করলেন! সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল ছিল, তারাও তেড়ে গেল। ছেলেগুলোর সঙ্গে বোমাও ছিল। একটা ছুঁড়ল আমাদের বাড়ির দিকে, আর একটা সোজা সন্তোষদার দোকানে। আমাদেরটা বাড়ির দেয়ালে লেগে ছিটকে চলে গেল। ফাটল না। ফাটলে আমাদের ক'জন থাকত, ক'জন যেত বলা শক্ত। সন্তোষদার দোকানটা বিকট শব্দে চুরমার হয়ে গেল।
আমি 'মা' বলে শ্রদ্ধা মাকে জড়িয়ে ধরলুম। বেশ জানি, সন্তোষদার

বাঁচার কোনও আশা নেই। ছোট্ট দোকান। শক্তিশালী বোমা! কীর্তনীয়ার দল খোল-খত্তাল ফেলে, পতাকার ডাণ্ডা উঁচিয়ে হে রে রে করে তাড়া করল। একটু আগে করলে সন্তোষদা হয়তো বেঁচে যেতেন। আমরা হেরেই গেলুম। যুদ্ধের প্রথম দিনে আমাদের পরাজয় হলো। যে ভাবেই হোক আমরা এত হরিনাম করলুম—নামের কি কোনই শক্তি নেই একালে!

চার

আমাদের আর এক বন্ধু চলে গেলেন। আমার আর এক ভালবাসার মানুষ সন্তোষদা। আমাদের সাহায্য করতে গিয়েই, আমাদের ভালবেসেই জীবনটা দিলেন। সন্তোষদা একেবার টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় যারা মানুষের জীবন নেয় তাদের আমি ক্ষমা করবো না। ওরা যখন পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল, তখনই আমার মন বলেছিল, ওরা বোম মারবে। প্রথম মারবে সন্তোষদাকে। মনের কথা তখন বিশ্বাস করিনি। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর আর একবার ভয় পেলুম। আমার মন আগে থেকেই কি ঘটবে জানতে পারছে। এ তো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার! এটা কি ধরনের ক্ষমতা! আমি হঠাৎ যা বলে ফেলছি, তা মিলে যাচ্ছে। আমার এই শক্তি কোথা থেকে এল! এটা কি কোনও শক্তি, না বিচারবুদ্ধি! হঠাৎ মনে হলো আমার শ্রদ্ধা মাকে ওরা চেষ্টা করবে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে গাড়ি চাপা দিয়ে মারার।

শ্রদ্ধা মাকে আমি চুপি চুপি সেই কথা বললুম।

'তোর হঠাৎ এমন মনে হলো?'

'বড়মা, আমার কেন জানি না, আজকাল যা মনে হয়, তাই ঘটে যায়! প্লিজ আপনি একটু সাবধান হবেন। একদম রাস্তায় বেরোবেন না।'

'উৎপল, আমি যে কখনও ভয় পাইনি, আর আজ ভয় পেয়ে গর্তে

লুকবো ?'

'এ তো গর্তে লুকনো নয়, সাবধান হওয়া। আমার বাবা বলতেন, সাবধানের মার নেই। আবার এও বলেন, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।'

'তুই বেশ বলিস। তোর কথা শুনলে মনে হয়, তোর মধ্যে কত বড় একজন জ্ঞানী মানুষ যেন বসে আছেন। ঠিক আছে বলছিস যখন সাবধান হব। একবার তো একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলুম। বোমাটা ফাটলে কি হতো!'

'বোমাটা যে ফাটবে না আমি জানতুম ; কারণ, ওই জায়গায় আমি ছিলুম। আমার যারা ক্ষতি করতে চাইবে তাদেরই ক্ষতি হবে।'

'এটা তোমার বিশ্বাস, না কোনও মহাপুরুষের দেওয়া ক্ষমতা!'

'তা জানি না মা। তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়েছে। আমার গলার স্বরটা হঠাৎ পালটে গেছে। অবিকল বাবার গলার মতো হয়ে গেছে! নিজের নাম ধরে যখন নিজেকে ডাকি নিজেই চমকে উঠি। যেন বাবাই ডাকছেন। বাবাই আমাকে চালাচ্ছেন।'

'তুমি তো বাবাকে ভীষণ ভালবাসতে, তাই হয়তো এইরকম মনে হচ্ছে।'

'আরও কিছুদিন দেখ মা, তারপর সঠিক বলতে পারবো।'

এই গোলযোগের মধ্যেই ভীষণ মনের জোর নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে গেলুম। তেমন কোনও প্রস্তুতিই ছিল না। তবু মনে হলো পারবো আমি। নিশ্চয় পারবো। বাবার সঙ্গে কলকাতার পথেঘাটে ঘুরতে ঘুরতে আর পড়ার আলোচনা করতে করতে আমার একটা জমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অঙ্ক আর ইংরেজিতে তো কেউ আমাকে মারতে পারবে না।

পরীক্ষায় বসে ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম আরও। কে যেন আমার পাশে বসে কানে কানে উত্তর বলে দিচ্ছেন। যেন তৃতীয় কোনও শক্তি পরীক্ষা দিচ্ছেন। আর সেই কণ্ঠস্বর হলো আমার বাবার। যিনি কেবলই আমাকে বলতেন, হেরে যেও না খোকা। হেরে যেও

না। পৃথিবীতে দু ধরণের লড়াই চলছে—শক্তির আর বুদ্ধির। শক্তি দেহনির্ভর। বুদ্ধি মন নির্ভর মনই সব। মন সাহায্য না করলে দেহ অচল। মন হুকুম করে, দেহ পালন করে। মনের চাকর হলো দেহ; বাবা আমাকে উপনিষদ আবৃত্তি করে শোনাতেন। কি সুন্দর!

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়াম আত্মাস্য জন্তোনিহিতো গুহায়।

আত্মা অতি সূক্ষ্ম, আবার বিশালের চেয়েও বিশাল। সেই আত্মা বসে আছেন তোমার হৃদয় গুহায়। তার সন্ধান করো। তাকে ধরতে পারলেই তুমি সর্বশক্তিমান। অপরাজেয় বিশাল সেই শক্তির ধ্যান করে; একটু একটু করে সাবধানে এগোবার চেষ্টা করো। তোমার মধ্যেই আছে অ্যাটম বম্ব। পরীক্ষা বেশ ভালই দিলুম। এত ভাল যে মনের আনন্দে একটু মোটাও হয়ে গেলুম। মাথায় একমাথা চুল, সামান্য কোঁকড়ানো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো হিরো হয়ে গেছি।

হঠাৎ দুটো নির্দেশ এল মনে। স্পষ্ট আমার বাবার কণ্ঠস্বর। সন্তোষ তোমাদের জন্যে প্রাণ দিল। তোমরা তার স্মৃতিতে কি করলে একমাত্র উপার্জনের পথ, তার দোকানটা তছনছ হয়ে গেল। তার পরিবার আজ পথে বসেছে। তোমরা তার কি করলে? আমার ছবিতে মালা ঝোলালেই হবে! এই শিক্ষাই কী তোমাকে দিতে চেয়েছিলুম! পরের জন্যে বাঁচতে শেখো। তাহলেই বাঁচার পুরো মজাটা পাবে। সকলকে নিয়ে বাঁচো। যে বাড়ির জন্যে এত কাণ্ড, সেই বাড়িটার নাম দাও সন্তোষ স্মৃতিসদন। শুধু নাম দিলে হবে না তোমার শ্রদ্ধা মা আর মাননীয় মন্ত্রীকে বলে এখানে একটা কেন্দ্র করো সমাজের দুস্থা মহিলাদের জন্যে। এখানে একটা কর্মকেন্দ্র করো। পরিবারের মেয়েরা কাজের অবসরে দুপুরবেলা এসে হাতের কাজ করবে। সামান্য যা উপার্জন হবে সংসারের আয় বাড়বে। রাতের দিকে, সারাদিন যারা খাটে এইরকম কিশোরদের জন্যে একটা স্কুল

খোলো। এই কাজের জন্যে টাকা কোথা থেকে আসবে জানো? সেই লোকটির কাছ থেকে যে এই বাড়িটাকে গ্রাস করতে চেয়েছিলে.। সেই ঢনঢনিয়া। তুমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ হবে। তোমার ভেতর থেকে ভয় জিনিসটাকে তো আমি দূর করে দিয়েছি। স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস তোমার আছে। ঠিকানা তোমাকে কে দেবে জানো—সেই প্রশান্ত মিত্র, অ্যাটার্নি। মানুষটা খারাপ নয়, কেবল একটু বিষয়ী। কোনও মানুষই নির্ভেজাল খারাপ বা নির্ভেজাল ভাল হয় না। ভাল আর মন্দ মিশিয়ে থাকে। ভাল দিকটাকে সেল্‌ফ থেকে যে-ভাবে বই টেনে বের করে সেইভাবে টেনে বের করে আনতে হয়। তোমার জীবনে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটবে। যারা খারাপ বদলোক তারাই তোমাকে ভীষন সাহায্য করবে। তাদের কাছ থেকেই তুমি পাবে জীবনের সবচেয়ে বড় বড় উপকার।

গভীর রাতের এই কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। যেন এইমাত্র রেডিওর কোনও স্টেশান ভেসে এল। বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। একটা মৃদু ধমক শুনলুম, এখনও তোমার অবিশ্বাস গেল না!

পরের দিন বেলা এগারোটার সময়, টেম্পল স্ট্রিটের সেই অ্যাটর্নি অফিসে গেলুম। হেড ক্লার্ক চিনতে পারলেন না। না পারারই কথা। অনেকদিন পরে আসছি। আমার চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। মাথায় অনেকটা বেড়েছি। শরীর বলিষ্ঠ হয়েছে। বাবা বলতেন, মরো-বাঁচো ব্যায়াম ছেড়ো না। রোজ এমন কিছু করবে যাতে খুব ঘাম বেরোয়, যাতে বেশ কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ো। মেহনতটা ছেড়ো না কোনওদিন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কেন জানি না, আমি একটু তাড়াতাড়িই যুবক হয়ে গেলুম। সেইটাই বোধহয় প্রয়োজন ছিল।

হেড ক্লার্ক বললেন, 'স্লিপ দিন।'

স্লিপ ভেতরে গেল। সেদিনকার মতো দীর্ঘক্ষণ বসতে হলো না।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক এল। প্রশান্তবাবু হঠাৎ যেন বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। শরীরের জন্যেই। সেই আমার সামনেই অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে গেলেন। পরে এসে আমি বেয়ারার কাছে খবর নিয়েছিলুম বাবু কেমন আছেন।

প্রশান্ত মিত্র অসাধারণ ভাল ব্যবহার করলেন। এমনকি ক্ষমাও চাইলেন সেদিনের ব্যবহারের জন্যে। বললেন, তোমার বাবা, আমি হিসেব করে দেখলুম ছ' হাজার পঁচিশ টাকা পাবেন। এই দেখো তোমার জন্যে খামে ভরে রেখে দিয়েছি। কবে আসো, কবে আসো এই এতদিন হয়ে গেল। তুমি আমাকে সেদিন ভুল বুঝেছিলে। আমি বুঝতে পারি, আমার বাইরের ভদ্রতাটা একটু কম। গাঁইয়া মতো। আমার ভেতরটা মনে হয় ততটা খারাপ নয়। তুমি টাকাটা নাও বাবা।'

টাকাটা আমি আর নিতে পারবো না জ্যাঠামশাই। বাবা আমাকে বলেছিলেন, কখনও সত্যভ্রষ্ট হবে না। আমিও ক্ষমা চাইছি আমার সেদিনের ব্যবহারের জন্যে।'

তুমি তাহলে বলো টাকাটা আমি কাকে দোবো? আমিও তো ঋণী থাকতে পারি না।'

'আপনি টাকাটা রাখুন। এই টাকাটা একটি পরিবারের খুব প্রয়োজনে লাগবে। আমি তাদের কারোকে পাঠিয়ে দেবো। আপনার তো আবার হিসেবের ব্যাপার। ইনকাম—ট্যাকসের ঝামেলা আছে। আপনি টাকাটা ডোনেশান হিসেবে দেখিয়ে দেবেন।'

'সে যা হয় হবে। তুমি এখন কি জন্যে এসেছ বলো!'

'আমি এসেছি এক ঢনঢনিয়ার ঠিকানার জন্যে।'

'বাড়ির ব্যবসায়ী!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'সে তো আমার ক্লায়েন্ট। তুমি জানলে কি করে?'

'হঠাৎ আমার মনে হলো।'

ভদ্রলোক ঠিকানাটা আমাকে দিলেন। চলে আসার সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জানো তো আমার বুকে পেসমেকার বসিয়ে দিয়েছে। শরীরে আর আগের তেজ নেই। তোমাকে একটা কথা বলি, আমার ছেলেপুলে কেউ নেই, তুমি তাড়াতাড়ি ল-টা পাশ করে নাও। তোমাকে আমার ফার্মের পার্টনার করে নি। তোমার মতো একটা ছেলে পাশে থাকলে মনে বেশ বল পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এসো না। আমাকে একটু সাহায্য করবে। আজকাল একটুতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ি।'

আমি আসবো বলে রাস্তায় নেমে এলুম।

পরের দিন সকালবেলায় গেলুম ঢনঢনিয়ার বাড়িতে। কলকাতার সবচেয়ে বড়লোকের এলাকা আলিপুরে ঢনঢনিয়ার প্রাসাদের মতো বাড়ি। প্রথমেই ধাক্কা খেলুম গেটে। বন্দুকধারী দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। বললুম, তোমার বাবুকে গিয়ে বলো, অ্যাটর্নি প্রশান্ত মিত্রের কাছ থেকে লোক এসেছে জরুরি খবর নিয়ে।'

ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। ভেতরের লনে গার্ডেন চেয়ারে বসেছিলেন ভদ্রলোক পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। নমস্কার করে বসলুম। চেহারা গাম্ভীর্য দেখে আমার ভয় পাওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু কোনও ভয়ই এল না মনে। বাবা বলতেন, ধনী ক্ষমতাশালী লোকের সামনে এসে যদি তোমার ভয় করে, সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে একটা দৃশ্য দেখবে, শ্মশান, চিতা জ্বলছে, রাজা, প্রজা, আমীর, ফকীর, ডিকটেটার, সোস্যালিস্ট, নায়ক, দর্শক সবাই ওই একই চিতায় পুড়ে ছাই হবে। ধনজন, ঐশ্বর্য সবই তখন কিছুই না। অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা। তুমি সেই লোকটির চলে যাওয়া দৃশ্যটা ভাবলে; এক টুকরো সুতো কি এক কণা ধুলোও তার সঙ্গে যাবে না।

ঢনঢনিয়াকে দেখে প্রথমে আমার একটু অস্বস্তিই হয়েছিল। লোকটা তো আসলে খুনী, জোচ্চর। ব্যাস, মনের চোখে যেই দেখলুম

লোকটাকে চিতায় তোলা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ভয় চলে গেল। রাজার পোশাক ছাড়িয়ে নিলে, রাজা প্রজায় কোনও তফাৎ নেই।
ঢনঢনিয়ার গলাটা ভীষণ গম্ভীর। মেঘের মতো। সকালের নরম রোদও অসহ্য, তাই হাল্কা রঙের গগলস চোখে। জিজ্ঞেস করলেন, 'বিশেষ কোনও খবর আছে কী!'
'আপনি খুনী। আপনার প্রচুর আছে, তবু আপনার লোভ গেল না। আর তো মাত্র দশ বছর আছেন; তখন কে এইসব ভোগ করবে?'
আমি ভেবেছিলুম ঢনঢনিয়া আমাকে এক চড় বা লাথি লাগাবেন। কিছুই করলেন না। শীতল গলায় বললেন, 'কী বলতে চাও? তাড়াতাড়ি বলে ফেল, সময় খুব কম আমার।'
'আমার নাম উৎপল চট্টোপাধ্যায়। আপনি আমাদের বাড়িটা কিনতে চেয়েছিলেন পাঁচ লাখ টাকায়।'
'কোন বাড়ি? আমার প্ল্যান আছে কলকাতার আমি থ্রি ফোর্থ কিনে ফেলবো।'
'কি হবে?'
'সে তুমি বুঝবে না। টাকা আমাদেয় রক্তে আছে। উইপোকার যেমন বই, শুঁয়াপোকার যেমন গাছের পাতা, মাছির যেমন মধু, আমাদের সেইরকম টাকা। কি হবে আমরা ভাবি না। আমরা একভাবে টাকা কামাই, আবার দান-ধ্যান-ধর্ম করি। তোমরা আমাদের মনস্তত্ব বুঝতে পারবে না।'
'আপনার জন্যে এক গরিব পরিবার আজ পথে বসেছে।'
'কে তোমরা?'
'আমরা হলে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে আসতুম না। আপনার ছেলেরা আমাদের বাড়ি ছাড়া করতে গিয়ে বোমা মেরে আমাদের বাড়ির সামনের এক দোকানদারকে মেরে ফেলেছে।
'খবর রাখি না। তা আমাকে কি করতে হবে?'

'প্রায়শ্চিত্ত।'
'ওরকম কত মরে, কত মরবে।'
'এ আপনার মনের কথা নয়, মুখের কথা।'
'কি করে বুঝলে?'
'মানুষ যখন একদিকে বড় হয়, তখন তার মনটাও বড় হয়ে যায়।'
'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে। আমি এতক্ষণ কারোর সঙ্গে কথা বলি না। তোমার বয়স কম; কিন্তু কথা বলছ বেশ জ্ঞানীলোকের মতো। কি করে তা সম্ভব আমি জানি না।'
'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি না, বলছেন আমার বাবা।'
'কে তোমার বাবা?'
'আমার বাবার নাম ছিল প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। বইয়ের ব্যবসা করতেন। ফরেন বুকস।
'প্রকাশ? প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। সেণ্ট জেভিয়ার্স।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।'
আমি তাকে চিনি। আমার সহপাঠী ছিল। অসম্ভব ভালো ছেলে ছিল। সন্ন্যাসীর মতো। প্রকাশ চলে গেছে!'
'হ্যাঁ, মারা গেছেন পথের ধারে। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ: আর হাঁটতে পারলেন না। একবার হার্ট অ্যাটাকে হয়ে গিয়েছিল। একজনদের রকে শুয়ে পড়লেন, আর উঠলেন না।'
বীরের মৃত্যু। খুব বড় চাকরি করত: সেই সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্লেনে। অত বড় চাকরি ছাড়ল কেন!'
'মালিক ওঁরই সামনে ওঁর এক সহকর্মীকে শূয়োরের বাচ্চা বলেছিলেন। বাবা প্রতিবাদ করায়, বাবাকে বলেছিলেন, বাঙালি কুত্তা।'
'পয়সা হলে মানুষ ছোটলোক হয়ে যায়। তুমি আমাকে কি করতে বলছ? বিশ, তিরিশ হাজার টাকা ওই লোকটির পরিবারকে দিয়ে দোবো?'

'না', আপনি আমাদের বাড়িটা কিনতে চেয়েছিলেন।

'আমি জানতুম না, ওটা প্রকাশের বাড়ি। আমার এজেন্ট অতসব আমাকে বলেনি।'

'ওই যে লোকটি আমাদের জন্যে প্রাণ দিল তার নামে আমাদের বাড়িটাকে একটা স্মৃতিসদন করতে চাই।'

'তোমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এসো। দেখি আমি কী করতে পারি। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার মতো আমার একটা ছেলে থাকলে আমার গর্ব হতো।'

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমার বাবা নেই।'

ভদ্রলোকের শরীর খুব ফিট। গার্ডেন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোজা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার কোনও ঘৃণা হলো না। ভদ্রলোকের স্পর্শ আমার ভালো লাগল। জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ইউ আর মাই সান।'

আমার মনে হলো না, কোনও সিনেমা হচ্ছে। চোর, জোচ্চর, গুণ্ডা, বদমাশদের নিয়ে রাজত্ব করতে করতে ভেতরটা মরুভূমি হয়ে গেছে। সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়া একটা শিক্ষিত লোক, তাঁরও তো একটা মন আছে। আমি সেদিন ফিরে এলুম। যে কণ্ঠস্বর গভীর রাতে শুনেছিলুম তা মিথ্যে নয়, মনের ভুল নয়। মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মা থাকে প্রিয়জনকে ঘিরে। তাকে পরিচালনা করে। বোঝার চেষ্টা করলেই বোঝা যায়।

সন্তোষদার স্ত্রীকে বললুম, 'শোকে মনমরা হয়ে বসে থাকলে চলবে? কত দিন বসে থাকবেন! মৃত্যু পৃথিবীকে অচল করতে পারেনি, পারবেও না। পারলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এত মানুষ মরেছিল যে তারপর পৃথিবীর আর বেঁচে থাকাব কথা নয়। এই যে নদী, যে নদী পার হয়ে আপনি বেলুড়ে যান, পালা-পার্বণে স্নান করে আসেন। যে নদীর জল পরিশ্রুত হয়ে আপনার কলসিতে আসে, পানীয় জল হয়, সেই নদী বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা হয়ে তেড়ে

আসে। তখন আর তার নাম জীবন নয়, মৃত্যু। কিন্তু সে আর ক'দিন! আবার শান্ত হয়, আবার ফসল ফলায়, আবার তৃষ্ণা মেটায়, আবার চাঁদের আলোয় গান গেয়ে বয়ে চলে। শোক ঝেড়ে ফেলুন।'

কাকিমা আমার বক্তৃতার কি বুঝলেন জানি না, শুধু বললেন, 'কি করে কি হবে বাবা! ছেলেটাকে বলেছি সাইকেল রিকশা চালাতে।'

'আপনাদের ওই এক আছে, মেয়েছেলে হলে ঝিগিরি। আর ছেলে হলে সাইকেল রিকশা। এই চিঠিটা নিয়ে এই ঠিকানায় যান। কালই যাবেন, ছেলেকে নিয়ে। অনেক টাকা পাবেন।'

'কত ?'

'ছসাত হাজার।'

মহিলা করুণ হাসলেন। হেসে বললেন, 'তুমি এখনও খুব ছেলেমানুষ বাবা, দুনিয়াটাকে চেনো না। এই বাজারে ছ'টা পয়সা কেউ দিতে চায় না, ছ'হাজার দেবে! এই সব সিনেমায় হয়।'

আজকাল আমার খুব রাগ বেড়েছে। ইচ্ছে করে রাগি। না রাগলে কাজে গতি আসে না; যেমন তরকারিতে ঝাল না দিলে স্বাদ বাড়ে না। খুব রেগে গিয়ে বললুম, 'যা বলছি তাই করুন। নিজের জ্ঞান ফলাতে যাবেন না।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'তুই তো বিশাল এক পরিকল্পনার কথা বলছিস! ভাবতে ভালো লাগে। সত্যিই কি টাকা দেবে। ব্যবসায়ী লোক। দিলেও কত টাকা দেবে! দশ, বারো, কুড়ি। তাতে কিছু হবে না বাবা!'

'তুমি উমাদির সঙ্গে বসে একটা বড় পরিকল্পনা করো না! আমি উৎপল চট্টোপাধ্যায় বলছি হবে, হবে, হবেই হবে।'

'তোকে আজকাল আমার ভয় লাগে। ক্রমশই যেন আগুনের মতো হয়ে উঠছিস।'

শ্রদ্ধা মা, উমাদি, অনাথবাবু এবং মা সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন। বড় পরিকল্পনা। উমাদি আর শ্রদ্ধা মায়ের তো খুব জ্ঞান! কি করলে কি হয় ভালই জানেন। নারী কল্যাণ সমিতি হবে। বিভিন্ন তার বিভাগ হবে। মেয়েরা কাজ শিখবে। উৎপাদন হবে। বিক্রি হবে। হেল্‌থ সেন্টার হবে। একটা শিশু-সদন হবে। ছাপাখানা হবে। বই ছাপা। শাড়ি ছাপা। দোতলায় একটা 'বোটিক' হবে। পয়সাঅলা মেয়েরা এসে কেনাকাটা করবে। নিচের তলায় একটা ফ্যাশান পারলার হবে।

পরের মিটিং-এ ঢনঢনিয়া এসে সকলকে অবাক করে দিলেন। আমরা মিস্টার ঢনঢনিয়া বলে সম্বোধন করেছিলুম। বললেন, 'আমার একটা ভাল নাম আছে, গুড নেম, বিক্রম। বিক্রমদা বললে কেমন হয়!

আমি বললুম, আমি তো দাদা বলতে পারবো না।'

'ইউ আর মাই সান। তুমি আমার ছেলে। তুমি আমাকে ফাদার বলবে।'

পরিকল্পনা তাঁর খুব পছন্দ হলো। বললেন, 'কাজের কাজ হলো। অনেকের উপকার হবে।'

অনেকক্ষণ থেকে অনেক কথা বললেন। নিজের ছেলেবেলার গল্প। সব বড়রাই ছেলেবেলার জন্যে দুঃখ করেন। আর তো ফিরে আসবে না ছেলেবেলা। আবার জন্মাতে হবে। বিক্রমবাবু চলে যাবার আগে আমাকে কাছে ডাকলেন, 'শোনো উৎপল, এইবার তোমার জন্যে একটা পরিকল্পনা করছি, তোকে আমি দু'মাসের মধ্যে আমেরিকা পাঠাবো। এখানে যত ভালই লেখাপড়া করো কিছু হবে না। ওখানে হার্ভার্ড থেকে তুমি বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট করে দেশে ফিরবে। তোমাকে আমার কনসার্নে বসিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নেবো।'

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, পাপের পয়সা।'

বিক্রমবাবু ঠাস্ করে আমার গালে একটা চড় মারলেন। আমি সত্যিই কি রকম হয়ে গেলুম। কোনও প্রতিবাদ করতে পারলুম না।

বিক্রমবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন সকলেই চুপ কারোর মুখে কোনোও প্রতিবাদ নেই। বিক্রমবাবু বললেন, 'ফুল। সেন্টিমেন্টাল ফুল। অনেক বই পড়েছ, সব বদহজম হয়েছে! পয়সা মানেই পাপ। তুমি কা ভাবো, পৃথিবীর সবাই সন্ন্যাসী হয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাবে। চোর, জোচ্চর, বদমাশ, গুণ্ডা বাটপাড়, আবার সাধু-সজ্জন, সবাই এই পৃথিবীতে, ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে পাশাপাশি থাকবে। অদৃশ্য একটা ছাঁকনি আছে। যার নাম জীবন। সেই ছাঁকনি গলে একজন দু'জন মহাপুরুষ হয়। মহামানব হয়। সন্ন্যাসী হয়। সৎপথ বললে তুমি কি বোঝ হে ছোকরা! বুদ্ধি আর পরিশ্রম মিলিয়ে যে কম-পথ তৈরি হয় তারই নাম সৎপথ। জীবন একটা যুদ্ধ। ছলে-বলে কৌশলে তোমাকে জিততে হবে। যে হেরে যায়, যে পরাজিত হয়, তার কোনও আদর্শ নেই। তার মুখে বড় বড় জ্ঞানের কথা শোভা পায় না। আর জানবে পৃথিবীর দুটো দিক —একদিকে ত্যাগ, সন্ন্যাস, আর একদিকে ভোগ আর অর্থ। সেইজন্যে সন্ন্যাসীও মহারাজ, সিংহাসনে যিনি তিনিও মহারাজ। এর মাঝে যা তা হলো দারিদ্রের জগৎ, আর যত পাপ সেইখানেই। এই দুটো জগৎ নিয়েই আমার কারবার। তোমরা যাদের ঘৃণা করো, আমি তাদের ঘৃণা করি না। আমি তাদের কাজে লাগাই। পাপের সংজ্ঞা জানো। কাকাতুয়ার মতো জ্ঞান কপচিয়ো না। যাদের কোনও কিছুই করার ক্ষমতা নেই, তারাই পাপ আর পুণ্যের বিচারে ব্যস্ত। হয় পাপ করো, আর না হয় পুণ্য করো। মাঝখানে অলস হয়ে বসে থেকো না। হয় সন্ন্যাসী হয়ে আজই বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে। আর তা না হলে, আমি তোমাকে গড়বো। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তোমার মধ্যে আমার জীবনে এই প্রথম, একটা ছেলেকে নিজের ছেলে বলে মনে হচ্ছে। তোমার জীবন, তোমার সময় বাজে আদর্শে খরচ করতে তোমাকে আমি দেবো না। কেন আমার এই আগ্রহ? একটাই কারণ তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। আই লাভ ইউ. যাও

নিজেকে প্রস্তুত করো। তোমার বাবার সবচেয়ে বড় স্মৃতি তুমি। সেই স্মৃতিসৌধের কথা ভাবো। টাকা থাকলে বিশাল বড় বাড়ি হবে। হাসপাতাল হবে। কারখানা হবে। কর্মকেন্দ্র হবে: কিন্তু গুণ আর শিক্ষা না থাকলে মানুষ বনমানুষ হয়।'

বিক্রমবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও পূর্বজন্মের একটা সম্পর্ক থাকে। চিনে নিতে হয়।'

বিক্রমবাবু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর গাড়ি চলে যাবার শব্দ পেলুম। সবাই বসে রইলুম স্তম্ভিত হয়ে। মা বললেন, 'কিরকম যেন স্বপ্নের মতো লাগছে।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'সবই তো স্বপ্ন। যতদিন বেঁচে আছি, এই জগত এক দীর্ঘ স্বপ্ন। সেই স্বপ্নেই কত কাহিনী।'

উমাদি বললেন, 'যে কোনও কারণেই হোক, উৎপলকে ভদ্রলোকের ভাল লেগেছে। আমি নাস্তিক। পাপ, পুণ্য, ঈশ্বর, ভাগ্য এসব আমি বুঝি না, মানিও না। আমি বুঝি কার্য-কারণ, বুঝি কর্ম আর কর্মফল। আর বুঝি, সুযোগ আর সুযোগের ব্যবহার। উৎপলের উচিত এই সুযোগ গ্রহণ করা। ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হলো, এর পেছনে আবেগ আর ভালবাসা ছাড়া অন্য কেউ নেই।'

আমার সামনে তিনটে পথ খুলে গেল—প্রশান্ত মিত্র আমাকে তাঁর ফার্মের অংশীদার করবেন, যদি আমি আইন পাশ করতে পারি। যোশীজি আমাকে বইয়ের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আর ফাদার বিক্রম আমাকে দু'মাসের মধ্যে বিলেত পাঠাবেন। আমি কি করবো? গভীর রাতে, আমার বাবার ঘরে, আমার বাবার খাটের সামনে, বাবার ছবির সামনে চুপ করে বসলুম। বাবা বলুন, আমি কী করব? তিনজনেই বড়লোক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দূরের স্টেশান থেকে ভেসে এল বাবার কণ্ঠস্বর। 'মানুষের মন দেখবে উৎপল। দেহের সিংহাসনে মনই সম্রাট। সেইদিক থেকে বিক্রম সম্রাট। যে পরকে আপন করতে জানে সে

হলো মহারাজ। প্রশান্ত অসুস্থ, অপুত্রক, সে তোমাকে লাঠির মতো ব্যবহার করতে চায়। ক্রাচের মতো। সে আগের মতো সুস্থ থাকলে তোমাকে পাত্তাই দিত না। প্রশান্ত হিসেবী খেলোয়াড়! যোশী তোমাকে একজন দক্ষ কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।'

'বিক্রমবাবুর এটা বড়লোকী খেয়াল নয় তো! বিদেশে গিয়ে বিপদে পড়ে যাবো না তো!'

'বিক্রমবাবু খেয়ালী বড়লোক জমিদার নয়। খেয়ালী মানুষ জীবনে বড় হতে পারে না। বড় ডাকাত আর বড় সাধু যে-যার এলাকায় সমান সৎ। পাপ আর পুণ্য দুটো আপেক্ষিক শব্দ। পৃথিবীতে পাপও নেই, পুণ্যও নেই। আছে কর্ম আর কর্মফল। আছে লক্ষ্য আর লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা।'

'বিক্রমবাবু যদি আমাকে গিলে ফেলেন!'

'হজম করতে পারবে না। যাও বেরিয়ে পড়ো বিশাল জগতে। ছোট হয়ে বেঁচো না। বড় হয়ে বাঁচো।'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন তো!'

'বোকা, আমি সব করাচ্ছি। এখনও অবিশ্বাস!'

হঠাৎ আমার মন খুঁজে পেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই লাইন :

আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

সন্তোষদার দোকানটা আবার খুলে গেছে। পেছনে ঝুলছে সন্তোষদার একটা ছবি। সেই সদাহাস্যময় সুন্দর এক মুখ। দোকানে বসেছে তাঁর ছেলে। প্রশান্ত মিত্র এক কথায় দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। বিক্রম ফাদার দিয়েছেন আরও দশ হাজার। আমাদের বাড়িটায় ভাঙচুর অদলবদল শুরু হয়েছে। একজন অবিশ্বাসী আমাকে বোঝাতে এসেছিলেন—তুমি একটা বোকা, ইমোশানাল বাঙালি। লোভী। বিক্রমের ফাঁদে পা দিয়েছ। ও এইভাবে তোমাদের ভেতর ঢুকে গেল। তোমাকে কায়দা করে পাঠিয়ে দিল দূর বিদেশে। বাঙালির লোভ। কপ্ করে টোপটা গিলে নিলে। এরপর ও এজেন্ট দিয়ে তোমাকে ছারপোকার মতো টিপে মারবে। তুমি হারিয়ে যাবে চিরতরে।

প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর মাথায়, এই এতটুকু, এতটুকু, ফাদার বিক্রম, আমার ছুই মা। রুমাল নাড়ছেন! একবার মনে হলো ফিরে যাই। ফাদার বিক্রমকে চ্যালেঞ্জ করি—সত্যি করে বলো তোমার উদ্দেশ্যটা কী, শয়তান।

আমার কাঁধে আলতো একটা হাত পড়ল চমকে ফিরে তাকালুম। কেউ নেই। কানের কাছে স্পষ্ট আমার পিতার কণ্ঠস্বর—নীচ মধ্যবিত্ত সন্দেহপরায়ণ বাঙালি বড় কিছু ভাবতে পারে না। সে অন্যকেও বিশ্বাস করে না। নিজেকেও বিশ্বাস করে না।

দিদির মতো সুন্দরী বিমানসেবিকা নিচু হয়ে বললেন, 'ফাস্টন ইওর সিট-বেল্ট।' প্লেন একলাফে আকাশে। চোখে একটু জল এল। আকাশ কি বিশাল?

দু'নম্বর

অনেক গাছের নাম শুনেছি, যেমন কদম গাছ, পাকুড় গাছ কলা গাছ, ক্রিসমাস গাছটা কি ? ক্রিসমাস ট্রি কোন নার্সারীতে পাওয়া যায় না, নিউমার্কেটে সাজানো থাকে। সেই গাছ আমার একটা চাই। গত বছর যে গাছটা কিনেছিলুম তার গোড়ায় অনেক জল ঢেলেছিলুম কিন্তু বাঁচাতে পারিনি তার কারণ ও গাছের কোন শিকড় থাকে না। নকল গাছে আসল জল ঢাললে সে কি আর বাঁচে ! ইংরেজি মতে নববর্ষ করতে হলে গাছ একটা চাই সেই গাছে জড়ানো থাকবে নকল জরি, দোলানো থাকবে চুমকি আবার কাঁচের গোলক দোলাতে হবে। বুকে করে নিয়ে আসবে সে উপায় নেই, চারা এনে বড় করব তাও হবে না কিন্তু গাছ একটা চাই। গাছ ছাড়া নিউ-ইয়ার হয় না। কেউ আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেনি যে ইংরেজি মতে নববর্ষ করতেই হবে, কিন্তু করতেই হবে তার কারণ স্ট্যাটাস ঝুলে যাবে। আমি বাঙালি কিন্তু বাংলা নববর্ষ বড় গেঁয়ো ব্যাপার। আমি বাঙালি এই পরিচয়টা দিতেও লজ্জা করে। ছেলেটাকে ঠেলেঠুলে ইংলিশ মিডিয়ামে ঢুকিয়েছি লেখাপড়া না শিখুক আদব-কায়দা আর স্ল্যাংটা তো শিখবে তাইতেই আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে, সায়েব হওয়ার বড় শখ।

গুঁতোগুঁতি করে নিউমার্কেটে ঢুকলাম। আমার মত অনেক বাদামী সাহেব সেখানে গুঁতোগুঁতি করছে। ঘোষ, বোস, মিত্তির, সঙ্গে গিন্নীরাও রয়েছেন। বিদেশী পারফিউমের গন্ধ উড়ছে। খুচখুচ ইংরেজি বুলি নানা মাপের ক্রিসমাস ট্রি, দাম শুনলেই চোখ কপালে ওঠে, থরে থরে সাজানো রয়েছে গ্রীটিংস কার্ড, টুপি, রঙিন কাগজ কেনার জিনিসের অভাব নেই, কিন্তু পয়সার তেমন জোর নেই। আচ্ছা গাছ

ছাড়াই নববর্ষ করলে ক্ষতি কি . যে ফ্ল্যাটে থাকি সেখানে তো পা ফেলার জায়গা নেই। গাছটা রাখব কোথায় ? বাড়িতে বাবা আর মা দু'জনেই প্রাচীনপন্থী, একমাত্র আমার বউ-ই আধুনিকা। এরকম একটা মিশ্র পরিবারে গাছ ছাড়াই নববর্ষ হোক না।

আচ্ছা নববর্ষ আর কিভাবে করা যায় ? খুব সহজ। কেক খেলেই তো নববর্ষ হয়ে যায়। জানুয়ারি মাসের এক তারিখে সকালবেলা এক টুকরো কেক আর এক কাপ চা আর বার কতক হ্যাপি নিউ-ইয়ার বলা। তা'হলেই তো নতুন বছরকে যথোচিত স্বাগত জানানো হল। তার আগের রাতে টেলিভিশন তো আমাকে বর্ষ বিদায় দেখিয়েছে। নাচ হয়েছে, গান হয়েছে ভাঁড়ামি হয়েছে চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ইনিয়ে-বিনিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে—'পুরানা সাল খতম হো গয়া, নয়া সাল আ রহা হ্যায়'। রাতের ওই অনুষ্ঠান শেষে জল-টল খেয়ে কাঁথার তলায় জড়োসড়ো হতে হতেই নয়া বছর দেড় ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। সকালে ঘুম ভাঙল দেরিতে।

গতরাতে কেক একটা কিনেছি। অনেক মাথা খাটিয়ে। ক্যালকুলেশন করে। বড় কোম্পানির কেক সোনার দামে বিকোচ্ছে। গাড়ির পর গাড়ি আসছে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে সুডৌল, সুশ্রী পা। খেলে যাচ্ছে সিল্কের শাড়ি। নাকে ঝাপটা মারছে বিদেশী সুবাস। যে দোকানের সামনে এই ফ্যাশান প্যারেড চলছে, সেই দোকানে বাতাবি সন্দেশের মত ছোট্ট একটা কেকের দাম একুশ টাকা। কে জানে জুয়েলফুয়েল সেট করা আছে কি না। এক শ্রেণীর মানুষের এত টাকা খরচ করার পথ পাচ্ছে না। আবার গরীব দুঃখীদেরও দেওয়া যায় না, সাহায্য করলে মানুষের মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। প্যারাসাইট তৈরি হয়। হ্যাঁ, খাটো খাও। কোথায় খাটবে, আর কত পাবে, আর কি খাবে, সে তোমরা বুঝে নাও। আমাদের টাকা আমরা ওড়াবো। দুটো কেক খাব। টিসু-পেপারে মুখ মুছব, একশো টাকার একটা নোট ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসব। কার

তাতে কি ? আই হ্যাভ মানি, আই স্পেণ্ড মানি। আমার পায়রা আমি ওড়াবো। লোকে যেভাবে ঝুড়ি বোঝাই কয়লা কেনে, সেইভাবে আমরা কেক কিনব : বিশ, বাইশ, ত্রিশ হাজার! আরে ইয়ার, মেরা পাশ রূপেয়া হ্যায়। কত উপঢৌকন পাঠাতে হবে! তালেবরদের কাছে। যারা আমাকে হেল্প করে। ওপর মহলের বড় কর্তা, ছোট কর্তা, মেজো-সেজো-না। আরে মশাই কতদিক সামলাতে হবে। ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, থানা, পুলিস ইত্যাদি। নাম্বার টু ছাড়া লপচাপানি অসম্ভব। সেই বৃটিশ আমল থেকেই নিউইয়ার্স হল আমলা আর গামলাদের, চোরে চোরে যারা মাসতুতো ভাই, তারাই মাঝরাতে বোতল মেরে, ঠ্যাং চিবিয়ে, ভুঁড়ি দুলিয়ে ধিনিক নাচ নাচতে, নাচতে চেত্তা খেয়ে পড়ে।

তা তুমি বাবা সংসারী মানুষ, তোমার এমত দুর্বুদ্ধি কেন হয়! তোমার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তোমার গেলাস আছে বোতল নেই, তোমার জীবন আছে আনন্দ নেই, তোমার চাকা আছে তেল নেই। তোমার সব বছরই এক বছর, তোমার এই ভীমরতি কেন ভাই।

এ-সব দেখে দেখে হয়। দেখনাই জিনিস : অ্যাং নাচে ব্যাং নাচে তার সঙ্গে ফড়িংও নাচে। ঠ্যাঙের জোর নেই তুড়ি লাফ! কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার শখ। একটু ওপরওলার বাতাস নেবার শখ। সায়েব-সুবোরা করত, না জানি কি জিনিস! যেমন সঙ্গতি, সেই রকম ব্যবস্থা। এতটা চ্যাটচেটে হলুদ কাগজ মোড়া কেক, তার দামই আমার দু'রোজের বাজার খরচ, সেইটাকে চায়ের টেবিলে সাড়ম্বরে শোয়ানো হল। তারপর কাটাকুটি। সংখ্যায় তো আমরা কম নই! কেক প্রায় গুঁড়ো, গুঁড়ো। শেষে নস্যির মত, খইনির মত নাকে না ফেলে মুখে ফেলা। হ্যাপি নিউইয়ার!

এক চড়েতেই রাজা

'আবার শুয়ে পড়েছে।'

'থাক শুয়ে। রোজ অফিসে বেরবার আগে নেকামি আমার ভালো লাগে না। আমাকে খেটে খেতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়।'

'আমিও কিছু বসে বসে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে গোঁফে তা মেরে খাই না। তোমার ইঞ্জিনে রোজ আমাকে ফুয়েল ঢালতে হয়।'

'সারাদিন তুমি বিশ্রাম পাও। দুপুরে একটু গড়াতে পারো। সারাদিন আমাকে চরকি পাক মারতে হয়। সে খবর রাখো?'

জপের মালা কপালে ঠেকিয়ে মৃণালিনী বারান্দার কোণ থেকে বললেন, 'কেন ঝগড়া করিস খোকা? বউমা সারাটা দিন বাড়ি মাথায় করে রাখে।'

'মা, যে বাড়ি মাথায় করে রাখে সে এই সামান্য কাজটুকু পারে না।'

'ওটা সামান্য নয় বাবা ওই লগবগে জিনিস তুমি ছাড়া কে খাড়া করবে?'

'কোন্ রাশকেল, রোজ রোজ ওটাকে শুইয়ে দিচ্ছে?'

মৃণালিনী জিভ কেটে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ রামের বাহনকে ইংরিজী গালাগাল দিস্‌নি বাবা।'

'রামের বাহনের নিকুচি করেছে। লঙ্কায় যা করেছ, করেছ, এটা পশ্চিমবঙ্গ।'

তাপস দুম দুম করে ছাদের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। স্ত্রী ছায়া চলল পেছন পেছন। জানে তাপসের একার মুরোদে কুলোবে না। সাহায্য করতেই হবে। মুখপোড়া হনুমান। হনুমানকে মুখপোড়া

বলে ফেলেই টুক করে কপালে হাত ঠেকাল। রাম আর হনুমান দু'জনেই সমান পূজনীয়। উত্তর ভারতে মহাবীর মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

টিভির এরিয়াল ছাদে ত্রিভংগমুরারী হয়ে শুয়ে আছে। প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা ডাণ্ডার মাথায় অ্যালুমিনিয়মের পাখনা, ছাদ থেকে ছবি ধরে নিচের ওই বাক্স যন্ত্রের পর্দায় চালান করে। মুক্ত বাতাসে উদার পরিবেশে এসে তাপসের মেজাজ নরম হয়ে গেল। নীল শাড়িতে ছায়াকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। বেশ একটু প্রেম প্রেম ভাব আসছে। হনুমানের মুখের সঙ্গে স্ত্রীর মুখ মনে মনে একবার মিলিয়ে নিল। কিসে আর কিসে? চাঁদে আর চাঁদমালায়। স্বভাবে সামান্য মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও চেহারায় আকাশ-পাতাল ফারাক।

তাপস স্ত্রীকে প্রশ্ন করলে, 'তোমার হনুমান সব ছেড়ে এই টিভি অ্যাণ্টেনা নিয়ে পড়েছে কেন বলতে পারো? এটাকে কি দশানন রাবণ ভেবেছে? না, তোমাকে ভেবেছে অশোক কাননে সীতা!

'তোমার হনুমান বোলো না। হনুমান তোমারও নয় আমারও নয়। তাকিয়ে গ্যাখো কোনও ছাদে অ্যাণ্টেনা নেই। সব ধরাশায়ী।'

'কোথা থেকে মালেরা এলো বলো তো!'

'মাল আবার কি, মাল, যতো বাজারে ভাষা! হনুমান কবে থেকে মাল হোলো। সেদিন মায়ের সামনে তুমি আমাকেও মাল বলেছ।'

বুদ্ধিসুদ্ধি যাদের কম তাদেরকেই মাল বলে। এমন কিছু খারাপ কথা নয়। নাও হাত লাগাও। এখনও আমার অনেক কাজ বাকি। তোমার ওই হনুমানের জন্য চাকরিটা এবার আমার যাবে।

লকপক লকপক করে অ্যাণ্টিনা উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। ওপরের পক্ষবিস্তারে বাতাস ধরে দু'জনকেই টাল খাইয়ে দিচ্ছে। ছায়ার ভীষণ হাসি-রোগ। একবার কোনও কারণে হাসতে শুরু করলে আর থামতে চায় না। হাসলে শরীরের জোর কমে যায়।

তাপস বিরক্ত হয়ে বললে, 'শুধু শুধু হেসে মরছ কেন? ঠিক করে ধরো।'

বাতাসে ছায়ার চুল উড়ছে। শাড়ি এলোমেলো করে দিচ্ছে। তাপসের ভীষণ ভালোবাসা পাচ্ছে। ছায়ার এই বিরহী চেহারা তাকে উন্মনা করে দেয়! বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়। মনে হয় জন্ম-জন্মান্তর বেঁচে থাকে।

ছাদের আলসের এক পাশে হুক দিয়ে জ্যাম করা ছিল। হনুমান হুকটুক সব খুলে নামিয়ে দিয়েছে। হুক লাগাবার ক্ষমতা তার নেই। মিস্ত্রী ডাকতে হবে। জিনিসটা আগে আবিষ্কার করলে কষ্ট করে খাড়া করার দরকার হত না।

তাপস বললে, 'নাও আবার আস্তে আস্তে শুইয়ে দাও। এ আর তোমার আমার ক্ষমতায় হবে না। মিস্ত্রী চাই।'

অ্যান্টেনা আবার শুয়ে পড়ল। ছায়া বললে, 'আজ চিত্রমালা ছিল গো! সব মাটি হয়ে গেল।'

'মাটি হয়ে গেলে আমি আর কি করতে পারি বলো। হনুমান সামলাতে পারো না। নিজের হনুমান এলে কি করবে?'

'যাঃ' বলে ছায়া চটাস করে এক চড় মারল।

পাশের বাড়ির তিন তলার চিলের ছাদ থেকে মলয় বললে, 'আগে কাজ তারপর মারামারি।'

ছায়া ছুটে নিচে নেমে গেল। মলয় তাপসের বন্ধু। মলয়দের এরিয়াল হনুমানে কেতরে দিয়ে গেছে। একেবারে শুইয়ে দেয়নি।

তাপস হেঁকে বললে, 'কি আজ বেরোবি না?'

'বেরবো'

'আমাদেরটা একেবারে শুইয়ে দিয়ে গেছে ভাই। হুকফুক সব ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছে।'

'যাও এখন লোক ডেকে আনো। একে বলে আধুনিক ব্যাধি। যবে থেকে এই যন্তর বাড়িতে ঢুকেছে সেইদিন থেকে জীবনের শান্তি চলে গেছে।'

ছ'ফুট লম্বা এরিয়েল-দণ্ড তার সাজ-পোশাক নিয়ে ছাদে শুয়ে রইল।

তাপস বেরোবার সময় বউকে বললে, 'এক সময় তো প্রাইমারী স্কুলে পড়াতে। ছপটি মেরে অনেক বাঁদরকেই তো সামলাতে। আজ দুপুরে ওটাকে একটু চোখে চোখে রাখো, নয়তো একটা একটা করে পাঁজর খুলে নিয়ে চলে যাবে।'

'এই ভাদ্রমাসের রোদে সারা দুপুর আমি ছাদে বসে থাকব!'

'কেন বড়ি হলে কি করতে। বেনারসী হলে কি করতে! আচার হলে কি করতে!'

আর কথা বাড়াবার সময় নেই। তাপস ঝড়ের বেগে স্টপেজের দিকে ছুটলো।

॥ দুই ॥

দুপুরের দিকে ছায়ার একটু তন্দ্রামত এসেছিল। একটু আগে তাপসের এক সেট প্যাণ্ট-জামা ইস্ত্রি করেছে। নিজের একটা শাড়ি ইস্ত্রি করেছে। যখন শুয়েছিল তখন বিদ্যুৎ ছিল, এইমাত্র লোডশেডিং হয়ে গেল। চলমান পাখা ধীরে ধীরে থেমে আসছে। পাশের ঘরে মা বলছেন, 'মুখপোড়ারা জ্বালিয়ে খেলে।'

আধো নিদ্রা আধো জাগরণে ছায়া শাশুড়ীর গলা শুনতে পেল। গুমোট গরমে আর শুয়ে থাকা যাবে না। উঠতেই হবে। পাঁচ মিনিট আগে আর পাঁচ মিনিট পরে। শরীর শিথিল হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। চোখ আটকে আছে সিলিং-এ। পাখা সম্পূর্ণ অনড়। ভেন্টিলেটার দিয়ে টি ভি এরিয়ালের কালো তার ঢুকেছে। দেয়াল বেয়ে নেমে এসে কোণের দিকে টি ভি'র পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারটা হঠাৎ নেচে উঠল।

বাতাস নেই তার নাচছে কেন?

ছায়া উঠে বসল। এরকম তো কোনও দিন হয় না। তারের বাড়তি অংশ টি ভি'র পেছনে আলগা হয়ে ঝুলছিল। সড়সড় করে ওপর দিকে উঠে গেল। কেউ বাইরে থেকে টানছে। টানের বেশ জোর আছে।

টিভিটা স্ট্যাণ্ড থেকে উল্টে পড়ে যাবার মত হল।
ছায়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠে টিভিটা চেপে ধরে এরিয়েলটা খুলে দিল। প্লাগ সমেত তার সড়সড় করে ওপর দিকে উঠতে উঠতে ভেন্টি-লেটারে আটকে গেল।
ম্যাজিক। যাদুকর পি সি সরকার পরলোকে। তবু ম্যাজিক।
প্লাগটা নিচে পড়ে গেল। তারটা বাধামুক্ত হয়ে সুড়ুৎ করে ভেন্টি-লেটার গলে বাইরে চলে গেল।
কার কাজ? তবে কি এরিয়েল খাড়া করতে মিস্ত্রী এসেছে।
ছায়া ঘরের বাইরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ মা ছাদে কি মিস্ত্রী এসেছে?'
'কই না তো?'
'তা হলে?'
'তা হলে কি?'
ছায়া তরতর করে ছাদে উঠে গেল। উঠতে উঠতে মনে হল, একা নয়, মিস্ত্রী সদলে এসেছে। সারা ছাদ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।
ছাদে এসে চক্ষুস্থির। বড় ছোট মাঝারি গোটা সাতেক নধরকান্তি হনুমান কাজে লেগে গেছে। এরিয়াল সন্ধিপদ প্রাণী। অনেক তার গাঁট। হনুমানের ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সব খুলে পড়েছে। বিচ্ছিন্ন অংশের এক একটি এক এক জনের কাঁধে। একটাকে চেহারা দেখে মনে হল বীর। সেটা সর্বাঙ্গে তার জড়িয়ে আলসের ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে।
কোমরে আঁচল জড়িয়ে 'তবে রে মুখপোড়া' বলে এগিয়ে যেতেই বেশ প্রমাণ মাপের স্ত্রী হনুমানটি দ্রুত এগিয়ে এসে ছায়ার গালে সপাটে একটি চড় বসিয়ে দিল।
চড় খেয়ে চড় হজম করার মেয়ে ছায়া নয়। এত বড় অপমান। সেও সপাটে একটা চড় কষিয়ে দিল। এ তো আর ত্রেতা নয়। ঘোর কলি। একপ্রকার চড়ের জন্যে হনুমান সুন্দরী প্রস্তুত ছিল না।

সে তার মাতৃভাষায় দলবলকে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে আহ্বান জানালো। বীর হনুমান নিজের কায়দায় নিজেকে অকেজো করে বসে আছে। এরিয়েলের প্যাঁচ মেরে অসহায়। সে হুপ-হাপ করে ডাকতে লাগল। বাকিগুলো খ্যাঁকর খ্যাঁ করছে। ছায়ার রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

আশেপাশের বাড়ির ছাদ থেকে সমস্বরে সকলে চিৎকার করছে।

'ওগো তোমাদের বউকে মেরে ফেললে। খণ্ড খণ্ড করে দিলে।'

ছায়া অ্যান্টেনার একটা খোঁচা হাতে তুলে নিয়ে পাঠশালার পণ্ডিতদের মত ধমকাচ্ছে, 'চোপ, একদম চোপ।' ওপাশের বাড়ির ছাদ থেকে একটি ফচকে ছেলে নামতা পড়তে শুরু করেছে 'দু এককে দুই, দুই দু গুণে চার।' ছায়ার ডানগালটা জ্বালা করছে হনুমানের চড়ে। তবু সে ছাড়ার পাত্রী নয়। তাপস তাকে যা বলে গিয়েছিল এখন সে তাই করতে পেরে মনে মনে ভীষণ খুশি।

ছায়ার আস্ফালনে বাচ্চা হনুমানরা পড়া না পারা ছাত্রের মত কোণের দিকে চলে গেছে। তার জড়ানো বীর হনুমান আলসে থেকে ঢুপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল। ছায়া পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে ঝট করে সিঁড়ির দরজাটা একবার দেখে নিল, কত দূরে। প্রয়োজন হলে ছুটে পালাতে হবে। বীরের সংগে লড়ার ক্ষমতা তার নেই।

তাপসের মায়ের হাঁটুতে বাত। তবু তিনি চারপাশের চিৎকার শুনে ওপরে উঠে এসেছেন। দৃশ্য দেখে সাহস করে ছাদে আসতে পারছেন না। সিঁড়ি থেকেই বলছেন—'অ বউমা এরিয়েল যায় যাক, তুমি নেমে এসো।'

ছায়া বললে, 'জীবনে আমি কাউকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি, আজ এসপার ওসপার যা হয় একটা কিছু করে ফেলবো।'

'অ বউমা খেড়েটা এগিয়ে আসছে। তুমি পালিয়ে এসো বউমা।'

বীর হনুমানের কি মনে হল কে জানে, ছায়ার মধ্যে সীতাকেই বোধহয় দর্শন হল। সীতার মতই দেখতে। তাপসের নাকটা আর

একটু টিকোলো হলে রামচন্দ্র বলতে আপত্তি হত না।

ছায়া বীরাঙ্গনার মত বললে, 'আয় সাহস থাকে তো এগিয়ে আয়।'

বীর হনুমান ছায়ার পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়ল। একবার করে মাথা ঠেকায়, একবার করে মুখ তুলে তাকায়। মুখে একটা অপরাধীর ভাব। যেন বলতে চাইছে—'মা জননী, অপরাধ করে ফেলেছি ক্ষমা করো।'

তাপসের মা বললেন, 'এ কি দৃশ্য, আহা একি দৃশ্য!'

দৃশ্যের আশেপাশের ছাদ থেকে যারা টিপ্পুনি ছুঁড়ছিল তারা সব চুপ।

ছায়া বললে, 'এ সব কি করেছিস? তোর বউ আমাকে চড় মেরেছে কেন?'

বীর খ্যাখ্যা করে স্ত্রীকে কি বলতেই, গুটি গুটি এসে ছায়ার পায়ে মাথা রাখল।

ছায়া বললে, 'আর কোনও দিন এরকম অসভ্যতা করবে?'

হনুমান দম্পতি নীরবে তাকিয়ে রইল।

ছায়া বললে, 'চুপ করে সব লাইন দিয়ে বোসো, একটা করে কলা পাবে।'

॥ তিন ॥

কি থেকে কি হয়।

দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, মুকুজ্যে বাড়ির বউ ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। পিল পিল করে লোক আসছে আর যাচ্ছে। কারুর মামলা, কারুর ছেলের চাকরি, কারুর জনডিস, কারুর পেটের ব্যামো। মেয়েরা আসছে ছেলে কোলে।

'মা, মাথায় একটু ফুঁ দিয়ে দাও, নজর লেগেছে।'

'মা গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও একজ্বরী হয়ে আছে আজ তিন হপ্তা।'

মাঝে মাঝে বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামছে। দূরে থেকে নাম শুনে ছুটে এসেছেন প্রভাবশালী ব্যক্তি।

'মা ব্যবসা বড় ঢিমে যাচ্ছে। একটু ব্লাড-সারকুলেশান করে দাও মা'।

'মা হৃদয়টাকে একটু দুলিয়ে দাও।'

তাপস প্রথম প্রথম একটু বিরক্ত হত। বউ ক্রমশই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। নিজের সম্পত্তি থেকে ক্রমশই জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারি ভারি চেহারার মানুষ এসে পা জড়িয়ে ধরছে—'মা একটু কৃপা করো মা।'

না চাইতেই বড় বড় সন্দেশ আসছে। ফল আসছে। ভালো ভালো ধূপ আসছে, ফুল আসছে। ছায়ার মুখে একটা দেবী ভাব এসেছে। তাপস এখন স্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারির মত, দ্বাররক্ষীর মত।

মাঝ রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে, কি থেকে কি হয়ে গেল। সে যুগে সীতা পাতাল প্রবেশ করেছিলেন, এযুগে রামচন্দ্রের পাতাল প্রবেশ। এক চড়েতেই কি হয়ে গেল।

অর্জুন

'ব্রহ্ম অফুরন্ত আনন্দের একটি অখণ্ড আনন্দনাড়ু।' দীক্ষান্তিক ভাষণে একটি নিটোল সন্দেশ মুখে পুরে গুরুদেব আনন্দলাভের কয়েকটি গূঢ় কৌশল আমাকে শিখিয়ে দিলেন। 'জীবন বুঝেছো জনার্দন একটি গামছার মত। নিঙড়ে নিঙড়ে জল বের করার মত রস বের করে নেবে। সব সময় একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকবে। মাতোয়ারা হয়ে থাকবে। সব সময় নিজেকে একটা না একটা উত্তেজনার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে রেখে দেবে। সংসারে থাকবে ঠিক যেন বয়েমের মধ্যে আমের আচার। ধর্মটর্ম কিছু নয় বাবা! ওটি হল একটি বর্ম। মানুষের ধর্মটি পুরোপুরি পালন করবে। কখন ভগবান হবার চেষ্টা করবে না। ভগবান তোমার ইষ্টদেবতার চিত্রপটে আছেন। সেই চিত্রপট আছে কুলুঙ্গির ওপর তেল, কালি আর ঝুল মেখে। ওই আদরেই তিনি সন্তুষ্ট। আদরের বাড়াবাড়িতেই তিনি রুষ্ট। আর একটি কথা শুনে রাখো বাবা, সংসারে নিজের চে বড় আর কেউ নেই।'

গুরুর বাক্য যে কত অভ্রান্ত তা এখন আমি বুঝেছি! যৌবনে মানুষের কিঞ্চিৎ মতিভ্রম হয়। অধীত বিদ্যার বদহজম, আদর্শ, মানবতাবোধ, প্রেম, কাম সব মিলিয়ে ভূতগ্রস্ত অবস্থা। বয়েস যত বাড়তে থাকে, জ্ঞানচক্ষু ততই খুলতে থাকে। বেঁচে থাকার, আনন্দে থাকার হাতে কলমে শিক্ষা। তখন প্রৌঢ় আমি, যুবক আমির দিকে তাকিয়ে বলে সেন্টিমেন্টাল ফুল। গুরু বলেছিলেন—জীবনসাধনার কথা। সময়ে সিদ্ধিলাভেরও ইঙ্গিত ছিল। 'দুঃখ কোরোনা, সিদ্ধি কারুর অল্পেই হয়, কারুর একটু দেরিতে হয়। আধারের ওপর নির্ভর করে।'

আমার আধার বোধ হয় ভালই ছিল। কারণ সিদ্ধি আর সিদ্ধাই দুটোই প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। চিরকালই আমার ধারণা পৃথিবীতে আমিই সব। আমার চেয়ে বড় কেউ নেই। আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় কেউ নেই। এত বড় স্ব-প্রেমী বা আত্মপ্রেমী মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা আমার জানা নেই। আমি মনে করি—পৃথিবীর যত আয়োজন সব আমার জন্যেই। আমার ভোগের পর উচ্ছিষ্ট যদি কিছু থাকে অন্যে পাবে। এ ব্যাপারে কোনও আপোষ নেই। সকালের খবরের কাগজ দিয়েই আমার এই আত্মবিশ্বাসের খেলা শুরু হয়ে যায়। জানালা গলে কাগজটি মেঝেতে পড়ামাত্র আমার আত্মবিশ্বাসী হাত এগিয়ে যায়। আমি যতক্ষণ না সেই কাগজ হাতছাড়া করছি ততক্ষণ অন্য কারুর কৌতূহল প্রকাশের অধিকার বা আগ্রহ থাকলেও উপেক্ষিত। আগে আমি তারপর অন্য সকলে!
বাথরুম ব্যবহারেও আমার সেই এক মনোভাব। একবার ঢুকলে সহজে বেরোতে চাই না। সমস্ত জানা গানের এক লাইন করে গাই। বে-সুরো হলেও গ্রাহ্য করি না। দেয়ালে জল ছিটোই। বাথরুমের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাছে পাই। সংসারের দাবার চাল ঠিক করি। কার পশ্চাদ্দেশে কিভাবে বংশদণ্ড দোবো তার পরিকল্পনা করি। বাথরুম আমার কাছে সাধনার নিরিবিলি পীঠস্থান। দরজার বাইরে আর সকলের প্রাতঃকালীন গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করলেও আমার দাবী আমি কিভাবে অস্বীকার করি?
সমাজে অন্য কোনও ভাবে আমার প্রতিষ্ঠার আসন বিছোতে না পারলেও বাস কিম্বা ট্রামের আসনে আমি নিজেকে ফলাও করে ছড়িয়ে রাখি! জোড়া আসনের তিনের চার ভাগই আমি দখলে রাখতে চাই। বাকি এক চতুর্থাংশে যিনি বসবেন আমার দয়ায় বসবেন। একটু সরে গুছিয়ে বসার অনুরোধ আমি রাখি না কারণ আমি কারুর ডিক্‌টেশানে কাজ করায় কখনই অভ্যস্ত নই। সমাজে চলা-ফেরার ব্যাপারে মহাপুরুষের বাণী আমার চরিত্র গঠন করে দিয়েছে—লোক না পোক্।

আমার চোখে বিশ্বসংসারের সবাই হল কিলবিলে পোকা। আমার শরীরে তেমন পাশবিক শক্তি না থাকলেও মুখের জোরে আমার দৈহিক শক্তির অভাব আমি পূরণ করে নিয়েছি। ঝগড়া আর তর্কে, কথার মারাত্মক মার প্যাঁচে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথমে আড়চোখে প্রতিপক্ষকে একবার দেখে নিই। যেই দেখি আমারই মতো ছাপোষা, ডিসপেপটিক একজন বাঙালী সঙ্গে সঙ্গে আমার কথার তূণ থেকে শাণিত সমস্ত বাক্যবাণ ছুঁড়তে থাকি। গুরুর নির্দেশ—সব সময় নিজেকে উত্তেজনার মধ্যে রাখবি, দেখবি জীবনের সমস্ত শূন্যতা কেটে গ্যাছে। অফিস যাত্রার ঘণ্টাখানেক পথে সহযাত্রীর সঙ্গে মনোরম কলহে সময় যেন কোথা দিয়ে কেটে যায়। ঝগড়া অনেকটা তুষারের তালের মত। জনস্থলে একবার পাকিয়ে দিতে পারলেই হল। পক্ষে বিপক্ষে সকলের অংশগ্রহণে নিমেষে জমজমাট হয়ে ওঠে। জীবনকে জমজমাট করে রাখাই তো শ্রেষ্ঠ জীবন সাধনা।

যে পাড়ায় থাকি সেখানেও আমার ওই একই নীতি। একটা কিছু বাঁধিয়ে রাখো। গোটাকতক আটপৌরে প্রতিপক্ষ জিইয়ে রাখো। আশেপাশে কিছু ঝঞ্ঝাট তৈরি করে রাখলে নিজের পরিবারে বেশ একতা বজায় থাকে! সংসার চালানোও সহজ হয়ে ওঠে। নিজের সংসারের পাশাপাশিই ভাইয়ের সংসার থাকলে বাঁধাতেও হয় না আপনিই বেঁধে থাকে। বৌয়ে বৌয়ে, ছেলেতে ছেলেতে চুলোচুলি। মাঝে মাঝে শুধু ইন্ধন জুগিয়ে যাও। নিজের স্ত্রীকে এইভাবে জড়িয়ে রাখতে পারলে স্ত্রীর মুহুর্মুহুঃ নানা আবদার থেকে নিজের অব্যাহতি। ছুটির দিনে বেড়াতে চল। অমুক আত্মীয়ের বাড়ি পুরো ষষ্ঠীবাবুর সংসার ট্যাঁকে বেঁধে। নয়তো সিনেমায় চল। এইসব উটকো ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি। ছুটির দিন সকালে উঠে ধুম ঝগড়া বাঁধিয়ে দাও। মাঝে মাঝে একটু চা। ঝগড়ার চা স্ত্রীরা একটু পরিপাটি করে পরিবেশন করে থাকেন। করবেনই তো! চায়েতেই তো বাঙালীর বল। প্রতিবেশী পরেশবাবুর সঙ্গে তা না হলে সারা সকাল স্বামী

লড়বে কিসের জোরে! মুখঝামটার বহরও কিছু কম। বিপদের সময় স্বামী স্ত্রী ইউনাইটেড। টেকো পরেশের চেয়ে ওর গুঁটকে বউটা আরও পাজি। কারুর ভালো দেখতে পারে না। হ্যাঁ গো দেখতো চিনি ঠিক হয়েছে কিনা!—আর চিনি পরেশের তেলানি আজ ভাঙবো। আমি পরেশটাকে ম্যানেজ করছি। তুমি ওর বৌটাকে পারবে?

—কেনো পারব না! ঝগড়া কি আমাকে আমার মা কম শিখিয়েছে। দাঁড়াও শাড়িটা ভাল করে কোমরে জড়াই।

—হ্যাঁ জড়াও। আজ ওর একদিন কি আমার একদিন।

ঝগড়ার দিনে উনুনে আগুন পড়ে না। খাওয়ার দিকে নজর থাকে না। বাজারের ঘটা থাকে না। খরচ কমে। একটু সেভিংস হয়। সংসারে ঝগড়া হল মা লক্ষ্মী! রবিবারটাকে কায়দা করে ঝগড়ার জুম্মাবার করতে পারলে হয়তো মেয়ের বিয়ের কি নিজের শ্রাদ্ধের টাকাটা উঠে আসে। গুরু বলেছেন—কর্মের কৌশলই হল যোগ।

গুরুই বলেছেন—ধর্ম একটি বর্ম। মন্দ বলেন নি! রবিবার ছুটির বার। সকলেই একটু ভুরিভোজের আশায় থাকে। সেই আশায় দাও ধর্ম্মের ছাই। নোলায় ধর্মের ছ্যাঁকা। রবিবার স্রেফ নিরামিষ। ট্যাঁড়স, কাঁচকলা, মোচা, থোড়ে সন্তুষ্ট থাক। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবার, শনিবার বারের বার। সোমবার শিবের বার। পনের টাকার মাছ, ষোল টাকার মাংস, মাংসের দোকানের লাইন থেকে অপূর্ব নিষ্কৃতি! ধর্মের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল—উদাসীনতা। পাঁকাল মাছের মত থাকবি ব্যাটা। পাঁকে থাকবে কিন্তু পাঁক মাখবে না। সংসারের কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। কে মরল, কে বাঁচল দেখার দরকার নেই। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বেশি হৃদ্যতা একটা বিলাস। খরচের ধাক্কা! মাঝে মাঝে তেনাদের আগমন মানেই সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট। দু-একদিন থাকা মানেই জীবন অতিষ্ঠ। তারপর বিয়ে আছে,

ভাত আছে, হ্যানা আছে ত্যানা আছে। হলুদ চিঠি মানেই—ওরে তোর শিয়রে শমন! একমাত্র কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিতেই সুখ। তাও আবার মাছ মাংস থাকবে না যে পরের পয়সায় বিশ পঁচিশটা ছাগা মেরে আসব! সেকালে একঘরে হয়ে থাকা ছিল সাজা, একালে আশীর্বাদ! দশ বাই দশ খুপরি ফ্ল্যাটে নিজের পরিবারটুকু সামলে থাক জনার্দন, বেশি বাড়াবাড়ি করলেই উপার্জনের সরু সুতোর ওপর তোমার ব্যালেন্স হারাবে, তারপর চিৎ হয়ে পড়লে কোনও সম্বন্ধী দেখবে না।

অসুখ-বিসুখের ব্যাপারেও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। রাখে কেষ্ট মারে কে? মারে কেষ্ট রাখে কে! প্রথমে হোমিও, টোটকাটুটকি, নিজের জানা দু একটা ট্যাবলেট ম্যাবলেট। রোগ যখন বেশ গুরুপাক, একেবারে নাছোড়বান্দা তখন কম ফীর সাবেক আমলের ডাক্তার। তারপর যখন খাবি খাওয়ার অবস্থা তখন প্যাঁচা মুখ করে ডাকো স্পেসালিস্ট।

তবে হ্যাঁ উদাসীনতার ওপর সামান্য একটু মেক-আপ চড়াতে হবে। এমন ভাব করতে হবে যেন তোমার চে দরদী আর কেউ নেই। স্ত্রীকে মাঝে মধ্যে একটু তোয়াজ তো করতেই হবে। সেই ভদ্রমহিলা যে বড় প্রয়োজনের জিনিস। সকালের চা, নটার ভাত, দুটোর টিফিন, রাতের ডিনার, জামার বোতাম, বিছানার মশারি, সন্তানের জননী, তোমার স্ত্রী। পুত্র তোমার ইনভেস্টমেণ্ট। দেড়শো টাকা পেনসান সম্বল করে তোবড়া গালে বুড়োবুড়ি যে তার কাঁধেই ভর করার আশা রাখে। এখন থেকেই তাকে আদর্শের টনিক খাওয়াও। ওরে না বাবাই যে তোর ঈশ্বর। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম। সন্তান, লটারির টিকিট। ভাগ্য পরীক্ষা। লাগালে লেগে গেল। না লাগলে বাণপ্রস্থ।

জনার্দন স্বার্থ ছাড়া জগৎ অচল। জগৎ হল লেনা ঔর দেনা। বড়র কাছে ছোটো হবে ছোটর কাছে বড়। যেখানেই স্বার্থ দেখবে

সেখানেই ন্যাজ নেড়ে নেড়ে এগিয়ে যাবে। আত্মাভিমান রাখবে না। পৃথিবীতে বাঁচতে এসেছো, তুলোধোনা হতে আসনি। এই কুরুক্ষেত্রে আমরা সবাই অর্জুন। গাণ্ডীব-টাণ্ডীব ফেলে দিয়ে ম্যাদামারা হয়ে বসে থাকলে চামচিকিতেও লাথিয়ে যাবে! অলওয়েজ শঠে শাঠ্যং সমাচরেত। তুমি শঠ, তোমার আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁরাও শঠ। তবে কিনা, আমাকে কেউ পায়নি, আমিও কাউকে পাইনি। জীবন একটা পেয়েছি, মৃত্যু অনিবার্য পরিণতি। মাঝখানে একটু ফুটবল খেলা।

বাপের চা

তোর বাপের চাটা নিয়ে যা।

রোজ সকালে রান্নাঘরের দিক থেকে এই কথাটি ছোট্ট পাখির ডানার ঝাপটার মতো উড়ে আসে। রমেন নিজের ঘরে কুটকুটে কম্বলের আসনে বসে শোনে। দিনের প্রথম কাকের ডাকের মতো বউয়ের হাঁক-ডাক।

স্ত্রী নীপা মোটামুটি শিক্ষিতা, তবু কেন যে বাপ বলে। বাপ শব্দটার মধ্যে এমন একটা তাচ্ছিল্য আছে, শুনলেই গা রি-রি করে। বহুবার বলেছে, সোজা করে বলেছে, বাঁকিয়ে বলেছে, কোনোও কাজ হয়নি। নীপার দৃষ্টি-ভঙ্গি অনেকটা সরকারের মতো, বিদ্যুৎ অথবা দুগ্ধ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মতো, কি পুলিস-বিভাগের মতো, চলছে চলবে। রমেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। আর কি হবে ভ্যাজার ভ্যাজার করে। জীবন তো প্রায় মেরে এনেছে। আর কটা বছর। পঞ্চাশ পেরিয়েছে। বাটে চাকরি থেকে বসে যাবে। বাষট্টিতে অথর্ব। তেষট্টিতে ফৌত। মিটে গেল ঝামেলা। সম্প্রতি দীক্ষা নিয়েছে। ফার্স্ট থিং ইন দি মরনিং, হাত-মুখ ধুয়ে চোখ বুজিয়ে ১০৮ বার। জপ করতে করতে কিছু কানে না আসাই উচিত। তবু এসে যায়। এই তো সবে হাতে খড়ি হয়েছে। জপ সিদ্ধ হতে সময় লাগবে। তাই কানে আসে—তোর বাপের চাটা নিয়ে যা। শোনে, আর চমকে ওঠে। ভাবে, আহা! সংসারে এই তার খাতির। মাসে প্রায় তিন হাজারের মতো ঢালে। ঢেলে ঢেলে দেউলে হয়ে যাবার দাখিল। নিজের একজোড়া জুতো কিনতে হলে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গাদি খেলার অবস্থা। ঢুকবো কি ঢুকবো না। দু'পা যায় তো তিনপা পিছিয়ে আসে। নেশা করে কেনাকাটা করতে পারলেই ভাল হয়। যা হবার ঘোরে হয়ে যাক। একটা মারিজয়ানার ট্যাবলেট খেয়ে দোকানে ঢোক। জামা কেনো,

জুতো কেনো, ছাতা কেনো। যা সব দাম হয়েছে, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। অথচ ওপক্ষের মুখ থেকে কথা খসা মাত্র, শাড়ি, স্লিপার, শ্যাম্পু, সেন্ট, সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট, মায় সপ্তাহে একটি করে লটারির টিকিট এসে যাচ্ছে। অ্যাতো তেল ঢেলেও সংসারে স্নেহের বড় অভাব।

নীপাকে রমেন একদিন বুঝিয়ে বলেছিল, ছাখো আমি হলুম তোমার সেই রাজহংস, যে ডেলি একটা করে সোনার ডিম পাড়ে। আমাকে একটু স্নেহ-যত্ন করলে, তোমাদের লাভ ছাড়া লোকসান হবে না গো। নীপা উত্তর দিয়েছিল, তুমি আমার একটি অশ্ব। সারা জীবন অশ্বডিম্বই পেড়ে গেলে।

তাই নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ! তাই। মাথা গোঁজার একটি আস্তানা আজও হল না। আজও উত্তর-ভারত, হিমালয় ঘোরা হল না। হীরের একটা আংটির শখ ছিল, হল না। যাকে বিয়ে করব ভেবেছিলুম, তার বউয়ের ভাগ্য শুনবে ? আমেরিকায় গিয়ে বসে আছে। বছরে একবার প্লেনে চেপে দেশে আসে। সেই ছেলে এখন বিশ হাজার টাকা মাইনে পায়।

আমেরিকা, বিশ হাজার। রমেন হাঁ হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ।

হাঁ-টা বুজিয়ে ফেল, বলে নীপা উঠে গিয়েছিল বিছানা থেকে।

আর একদিন রমেন বলেছিল, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝলে না নীপা।

নীপা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, দাঁত আজকাল বাঁধানো যায়, সে দাঁতে কড়-মড় করে মাংসের হাড়ও চিবনো যায়।

রমেন অবাক হয়ে ভেবেছিল, সে মরলে, এই মহিলা শ্রাদ্ধের বদলে কি করবে ? মনে হয় সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে।

রমেন জপ করে আর ভাবে। ভাবতে, ভাবতে অতীতের ঘটনায় চলে যায়। সেই সময় নীপার যে কথায় যে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মাথায় আসেনি এখন সেই সব মানানসই চোখা উত্তর খুঁজে বের

করে। যতক্ষণ জপ-ধ্যান ততক্ষণই নীপার সঙ্গে মনে মনে ধুম ঝগড়া। শেষে বিরক্ত হয়ে আসন পাট করে উঠে পড়ে। ইষ্ট-দেবী আর গুরু-দেবের ছবির সামনে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ভেউ ভেউ করে বলে, প্রভু কিছুই হল না, কিছুই হল না আমার। কামিনী-কাঞ্চনে একেবারে লেবড়ে আছি।

গুরু বলেছিলেন, রমেন্দ্রনাথ, এইবার ধীরে ধীরে মনটাকে সংসার থেকে তুলে নাও। ঢুকে পড়েছ বেশ করেছ, বেরোবার কৌশলটাও এবার শিখতে হবে। সংসার বের করে দেবার আগে নিজে বেরিয়ে এস সসম্মানে। সব সময় ভাববে, ওরা আমার কে! গালাগাল দিয়েই ভাববে ও শালারা, আমার কেউ নয়। মনে মনে গাইবে—

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়
মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
দু'চার দিনের জন্য ভবে
কর্তা বলে সবাই মানে
সেই কর্তারে দেবে ফেলে
কালাকালের কর্তা এসে।
যার জন্যে মরো ভেবে
সে কি তোমার সঙ্গে যাবে!
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া
অমঙ্গল হবে বলে॥

রমেন কিছুক্ষণ, হায় প্রভু, হায় প্রভু, করে, চারপাশে তাকিয়ে দেখে বাপের চা কেউ নিয়ে আসেনি। রান্না ঘরের সামনে, কেলে মিট-সেফের মাথার ওপর স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে খোলা পড়ে আছে। প্রত্যাশাই মানুষের দুঃখের কারণ। নীপা চা বয়ে আনবে না, জানা কথা, কিন্তু মেয়ে রুমার আনতে কি হয়। প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যায়। রান্নাঘরের দিকে যেতে আজকাল আর ইচ্ছে করে না। ওদের মুখ দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। অকৃতজ্ঞ স্বার্থপরের দল।

নীপা মুখে জর্দাপান পুরে জব্দন বাঈয়ের মতো চাকাপানা মুখ নিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। যেন ভীমরুলের চাক। খোঁচালেই ঝাঁক ঝাঁক কথার ভীমরুল উড়ে আসবে। আর রুনা মনে হয় বিশ্বসুন্দরী হবার সাধনা করছে। সারা মুখে দুধের সর মেখে আয়নার সামনে এলো। চুলে দাঁড়িয়ে। রমেনের কাছে সিক্রেট খবর আছে, রুমার দামড়া দামড়া অনেক ছেলে বন্ধু জুটেছে। তাই সব সময় কেমন একটা উড়ু-উড়ু রোমান্টিক ভাব। আর ছেলে! তিনি তো পরহিতব্রতে ব্যস্ত। নাইবার, খাবার, লেখাপড়া করার অবসর নেই। তেনার আবার এক প্রেমিকা জুটে গেছে। শহরেব সেই এলাকার রাস্তা জরীপের পুণ্য কর্তব্যে তিনি ব্রতী। গোঁফ আর চুলের চেকনাই নিয়ে ভীষণ বিব্রত। বোম্বের মডেলের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে কেবলই হোঁচট খাচ্ছে। প্রেম-সেবা করতে গিয়ে পিতামাতার সেবার তিলার্ধ সময় নেই।

স্টিলের গেলাসটা তুলে নিতে নিতে রমেন মেয়েকে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, এইটা আর এগিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না মা?

মেয়ে সুর করে বললে, তুমি তো আহ্নিক করছ বাবা?

এখনও করছি?

আহা করছিলে তো!

অন্য সময় নীপার সঙ্গে রুমার ঝটাপটি লেগেই থাকে। নীপা হয়তো বললে, কি রে, পটের বিবি হয়ে বসে আছিস, আটাটা মেখে দিয়ে একটু উপকার করতে কি হয়।

নীপার মুখের ওপর রুমার উত্তর সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল, যাও তো, তোমার কেবল বসে বসে হুকুম। আমি পারছি না, পারব না। নিজে মেখে নাও।

পারবি না?

না, না, না।

আচ্ছা, নিজের দরকারের সময় তুই আসিস আমার কাছে। তখন

একেবারে অন্য সুর।

সংসারের কাজ নিয়ে, শাড়ি পরা নিয়ে, বিছানা করা নিয়ে, কলেজ থেকে সোজা বাড়ি না ফেরা নিয়ে দুজনে অনবরতই চুলোচুলি হচ্ছে। কিন্তু বাঙালী দল পাকাতে ওস্তাদ। যেই রমেন কিছু বলবে অমনি নীপা রুমার দলে।

নীপা বললে, তোমার ভণ্ডামি কোনদিন কতক্ষণ চলবে ও জানবে কি করে। তখন তো আবার কেউ ঘরে ঢুকলেও পরে পরে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।

রমেন বললে, ভণ্ডামি! ধ্যান, জপ ভণ্ডামি !

কার ধ্যান, কিসের ধ্যান সে তো আমি জানি।

এরপর আর কথা বাড়ানো চলে না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেমন পেট আলগা হয়, সেইরকম মুখও আলগা হয়। নীপার মুখের এখন আর কোনও রাখঢাক নেই। মেয়ের সামনে নরক গুলজার না হওয়াই ভাল।

রমেনের একটা দুর্বলতা নীপা জানে। আর শেষমেশ সেইটা চেপে ধরেই নীপা জিতে যায়। মানুষের সব দুর্বলতাই গোটাকতক 'ম'-এর মধ্যে ঢুকে আছে। হয় এই 'ম', না হয় ওই 'ম'।

এক পাড়ায় এ-বাড়ি, ও-বাড়ি একটা মেলামেশা গড়ে ওঠেই। কারুর সঙ্গে খুব হলায়-গলায়, কারুর সঙ্গে দেঁতো হাসি, আর প্রশ্নোত্তরে, কি কেমন আছেন, ভাল আছি।

সাতাস নম্বর বাড়ির হাসিদির সঙ্গে প্রথম হলায়-গলায় হয়েছিল নীপার। আসা-যাওয়া। তরকারি চালাচালি। একসঙ্গে সিনেমা দেখা। শাড়ি পাল্টাপাল্টি। রমেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কি কেমন আছেন এর। একটু হাসি। প্রতি হাসি। রমেন মাঝে-মধ্যেই বউ ভাল মুডে থাকলে, দু'একটা মন্তব্য করত, আহা এই বয়সেও হাসিদির চুল দেখেছ? হাসিদির রঙ দেখেছ? হাসিদির ঠমক দেখেছ? শাড়ি পরার ধরন দেখেছ।

মুড ভাল থাকলে নীপা বলত, যাও না, কাজল-টাজল পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দি। রাতটা কাটিয়ে এস। ভদ্রমহিলার স্বামী সপ্তাহে একবার বাড়ি আসেন। একটি মাত্র ছেলে হস্টেলে পড়ে।
আর এক মুডে থাকলে তেড়ে উঠত, বউকে সেবা করতে জানলে ওইরকম ঠমক-ঠামকই থাকে। বউ আর বিলিতি কুকুর এক জাতের জিনিস। তোয়াজে রাখতে হয় বুঝলে? তোয়াজে।
যার বরাতে যা ঘটে। রমেন একদিন গাড়ি করে বাড়ি ফিরছে। পথে হাসির সঙ্গে দেখা। বউবাজারের মোড়ে, বাস-স্টপে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। রমেনের ভেতরটা ছলকে উঠল। থার্মোমিটারে পারার মত ঝট ঝট করে বয়েস নেমে গেল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললে, উঠে আসুন। উঠে আসুন।
একগাল হেসে, গালে টোল ফেলে, শরীর তুলিয়ে, একপাশের বুকের আঁচল খসিয়ে, গাড়ি কাঁপিয়ে, হাসি রমেনের পাশে ধপাস করে বসল। ঘুরে দরজা বন্ধ করার সময় রমেনের গায়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল। ল্যাত্ করে খোঁপার ধাক্কা লেগে গেল নাকে।
সারাটা পথ হাসির হাসি, আর নানা গল্পে রমেন একেবারে মশগুল। হাসির আবার থেকে থেকে মাইরি বলার অভ্যাস। তেমন মজার কথা হলে, যান বলে তু'হাত দিয়ে ঠেলাও মারে। মাত্র আধ ঘণ্টার পথ, তার মধ্যেই নিবিড় আলাপ। কাঁধে কাঁধ লেগে গেল। হাতে হাত ঠেকল। মনের কথা, প্রাণের কথা। সিনেমা, থিয়েটারের শখের কথা। ভাল লাগার কথা। সব কথাই হল। একবারও নীপার প্রসঙ্গ হল না। তুজনের কারুরই মনে রইল না, আলাপের সূত্রপাত নীপাকে দিয়েই। রমেনের কেবলই মনে হতে লাগল, তার বিয়ে-টিয়ে হয়নি!
হাসি বেশ চালাক মেয়ে। মাতাল কিন্তু তালে ভুল হয় না। বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে মোড়ের মাথায় বললে, আমাকে এখানে নামিয়ে দিন।

রমেন হাঁ হাঁ করে উঠল, কেন, কেন ?

হাসি মুচকি হেসে বললে, কারণ আছে মশাই। আমাদের দুজনকেই সংসার করে খেতে হবে।

সেই কেস গড়াতে গড়াতে প্রায় ফ্র্যাকচার-কেস হবার দাখিল। দুপুরে হাসি একদিন রমেনের অফিসে গিয়ে হাজির। অফিস থেকে কেটে সিনেমায়। সিনেমার পর রেস্তোঁরা। পরে একদিন গঙ্গা ধার। তারপর একদিন ট্যাক্সি ভ্রমণ। রমেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলে আর খরচ করে।

আর রাতে শুয়ে শুয়ে নানা উদ্ভট পরিকল্পনা। হাসিকে নিয়ে দূর কোন দেশে পালিয়ে গেলে কেমন হয়। ইলোপমেন্ট। এই এক-ঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। কোনও রোমান্স নেই। অ্যাডভেঞ্চার নেই। বউ যেন টেরিলিনের প্যান্ট। ছেঁড়ে না, ফাটে না, ফুটো হয় না। মাঝে মাঝে সেলাই খুলে যায়। শেষের দিকে রঙটা একটু চটে যায়। না ফেলে দিলে, সারা জীবনই শরীরে লেপ্টে থাকবে।

সারা বিশ্বে স্ত্রীদের গুপ্তচর ছড়ানো থাকে। রমেন একদিন ধরা পড়ে গেল। পাড়াতুতো ঠাকুরপো এসে খবর দিয়ে গেল নীপাকে। দাদাকে দেখেছে, কলকাতার ভূতঘাটে বসে, হেসে হেসে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। কোলের কাছে হাসি বউদি।

রাতে রমেনের খুব ঝাড়ফুঁক হল। নীপা তাড়াতাড়ি খাইয়ে স্বামীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দোরে খিল দিলে। রমেন ভাবলে, আহা, অনেকদিন পরে আজ বুঝি প্রেম ওতলাল। এমন চাঁদিনী রাত! পিউ কাঁহা পাখি ফুকরোচ্ছে আকাশে।

আলো নিবল। তারপর ঝাড় কাকে বলে। বুড়ো দামড়া প্রেম হচ্ছে, প্রেম! তুমি আমার পাঁঠা। ধড়ে কাটলে ধড়ে, ন্যাজে কাটলে ন্যাজে। ইয়ারকি পেয়েছ। নীপা ভয় দেখালে—আত্মহত্যা করে, পুলিসকে স্রেফ দুটি লাইন লিখে যাব। তখন বুঝবে, কত ধানে কত

চাল। এই বউ মারার যুগে সোজা চালান হয়ে যাবে হাজতে। চোদ্দ বছর ঘোরাও ঘানি।

পরের দিন হাসিকেও ঝেড়ে এল নীপা।

হয়ে গেল পরকীয়া। প্রেমের সমাধি তীরে রমেন বসে রইল মনমরা হয়ে। স্ত্রী হল মোচা, পরস্ত্রী হল রেজালা। মনের দুঃখে রমেন শেষে দীক্ষা নিয়ে নিল। সংসার থেকে রমেনের মন উঠে গেছে। সে এখন হারিয়ে যেতে চায়। হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে দেখতে চায়, নীপা অ্যাণ্ড হার পার্টি কোন সুরে সানাই বাজায়! রোজ টিভিতে দেখে কত ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি কেমন নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে! কোথায় যায়, কিভাবে যায়! টেকনিকটা কি? কাকে জিজ্ঞেস করে? লালবাজারের মিসিং পার্সন্স স্কোয়াডে লোক নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে যায়, সে কি একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁ মশাই বলতে পারেন, কিভাবে হারিয়ে যেতে হয়?

সন্ধেবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে রোজই ভাবে, আজ চলার মুখটা ঘুরিয়ে দেবে। পারে না কিছুতেই। ভয় হয়, এই অচেনা পৃথিবী। কোথায় যাবে. কে দেখবে! তবু নীপা তাকে চেনে। সে নীপাকে চেনে। মাঝে মাঝে মনে হয়, নীপাকে সে ভালই বাসে। লঙ্কা না পড়লে তরকারির রঙ খোলে না, স্বাদ আসে না। রোজ সকালে, বিশ বছরের পরিচিত গলায়, ওরে তোর বাপের চাটা নিয়ে যা—না শুনলে, মনেই হয় না বেঁচে আছে, আর একটা দিন শুরু হয়েছে।

সুখ-অসুখ

মনোরঞ্জন নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরেশই আমাকে খবরটা দিল। কি একটা কাজে সে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে গিয়েছিল। ফাইল সই করাতে, নাকি বিল পাশ করাতে। গিয়ে দেখে এসেছে চক্রবর্তী সাহেব চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছেন। গলার টাই আলগা করে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। তাও গলগল করে ঘামছেন। সকলেই বলাবলি করছে, হার্ট।

মনোরঞ্জন আমার বন্ধু। একসঙ্গেই অফিসের গাড়িতে একটু আগে অফিসে এসেছি দু'জনে। আসার সময়ে তাকে খারাপ দেখিনি। রোজকার মতই হাসছিল, গল্প করছিল। হঠাৎ কি হল, কে জানে? আমার ডিপার্টমেণ্ট তিন তলায়, মনোরঞ্জনের চার তলায়। মনোরঞ্জন আমাদের কোম্পানীর চিফ অ্যাকাউন্টেণ্ট। বিলেত থেকে সি-এ করে এসেছে। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল।

তাড়াতাড়ি গেলুম চারতলায় তার ঘরে। ঘষা কাঁচের দরজার বাইরে ছোটখাট একটা জটলা তৈরি হয়েছে। ডিপার্টমেণ্টের অন্যান্য সবাই খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। সাহেব অসুস্থ। একটা কিছু করা দরকার। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লুম। ঘরও খালি নেই। দু'চারজন সিনিয়ার অফিসার খবর শুনেই ছুটে এসেছেন। একজন দেখলুম প্রাণপণে টেলিফোন করার চেষ্টা করছেন। কোথায় করতে চাইছেন বোঝা গেল না।

মনোরঞ্জন বিন বিন করে ঘামছে। ওর ঘরে একটা কুলার লাগান ছিল। কে যেন বলেছিল কুলার শরীরের পক্ষে খারাপ। মনোরঞ্জন সেই কথা শুনে পরের দিনই কুলারটা খুলিয়ে ঘরে পাখার ব্যবস্থা করেছিল। মনোরঞ্জনের চোখ আধ-খোলা। মুখের দিকে তাকিয়ে

মনে হল, বেশ কষ্ট হচ্ছে। হয় শ্বাস নিতে, না হয় শ্বাস ছাড়তে? সারা মুখটা কেমন কালচে হয়ে উঠেছে। কোম্পানীর ডাক্তার এসে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'অবিলম্বে নার্সিং হোমে ট্রানসফার করুন। আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না।'

আমি মনোরঞ্জনের মুখের খুব কাছাকাছি এসে জিগ্যেস করলুম,—কি শরীরটা খুব খারাপ লাগছে নাকি তোমার?

এ প্রশ্ন করার অবশ্য কোনো মানে হয় না। প্রশ্নের জন্যেই প্রশ্ন। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, লোকটা ক্রমশই এলিয়ে পড়ছে। ডাক্তার একটু মৃদু ধমক দিলেন,

—কেন অনর্থক ভিড় করছেন আপনারা? এঁকে এখুনি নার্সিংহোমে রিমূভ করুন আপনারা।

এতক্ষণ যে ভদ্রলোক টেলিফোনে কসরত করছিলেন, তিনি ফোন নামিয়ে খুব গম্ভীর গলায় বললেন,

—নাঃ ওঁর স্ত্রীকে পাওয়া গেল না। স্কুলে নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছেন। আমি মেসেজ রেখে দিয়েছি। এলেই পেয়ে যাবেন।

হঠাৎ আমার মনে হল, মনোরঞ্জন যদিও আমার বন্ধু, আমার কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তার জন্যে কিছুই করার নেই। প্রথমত, ঘরে ভিড় না করাই ভাল। দ্বিতীয়ত, কেউ না কেউ তাকে এখনই ষ্ট্রেচারে চাপিয়ে, অ্যামবুলেন্সে করে, কোম্পানীর বিরাট নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে। তারপর সেখানে যমে মানুষে খেলা চলবে? এমন কি, এই মুহূর্তে মনোরঞ্জনেরও কিছু করার নেই। ওই চেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে রাখা ছাড়া ওর পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে, চেয়ারে আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সোজা ওই নোংরা কার্পেটেই নেমে আসবে? দামী স্যুটফুটের মায়া ছেড়ে? অথচ আমি জানি ওর মত শৌখীন খুঁতখুঁতে লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

বহুক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাওয়া যায়। মনোরঞ্জন অসুস্থ বলে

পৃথিবীর সব কাজ তো আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। এই তো এত বড় অফিস, মনোরঞ্জনের পজিসানও তো কিছু কম নয়, চিফ অ্যাকাউনটেণ্ট বলে কথা। অফিসের সকলেরই টিকি বাঁধা তার কাছে। কিন্তু ক'জন সহকর্মী এসেছেন এই ভীষণ মুহূর্তে: মনোরঞ্জনের দেহের ওপর এই যে জীবন মৃত্যুর খেলা চলেছে, তাতে কার কি এসে যাচ্ছে? তার বউই বা কি করছে এই মুহূর্তে? কে বলতে পারে। বিলেত ফেরত আধুনিক মেয়ে। ববছাঁট চুল। একটা কিণ্ডারগার্ডেন স্কুল চালায়। সাহেব পাড়ায়। কোথায় কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে আছে পার্কস্ট্রীটে। সঙ্গে কে আছে তাই বা কে জানে? এদিকে স্বামী যায় যায়। অনিমেষ ফোন করছিল ভদ্রমহিলাকে দুঃসংবাদটা দেবার জন্যে। অনিমেষের চালচলন কি খুব একটা স্বাভাবিক ছিল। ছিল না। যেন একটু বেশিমাত্রায় গম্ভীর। একটু লোক দেখানোর ভাব ছিল। আসলে মনোরঞ্জন যদি মারা যায়, এই অফিসে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে অনিমেষ। চট্ করে দু'বছরের মধ্যেই চিফ অ্যাকাউনটেণ্ট হয়ে বসবে। মনোরঞ্জনের বয়েস এমন কিছু বেশি নয়। চাকরিও খুব বেশি দিনের নয়। একবারেই টপে এসে বসেছে। সাধারণভাবে রিটায়ার করতে, কি ফিনানসিয়াল কনট্রোলারের পোস্টে প্রোমোসান পেতে বেশ সময় লাগত। ততদিন অনিমেষকে হা-পিত্যেশ করে করে বসে থাকতে হত। স্কুটারের পেছনে ইয়া স্বাস্থ্য, সেই পাঞ্জাবী বউকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে যেত! এখন গাড়ি কিনবে। স্ট্যাটাস আরো বাড়বে। বউকে আরো সুখে রাখতে পারবে। চেহারার জলুস আরো খুলবে। ত্বক আরো টানটান হবে। নির্ঝঞ্ঝাটে বংশ বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ একজনের মৃত্যু আর একজনের অসীম সুখের কারণ হবে।

স্ট্রেচার এসে গেল।

সাদা ধবধবে। তার মানে অ্যামবুলেনস এসে দাঁড়িয়েছে অফিসের সামনে। ঘষা কাঁচের দরজাটা একজন দু'হাতে ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল। স্ট্রেচার ঢুকবে বেরোবে। মনোরঞ্জন শুয়ে আছে স্ট্রেচারে।

ঘাড়টা একদিকে কাত হয়ে আছে। হাত দুটো দেহের দু'পাশে ছড়ান। অনেক আগে। আমি যখন যোগাসন করতুম তখন এইভাবে শবাসনে শব হতুম। ষ্ট্রেচারের পেছন পেছন অনিমেষ ও আরো কয়েকজন এগিয়ে চলল। বোধহয় নার্সিংহোম পর্যন্ত যাবে। ওদের মধ্যে একজনকে আমি জানি যার কাছ থেকে মনোরঞ্জন অনেক টাকা পাবে? মেয়ের বিয়ের সময় ধার করেছিল দু'তিন বছর আগে।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

একেবারে শেষ করে, টুকরোটা টুসকি মেরে চারতলা থেকে নিচের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিচে নামব। মনোরঞ্জনের ব্যাপারে আপাতত আমার আর কোনো ভূমিকা নেই। অনেক উপকারী জুটে গেছে। ভীড় বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং সময় নষ্ট না করে হাতের কাজ সেরে ফেলাই ভাল। মনোরঞ্জন অর নো মনোরঞ্জন ডেসপ্যাচ ডককুমেণ্টগুলো আজই সব তৈরি করে ফেলতে হবে নয়তো কাল আর কোনো মাল শিপিং হবে না। কোম্পানীর ক্ষতি হবে। বড় কর্তা কৈফিয়ত চাইবেন। ইন এফিসিয়েনসির কোনো ক্ষমা নেই। বছরের শেষে ইনক্রিমেণ্ট কমে গেলে কার ক্ষতি হবে! কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই পা চলতে শুরু করল।

প্রায় দেড়টা বাজতে চলল।

তার মানে লাঞ্চব্রেক। লাঞ্চের আগে আর কাজে হাত দিয়ে লাভ নেই। মনোরঞ্জনের অসহায় চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে। ঘাড়টা একদিকে কাত হয়ে নড়নড় নড়ছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক। সারা মুখে কে যেন আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। হার্ট সম্বন্ধে বেশ হুঁশিয়ার হবে। বলা যায় না, কখন কি হয়? বেশি দুশ্চিন্তা করা চলবে না। খাওয়া-দাওয়ায় ফ্যাটের অংশ কমাতে হবে। আরও বেশি কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। কোনোটাই খুব শক্ত নয়। তবু মানছে কে?

অমল এসে সামনে দাঁড়াল।

কি দাদা চলুন, লাঞ্চে যাই। কি ভাবছেন অত?

—চলো যাই। না, তেমন কিছু ভাবছি না। হার্টের অসুখ খুব হচ্ছে ; ছেলে বুড়ো কাউকেই বাদ দিচ্ছে না।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালুম। ক্যান্টিন ফাস্ট ফ্লোরে।

—চক্রবর্তী সাহেব আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই কারণেই আপনাকে বোধহয় এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

লিফ্‌টে নামতে নামতে অমল এই একটা কথাই বলতে পারল। মনোরঞ্জন আমার বন্ধু ছিল ঠিকই, তবে সে অনেক আগে ছাত্র জীবনে। বড়লোকের ছেলে। ছাত্রদের তো কোনো জাত থাকে না, তাই তখন মেলামেশায় কোনো বাধা ছিল না। চাকরি জীবনে সে আমার দু' তিন ধাপ উঁচুতে, প্রায় ডিরেক্টারদের কাছাকাছি। অফিসে আমরা একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলতুম ; কারণ সেইটাই ছিল শোভনীয়।

ক্যানটিনে লাঞ্চের সময় সকলকেই প্রায় পাওয়া যায়। রথী-মহারথী থেকে, চুনোপুঁটি সবাই। কাঁটা, চামচ, ছুরি প্লেটে প্লেটে নাচতে থাকে। টেবিলের কানায় কানায় রঙ বেরঙের টাই দুলছে। হাতে হাতে পাট করা রুমাল মাঝে মাঝে আলতো আলগোছে ঠোঁট থেকে লালা কিংবা সসের উদ্বৃত অংশ মুছে নিচ্ছে। ইংরেজী আর বাংলার ফুটফাট খই ফুটছে।

ওই কোণে জানালার ধারে, জোড়া টেবিলে মনোরঞ্জনের স্টেনো হেসে হেসে সান্যালের সঙ্গে খুব গল্প করছেন। ভদ্রমহিলা আজকাল সান্যালের সঙ্গে খুবই যেন মাখোমাখো হয়ে উঠেছেন। অফিসে এই একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে গেল, আজকের দিনটা অন্তত হাসাহাসি না করলেই ভাল হত। যতই হোক মনোরঞ্জন ছিল 'ইমিজিয়েট বস।' জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে একটা মানুষের টানাপোড়েন চলছে আর ওরা সামনে মুরগীর ঠ্যাং রেখে রঙ্গ রসিকতা করছে ! মানুষ সত্যি অত্যাশ্চর্য জীব ! সমাজে বাস করতে হলে অনেক সময় একটু আধটু মুখোস পরে চলতে হয়।

হাসাহাসি করতে করতে এক সময় আমার দিকে চোখ পড়তেই একটু

যেন গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ দেখি চেয়ার ছেড়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কি হল আবার? দেবী কি আমায় ভর করবেন। মনে হচ্ছে সেই রকমই। আগে আগে ভেসে আসছে বেশ দামী সেন্টের গন্ধ। সামনের চেয়ারে বসে মিস ঘোষ বললেন,

—আপনাকে একটা কথা জানাতে এলুম।

—বলুন কি কথা?

—সকাল থেকে দেখলাম অনেককেই খবর দেবার চেষ্টা হল ঃ কিন্তু ওঁর বাবাকে একবার খবর দিলে হত না? বৃদ্ধ মানুষ আর ওই একমাত্র ছেলে!

—কিন্তু, আমি যতদূর জানি, দু'জনেরই দীর্ঘ দিনের ছাড়াছাড়ি। কি একটা ব্যাপারে পিতাপুত্রে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। সে ক্ষেত্রে…

—তাতে কি হয়েছে? ছেলের অসুস্থতার খবর বাবাকে জানাতে হবে না?

—এসব বিলিতি প্রতিষ্ঠান। বউ ছাড়া আমাদের আর কেউ থাকতে পারে, তা এঁরা মনে করেন না।

—প্রতিষ্ঠান যাই মনে করুক, আপনারা কি মনে করেন?

—এখানে আমার একলার মত খাটান উচিত হবে কি?

—দেখুন আমার যা মনে হল আপনাকে জানালাম। বন্ধু হিসেবে আপনার যদি কিছু করার থাকে করবেন।

মিস ঘোষ যেন একটু রেগেই চলে গেলেন। ভদ্রমহিলার চেহারায় বেশ একটা বাঁধুনী আছে। স্পিরিটেড, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হাসলেও ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে ভাবনা চলেছে।

বিয়ের পরই মনোরঞ্জন বাড়ি ছাড়া। পদ্মপুকুরের অত বড় বাড়ি ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে কোম্পানীর দেওয়া কোয়ার্টারেই থাকে। ব্যাপারটা ভাবতেও কেমন লাগে; কিন্তু এইটাইতো জীবনের সত্য, যেমন সত্য মনোরঞ্জনের হঠাৎ অসুস্থ হওয়া। থাক্‌গে। কে এখন মনোরঞ্জনের বাবাকে খবর দেবে।

তিনটে নাগাদ অনিমেষ নার্সিংহোম থেকে ফিরে এল। ফিরে এসেই সোজা ডিরেকটারের ঘরে ঢুকে গেল। কানাঘুষোয় শুনলুম, মনোরঞ্জনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। সেরিব্র্যাল অ্যাটাক। ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন, বাঁচলেও, একটা দিক হয়তো পঙ্গু হয়ে যাবে।

বিকেলের চা খেতে খেতে বিস্তারিত সব শুনলুম। কিন্তু ব্যাপারটা মনোরঞ্জনের এতই ব্যক্তিগত যে মনে সামান্য রেখাপাত করেই সরে গেল। আমি হঠাৎ নিউমার্কেটের কথা ভাবতে শুরু করলুম। ছুটির পর কিছু কেনাকাটার জন্যে সুলেখাকে আসতে বলেছি। প্যারালিসিস বড় বিশ্রী ব্যাপার। ভয়ানক পরনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। চা খেলে হার্টের কিছু হয় না তো! বড়বাবু ফাইল সই করাতে এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলুম। বললেন,

—না না চায়ে স্যার কফিন আছে। হার্টের পক্ষে বরং ভালই।

কথাটা শুনে খুশি হয়ে সই করে দিলুম। অন্য সময় হলে ভদ্রলোককে একটু ন্যাজে খেলাতুম। নিজের পার্টিকে এত টাকার একটা কাজ দিচ্ছেন! মেয়ের বিয়ে দেবেন সামনের মাসে। টাকার দরকার। মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ ভালই। একবার কি একটা ফাংসানে পরিচয় হয়েছিল। ভাল লেগেছিল। ফাইলটা সই করাবার সময় মেয়েটি তার সেই সিল্কের শাড়ি জড়ানো সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

চারটে নাগাদ পরেশ একটা অর্ডারের কপি নিয়ে ঘরে ঢুকল। অনিমেষ চিফ অ্যাকাউনটেন্ট হিসেবে কাজ চালাবে। অর্ডারটা পড়ে মনোরঞ্জনের ওপর ভীষণ রাগ হল। কে বলেছিল তাকে হঠাৎ অসুস্থ হতে! অফিস সেটআপের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎই এই ধরনের পরিবর্তন এলে মনের ব্যালেন্স ভেঙে পড়ে। এক ধরনের হিংসেতে মন পুড়ে যেতে থাকে। সেদিনের ছেলে অনিমেষ একটা হামবাগ চরিত্রহীনই বলা চলে. কেরিয়ারের তেজী ঘোড়ায় চেপে কেমন টগবগ দৌড়চ্ছে!

হঠাৎ মনে হল মনোরঞ্জনও একটা ঘোড়া। ওকে চাঙ্গা ক'রে তোলাটাই

যেন আমার একটা বাজি জেতা। তা না হলে রেসে একটা ঘোড়াই বাজিমাত করে বেরিয়ে যাবে। অনিমেষের সঙ্গে দৌড়বার ক্ষমতা একমাত্র মনোরঞ্জনেরই ছিল। মনোরঞ্জনকে দেখতে যাবার ভীষণ একটা তাগিদ ভেতর থেকে ঠেলতে লাগল। যে তাগিদ এই অর্ডারটা হাতে পাবার আগে আমার ছিল না। নিজের চোখে একবার দেখতে হবে, সে সারবে কি না! যেমন করেই হোক তাকে সারাতে হবে।

অনেকেই দেখলুম অনিমেষকে কনগ্র্যাচুলেশান জানাতে ছুটছে। কাপ কাপ কফি চলেছে। যেন একটা মহোৎসব? কারুর সর্বনাশ কারুর পৌষ মাস। যতই হোক বড় কর্তা। খারাপ লাগলেও একবার যেতে হল। এর মধ্যেই বেশ চিফ চিফ ভাব এসে গেছে। একটু লাজুক লাজুক হাসি? এতো সাময়িক পদোন্নতি ভাই। ঈশ্বর করুন, মনোরঞ্জন সুস্থ হয়ে এসে তার চেয়ার দখল করুক। কি যে বলেন? মনোরঞ্জন জন্মের মত ফিনিশ। এ চেয়ার আপনারই পাকা হবে। অ্যাণ্ড ইউ রিজার্ভ ইট। এ চেয়ার সুটেবল ফর দি ম্যান। না না এ ম্যান সুটেবল ফর দি চেয়ার। কনগ্র্যাচুলেশান মিস্টার তরফদার। এক কাপ কফি মেরে নিজের ঘরে। ফোনে সুলেখাকে জানিয়ে দিলুম, একবার নার্সিংহোমে যাব। আজ তোমার মার্কেটিং থাক।

রাস্তায় নেমেই পশ্চিম আকাশে চোখে পড়ল? বেশ সমারোহ করে সূর্য ডুবতে বসেছে। বিদায়ের সময়েও কত তোমার ঘটা! একটা ট্যাক্সি ছাড়া নার্সিংহোম যাওয়া যাবে না। অন্য কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। একটা ছুটো ট্যাকসি যাচ্ছে। সব ভর্তি। একটা ফাঁকা ছিল। মিটার-ফ্ল্যাগ লাগান। কিছুতেই থামল না। আধঘণ্টা নাচানাচি করে, মনোরঞ্জনকে দেখতে যাবার উৎসাহে ভাটা পড়ল। মনোরঞ্জনের চেয়ারে অনিমেষকে তেমন বেমানান লাগল না। চিফ অ্যাকাউন্টেনট হয়েছে হোক। আমার কি? আমি তো আর হতুম না। চেষ্টা করলেও হত না। আমার সে যোগ্যতা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে, গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে ফোর্টের দিকে যেতে

যেতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে! জীবন তখন কত সবুজ ছিল! চোখ কত নীল ছিল! সেই জীবনটাকে যদি আবার ফিরে পেতুম! এখন যেন একটা বকাটে ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছি! অপবিত্র একটা কিছুকে যেন বাহারী মোড়কে মুড়েছি।

এদিকে আমার উদ্দেশ্যই ছিল একটা বেঞ্চিতে দুদণ্ড বসে মনটাকে একটু জুড়িয়ে নেব। বড় জ্বলছে। আমার নিজের স্বপ্ন সব অন্যের জীবনে পূর্ণ হচ্ছে। মনোরঞ্জন বন্ধু ছিল। মাঝে মধ্যে আবদার করলে একটু-আধটু সুযোগ সুবিধে দিত। আমার খোঁটে নড়ে গেল। এখন অনিমেষের যারা পেটোয়া, তাদেরই বোলবোলা চলবে। এই হয়। কিং ইজ ডেড, লং লিভ দি কিং।

ওয়াটার গেটের কাছাকাছি এসে দেখলুম একটা ক্রিমরঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের সিটে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। ববচুল। পেছন থেকে দেখলেও চেনা চেনা মনে হল। গাড়িটার দিকে আর একটু এগোলুম ফিগারটা এবার স্পষ্ট হল। একটু অবাকই হলুম। মনোরঞ্জনের স্ত্রীকে এখন এখানে দেখব, স্বপ্নেও ভাবিনি। দু'একবার পার্টিতে দেখেছি। চিনতে ভুল হয় নি। কাছে এগিয়ে গেলুম।

—মিসেস চক্রবর্তী আপনি?

ভদ্রমহিলা প্রথমে এমনভাবে তাকালেন, যেন দেখেও দেখছেন না। পরে চিনতে পারলেন। তখন আমি বললুম,

—শুনেছেন তো, মনোরঞ্জন?

—হ্যাঁ, দেখেও এলুম।

—এখানে একা একা মন খারাপ করে কি করবেন? মানুষের তো কোনো হাত নেই।

—না না মন খারাপের কি আছে? অসুখ বিসুখ তো মানুষকে তাড়া করবেই। পৃথিবীতে বাঁচা মানেই সব রকমের সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত থাকা।

—তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কি একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে? মনটাকে একটু ফ্রেশ করে নেবার জন্যে।

—না না, ফ্রেশ ট্রেশ নয়। আমার কি এত সময় আছে? আটকে পড়েছি। আমার এখন দুটো সমস্যা। প্রথম সমস্যা, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। সঙ্গে আমার স্কুলের একটি ছেলে ছিল। তাকে পাঠিয়েছি, কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে এ এবিতে একটা ফোন করার জন্যে। দ্বিতীয় সমস্যা হল, বাড়ি ফেরার সমস্যা। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের দুটো চাবি। একটা থাকত আমার কাছে আর একটা থাকত ওর কাছে। আমার চাবিটা আমি সকালে কোথায় হারিয়েছি। ওর চাবিটাও কোনো হদিস পাচ্ছি না। ব্যাগে নেই, পকেটে নেই। ও তো কথা বলতে পারছে না। জিগ্যেস করেও উত্তর পাব না। আমাকে একেবারে হেল্পলেস করে দিয়েছে। সারারাত কি যে হবে?

—একটা ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ত মুশকিল।

—এই ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন!

—চলুন দেখি কি করা যায়?

—একটু অপেক্ষা করুন গাড়িটা ঠিক হয়ে যাক, তা না হলে যাবেন কি করে? এমন মুশকিলে ফেলল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে।

—আমি তো নার্সিংহোমেই যাচ্ছিলুম ট্যাকসি পেলুম না বলে যাওয়া হল না।

—ওখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু শুধু উত্যক্ত করা। এখন যা করার ডাক্তাররাই করবেন। ওর আত্মীয় স্বজনেরা এসে এখন লোক দেখান উহু, আহা করে পরিবেশটাকে এমন গ্রাম্য করে তুলেছেন, নিজের পরিচয় দিতেও লজ্জা করে। আমি তাই চলে এলাম। ধৈর্যই হল সবচেয়ে বড় কথা।

কথায় কথায় পশ্চিমের আলো দপ করে নিবে গেল। আকাশের নিচে ছায়া ছায়া অনেক মানুষ জলের কিনারা ঘেঁষে বসেছে। সবুজ মাঠের এখানে ওখানে ওই রকম সব ছায়া ছায়া জটলা। আমার সামনে

এখন তিনটে সমস্যা ; গাড়িটা ঠিক হবে। ঠিক হলে মিসেস চক্রবর্তীকে একটু হেল্প করতে হবে। তারপর সেই ছুটো হারানো চাবির বিকল্প আর একটা চাবির ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে অ্যাপার্টমেণ্টে ঢোকা যাবে না। আর ঢুকতে না পারলে ভদ্রতার খাতিরে আমিও বাড়ি ফিরতে পারব না ; এই সব ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হল। মনে হল কত যুগ যেন অপেক্ষা করে আছি ; ইঁদুরের মত কলে আটক হয়ে পড়েছি। কখন যে মুক্তি পাব কে জানে! পুরো ব্যাপারটার মধ্যে নিজের কোনো স্বার্থ যদি জড়িয়ে থাকত তাহলে হয়তো এতটা খারাপ লাগত না।

ঠিক এই সময় মিসেস চক্রবর্তী গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় ডান পা রেখে নামতে চাইলেন। একটা সুডৌল পা বেরিয়ে পড়ল শাড়ির আড়াল থেকে। সিল্কের কাপড়ের আঁচল খসে পড়ল কোলে। একবার মাত্র তাকিয়ে দেখলুম ; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, গাড়িতে পেছন ঠেকিয়ে অনির্দিষ্ট কাল দাঁড়িয়ে থাকাটা বোধহয় তেমন কষ্টকর নয়।

কাঁটায় কাঁটায়

প্রায় তিন মাস হয়ে গেল আমার জ্যাঠামশাই মারা গেছেন। সেদিন অক্ষয়বাবু এসে জ্যাঠামশাইয়ের একটা ছবি বেশ বড় করে, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছেন। ছবিটা জ্যাঠাইমার ছবির পাশে ঝোলানো হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের মুখে সেই সুন্দর হাসি, যে-হাসি হেসে তিনি আমাকে বলতেন, 'পিণ্টুবাবু আজ অমন মুখভার কেন? কেউ কিছু বলেছে! কিসের দুঃখ তোমার! গরম রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। হয়েছে যখন এখুনি ব্যবস্থা হচ্ছে। গোটাকুড়ি টপাটপ গালে ফেলে দাও। মনে ফুর্তি দেহে বল।' জ্যাঠামশাই অমনি মণি, মণি বলে হাঁকডাক শুরু করতেন। সব কাজ ফেলে ছুটে আসত মণি। মণি খুব মজার ছেলে। সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে করতে বড় হয়েছে। এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই। নেই বলেই যেন তার আনন্দ। কথায় কথায় বলে 'কেউ নেই বলেই আমার সবাই আছে।' মণি ডাক শুনে ছুটে এসে বলত, 'ফরমাইয়ে বড়বাবু।' জ্যাঠামশাই অমনি বলতেন, 'রসগুললা লে আও, গরমাগরম। কড়াসে উতারকে।'

'কিতনা?'

'চাল্লিশঠো।'

'যো হুকুম।'

মণি অমনি ছুটলো মোড়ের দোকানে। বিশাল দোকান। গোলগাল পরেশদা সেই দোকানে বসে আছেন, ছানার মতো গায়ের রঙ। জ্যাঠা-মশাই বলতেন, 'পরেশ ঈশ্বরের অংশ। অমৃত বিতরণের পুণ্য কাজ নিয়ে সে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। এইটাই ওর শেষ জন্ম। ছানার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে।'

নির্জন এই দুপুরে জ্যাঠামশাইয়ের ছবির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয়, আমিই কারণ। আমার জন্যেই মারা গেলেন আমার দেবতার মতো জ্যাঠামশাই। বাবার বকুনি খেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে না গেলে আমার জ্যাঠামশাই অমন করে খুঁজতে বেরোতেন না হাসপাতালে। ভেবেছিলেন আমি হয়তো গাড়ি চাপাই পড়েছি। কল্পনার চোখে দেখতে পাই, অন্ধকার রাত। সারা শহরে পুটপুট আলো, ধুলো, ধোঁয়া। রাস্তায় এলোমেলো গাড়ি। গাড়ির পর গাড়ি। জ্যাঠামশাই মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে যেই রাস্তা পার হতে গেলেন একটা সাদা গাড়ি হুস করে এসে দেহটাকে পিষে দিয়ে চলে গেল। আমিই দায়ী। আমি, আমি, আমি। আমি একটা মহা শয়তান, গাধা। অলস, অকর্মণ্য। গবেট। আমার বাবা ঠিকই বলেছেন—একমাত্র ছেলে। ছেলেটাকে খরচের খাতায় লিখে রাখো। খাইয়ে-দাইয়ে মোষের মতো একটা শরীর তৈরি করে দাও। ওই ঠেলা ঠেলে, মোট বয়ে দিন চালাবে। ওই হয়, ভদ্র, শিক্ষিতের ঘরেই ছাগল জন্মায়। যাদের কোনও অভাব নেই, তাদের ঘরের ছেলেরাই হয় অমানুষ। ফুটপাথের ছেলেরা মানুষ হতে পারে, বড় হতে পারে সুযোগ পেলে। আদুরে ছেলেরা স্বার্থপর বাঁদরই হয়। না চাইতেই সব পেয়ে যায় তো। ছেলেদের বেশ দুঃখকষ্টে রাখতে হয়, তবেই মানুষ হয়। জীবনটাকে বুঝতে শেখে। জীবনটাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে শেখে। স্বার্থপর জানোয়ার হয়ে যায় না। আমিই দায়ী। আমিই সব কারণের মূল কারণ। আমার জ্যাঠামশাই আরও কত বড় হতে পারতেন। বৃদ্ধ। একমাথা চুল ঘাড়ের কাছে লুটোপুটি করত। সাদা তুষারের মতো। আরামচেয়ারে আলোয়ান গায়ে বসে থাকতেন। আমি তখন অনেক বড়। জ্যাঠামশাই যেমন চেয়েছিলেন, আমি সেইরকমই হতুম। তিনবার বিলেত ফেরত। বিশাল বড় ডাক্তার। জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের কাছে ছোট ছেলেটির মতো বসে লণ্ডনের গল্প বলতুম। সব শেষ করে দিয়েছি আমি। সব স্বপ্ন চুরমার। আমি

ঠিক করে ফেলেছি, নিজেকে মেরেই ফেলব। মরলে আমি আমার সবচেয়ে প্রাণের মানুষের দেখা পাব। ভগবান যখন স্বর্গের দরজা খুলে দেবে তখন দেখব স্বর্গের বাগানে, গাছের তলায় আমার জ্যাঠামশাই বসে আছেন। ওই ছবির হাসি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। স্বর্গে গেলে শুনেছি মানুষের গায়ের রঙ সোনার মতো হয়ে যায়। চুলগুলো হয়ে যায় রুপোর মতো। চোখদুটো জ্বলজ্বল করে রুবির মতো।

দুপুরবেলা সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বাবা অফিসে। মা একটু শুয়েছেন। জ্যাঠামশাইয়ের ছবিটা প্রতিদিন এই সময়ে যেন কথা বলে। জ্যাঠামশাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে চান—পিন্টু, মানুষের নিয়তি বলে একটা জিনিস আছে। তার হাত থেকে মানুষের নিস্কৃতি নেই। কেউ কারোর ভালো-মন্দের জন্য দায়ী নয়। যা হবার তা হবেই। তোমার মনে নেই, তোমার জ্যাঠাইমার মৃত্যুর কথা। তুমি তখন ছোট। আমরা সবাই কালীঘাটের মন্দিরে গিয়েছিলুম পুজো দিতে। প্রণাম সেরে তোমার জ্যাঠাইমা নেমে আসবেন হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাগলি এসে এমন এক ধাক্কা মারল, ছিটকে পড়ে গেলেন তোমার জ্যাঠাইমা। এক মিনিটে সব শেষ। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী পিন্টু! কেউ নয়। এই হলো নিয়তি। দিন ফুরোয়। আমরা জানতে পারি না। আমাদের জানার ক্ষমতা নেই। কেউ আগে যায়, কেউ পরে যায়। কোনও ব্যাপারেই আমাদের কোনও হাত নেই। আমরা এসেছি—আমাদের চলতে হবে। আমাদের ওপর দিয়ে কাল চলে যাবে স্রোতের মতো। মনে হবে, আমরাই চলছি। প্রতিদিন ভেসে আসবে ঘটনার পর ঘটনা। কখনও হাসব, কখনও কাঁদব। সাফল্যের আনন্দে দু'হাত তুলে নাচব। ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়ব। একদিন মুছে যাবে আমার অস্তিত্ব। কাল কিন্তু থামবে না। মহাকাল থামতে জানে না। পিন্টু, সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখ। নদীর স্রোতে খুঁটির মতো। দুর্বল হয়ে পড়বে না। কাপুরুষ হবে না। কাপুরুষ মরার আগেই বহুবার মরে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হলো। চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশু। বিশু নেহরু পুরস্কার পেয়ে রাশিয়া গিয়েছিল। আমার খুব হিংসে হয়েছিল। বিশু আমার সহপাঠী। বিশু যা পারে আমি তা পারি না কেন! এই বিশুর জন্যেই আমার বড় হেনস্তা। উঠতে বসতে আমাকে শুনতে হয় বিশুকে দেখে শেখ। সোনার চাঁদ, হীরের টুকরো। সেই বিশু। বিশু কি আমাকে বড় বড় গল্প শোনাতে এসেছে! বিশু এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত রাখল। আমার পিঠটা যেন জ্বলে গেল। তুমি ভালো ছেলে, তুমি ফার্স্ট বয়, তুমি তোমার মতো থাক। আমি অপদার্থ, গবেট। আমি আমার মতো থাকি। পিঠ থেকে এক ঝটকায় বিশুর হাতটা সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল।

বিশু দেখি কাঁদছে: বিশুর দু'চোখে জল।

'কাঁদছিস কেন বিশু?'

দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বিশু বললে, 'জ্যাঠামশাইয়ের কথা মনে পড়ছে ভাই। ফিরে এসে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। আমাকে বলেছিলেন, তোমার মুখে কত গল্প শুনব। চাঁদের আলোয় ছাতে মাদুর পেতে গরম গরম ডাল-ফুলুরি খাব আর গল্প করব। সেই জ্যাঠামশাই আজ কোথায়!'

বিশু ঝরঝর করে কাঁদছে। জ্যাঠামশাই ছিলেন আমার জগৎ। সকালে উঠে জ্যাঠামশাইয়ের মুখ দেখে মনে করতুম ভোরের সূর্য দেখছি। সেই জ্যাঠামশাইকে বিশুও এত ভালোবাসে! বিশুকে আমিও ভালোবেসে ফেললুম। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে দু'জনে খানিক কেঁদে নিলুম। যত কাঁদি ততই যেন কান্না পায়। এক সময় আমাদের কান্না থামল। অঝোর বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশটা যেমন ঝকঝকে হয়ে যায়, আমাদের মনও সেই রকম পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিশু ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বললে, 'পিণ্টু, তুই আমাকে

তোর শত্রু ভাবিসনি। বিশ্বাস কর, আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি। প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হই, বল সেটা কি আমার দোষ! আমি পড়ে যাই। যা পড়ি কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না। যে কোনও অঙ্ক আমার কাছে জলের মতো সহজ। উত্তরটা আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কেন যে এমন হয় কিছুতেই আমি বুঝতে পারি না। পিন্টু, আমার কি মনে হয় জানিস, আমার তো কেউ কোথাও নেই। মামার বাড়িতে পড়ে আছি, তাই ভগবান আমাকে সাহায্য করেন। ছেলেটা যাতে হেরে না যায়। আমি রোজ ভগবানকে ডাকি। বলি, ভগবান, তুমি আমাকে একটু দেখো। আমার বাবা আর মাকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমি যদি নষ্ট হয়ে যাই, আমার বাবা আর মায়ের বদনাম হয়ে যাবে। সবাই বলবে, ছেলেটা মানুষ হলো না। আমার ভীষণ ইচ্ছে, ডাক্তার হব। বাবা আর মায়ের নামে একটা হাসপাতাল করব। বিনা পয়সায় সকলের চিকিৎসা করব। আমরা গরিব বলে আমার মা-বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। জানিস তো, আমার অসুখ করলে ওষুধ খাই না। কালী-বাড়িতে গিয়ে একটু চরণামৃত খেয়ে আসি। মা কালীকে বলি, বাঁচালে বাঁচব। মারলে মরব। আর দেখি ঠিক সেরে উঠেছি। কতবার মনে হয়, মরে যাবো, বেঁচে থেকে কি লাভ। পরক্ষণেই মনে হয়, কেন মরব, আমার মা আর বাবার নাম কে করবে। আমার মধ্যেই তো তাঁরা বেঁচে থাকবেন।

বিশুর কথায় আমার মনে বেশ বল এসে গেল। 'বিশু, কি করলে আমি তোর মতো হব?'

'আমি তো সেইজন্যেই এসেছি ভাই। তোকে আমি সাহায্য করব। তোকে আমার সত্যদার কাছে নিয়ে যাব। দেখবি কি সুন্দর পড়ান তিনি। সবাই কি অমন করে পড়াতে পারেন? সত্যদার কাছে গেলে মনে হবে দিন রাত পড়ি। মানুষের জীবন তো তেমন বড় নয়, অথচ পড়ার শেষ নেই। পিন্টু তোকে আমি তৈরি করেই ছাড়ব। যতদিন বাঁচব

দু'জনে বন্ধু থাকব। কেউ কারোকে ভুলব না। আয় জ্যাঠামশাইয়ের ছবির সামনে আমরা প্রতিজ্ঞা করি।'

বিশু চলে গেল। এ বাড়ির কেউই আর আমাকে তেমন দেখতে পারে না। আজকাল আমাকে আবার অপয়া বলতে আরম্ভ করেছে। আমি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বাড়িতে মৃত্যু ঢুকেছে। বাবা আমাকে আর পড়ান না। মা বললেই বলেন, 'পণ্ডশ্রম করতে রাজি নই। আমার সময়ের দাম আছে।' জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু বাবাকে বেশ ধাক্কা মেরে গেছে। দু'জনের খুব মিল ছিল তো। কেউ কারোকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। খাওয়া-দাওয়া, গান, গল্প। বাড়িতে বড় বড় গানের আসর বসত। জ্যাঠামশাই ছিলেন সমঝদার শ্রোতা। একটি নরম তুলতুলে কাশ্মিরী শাল ছিল আমার জ্যাঠামশাইয়ের। শীতকালে সেই শালটা গায়ে দিয়ে জ্যাঠামশাই গানের আসরে জমিয়ে বসতেন। পাশে টেনে নিতেন। কিছুক্ষণ পরেই আমি ঢুকে যেতুম সেই শালের তলায়। গায়ে গা লাগিয়ে আরাম করে গান শুনতুম। জ্যাঠামশাই ফিসফিস করে বলতেন, 'বাপি, শুনছ। তোমাকেও গান শিখতে হবে। একদিন তোমাকেও ওইরকম গাইতে হবে আসরে বসে। তোমার বাবা, কি সুন্দর বেহালা বাজায় দেখছ তো। আমাদের রক্তে সঙ্গীত আছে। একটু সাধনা করলেই হবে। একজন মানুষের সবকিছু শেখা উচিত, তা না হলে জীবনটা বড় একপেশে হয়ে যায়। খোলতাই হয় না তেমন।'

বিশু আমাকে বলেছিল, যখন খুব মন খারাপ হবে, তখন খুব লম্বা একটা হাঁটা দিবি। মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাবি মাইলের পর মাইল। মনে মনে একটু গান গাইতে পারিস গুনগুন করে। রবীন্দ্রনাথের গান। বড় গাছ দেখলে তার দিকে তাকাবি। গোড়া থেকে একেবারে মাথা পর্যন্ত, যেখানে আকাশ নেমে এসেছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে নীল হয়ে। ভাববার চেষ্টা করবি, কত বছর ধরে, কত ঝড়-ঝাপটা সামলে গাছটা একটু একটু করে তবেই না অত বড় হয়েছে। আগের কত [illegible]

দেখেছে ! আজকের কতজনকে দেখছে ! আগামী দিনের কত মানুষকে দেখবে ! একটা গাছ, বহুকালের কোনও পুরনো বাড়ি, গঙ্গার ধারের প্রাচীন ঘাট, দেবালয়, আমাদের বেঁচে থাকা শেখায়। অতীত নিয়ে, বর্তমান নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে। মানুষের আসা-যাওয়ার সাক্ষী হয়ে। পথও তাই। যেন সময়ের ফিতে। বিশু বলেছিল, পথে নামলে দেখবি, না চলে থাকা যায় না। চলছি তো চলছিই। পা রাখা মাত্রই টেনে নেয়। থেমে পড়লে কেমন যেন বেমানান লাগে। চলতে চলতে, অন্য মানুষ বলে, কি হলো, থামলে কেন ? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন ? পথের ব্যাকরণ হলো চলা। পথ হারে না, পথ হারিয়ে দেয়। পথ হারিয়ে যায়। পথ চলে যায় এক লক্ষ্য থেকে আর এক লক্ষ্যে। বিশু কি সুন্দর বলে। আমি পারি না। আমার মাথায় কোনও ভাবনা আসে না। একেবারে নিরেট ক্রিকেট বলের মতো। রাগ আর অভিমান ছাড়া আমার মাথায় কিছু নেই। আর দু'চোখ ভরা জল।

আমাদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে লম্বা একটা পথ এঁকেবেঁকে বহুদূর চলে গেছে। শুনেছি অনেক দূরে পথের শেষে একটা বাগানবাড়ি আছে। সেই বাড়িতে থাকতেন রানী ভবানী। সেখানে সোনার জগদ্ধাত্রী মূর্তি আছে। বাড়িটা নাকি ভূতের বাড়ি।

আজকাল বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কেউ আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না। কোথায় যাচ্ছিস ? কখন ফিরবি ? আমি নাকি খুনী। আমার জ্যাঠামশাইকে আমি বলতে গেলে খুনই করেছি। আমি শয়তান মানুষ হয়ে জন্মেছি। বেশ বলে সব যা মুখে আসে তাই। আমি আবার কোথাও চলে যেতুম। শুধু জ্যাঠামশাই আমাকে বেঁধে রেখে গেছেন। আমাকে প্রমাণ করতে হবে—আমি শয়তান নই, ভগবান। আমি অপয়া নই, পয়া।

যে রবীন্দ্রসঙ্গীতটা আমার ভীষণ ভালো লাগে, সেটা হলো, বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে, এখন ফেরাবে তারে কিসের ছলে। গানটা গাইছি আর হনহন করে হাঁটছি। বিকেলের তবকমোড়া আলোয় চারপাশ

ভারি সুন্দর। বিশাল সবুজ মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। একটা বাড়ির সামনের বাগানে ফুলের মতো একদল শিশু পাখির মতো কিচির-মিচির করছে। সামনেই একটা বড় চটকল। ছুটি হয়েছে। একদল কর্মী পাশ দিয়ে চলে গেল। শরীরে, চুলে জড়িয়ে আছে পাটের কেঁসো। সারাদিনের খাটুনির শেষে সবাই যেন টলতে টলতে ঘরে ফিরছে। গায়ে মেশিনের গন্ধ। আইসক্রিমওয়ালারা ফিরে চলেছে খালি গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে। গরমের দুপুর সব আইসক্রিম খেয়ে ফেলেছে।

পথের দিকে তাকিয়ে পথ চলেছি। রাস্তার পাথরের বেশ একটা মন কেমন করানো রঙ থাকে। ভারি বিষণ্ণ। কেবলই যেন বলতে থাকে, জীবন কঠিন কঠোর। কিন্তু সুন্দর। শুকনো, কিন্তু পবিত্র। ঝনঝনে। ঘিঞ্জি এলাকা শেষ হয়ে গেল। বিশাল বিশাল গাছের জটলা। তলায় ঘনছায়া তীর্থযাত্রীর মতো বসে আছে জটলা করে। গাছের ফাঁকে উঁকি মারছে গঙ্গার আকাশ। ভিজে ভিজে বাতাস। ধর্মের গন্ধ। পথটা ডানদিকে ঘুরে আবার সোজা হাঁটা দিয়েছে।

আপনমনে গান গাইতে গাইতে হাঁটছি। হঠাৎ কে যেন ডাকল 'পিন্টুদা।' ঠিক যেন বেলা শেষের পাখির মতো গলা। মিষ্টি। সুরেলা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এখানে কে আমাকে ডাকতে পারে। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তৃষা। তার বগলে ছোট্ট একটা কাপড়ের পুঁটলি। তৃষাকে দেখে মনটা আমার ধক করে উঠল। সেই ধারালো চকচকে পুতুলের মতো মুখ। বাঁশির মতো নাক। ঝিনুকের মতো গায়ের রঙ। পাতলা পেঁয়াজের খোসার মতো গায়ের চামড়া। পদ্মফুলের মতো চোখ। চামরের মতো একমাথা চুল। মুক্তোর মতো দাঁত। সেই তৃষা। এমন মেয়ে ইংরেজি গল্পের ছবিতে পাওয়া যায়। তৃষা কেমন করে এদেশের একটা গরিব পরিবারে এসে জন্মালো বলতে পারব না। তবে তৃষার রূপ দেখে অনেকেই চমকে যায়। তৃষাও নাকি আমারই মতো অপয়া। তৃষা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক বছরের

ব্যবধানে তার বাবা আর মা মারা গেছেন। গোটা সংসারটা ভেঙে চুরে খানখান। তৃষাকে কিন্তু তার একমাত্র ভাই ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। দু'জনে মিলে, সৎ পথে থেকে সংসার চালাবার চেষ্টা করেছে। ছোট একটা তেলেভাজার দোকান দিয়েছে। দোকানটা সাংঘাতিক জমে উঠেছে।

তৃষা একটা কমলালেবু রঙের স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে। আমার সামনে বড় বড় গাছের তলায় যেন একজন পরী দাঁড়িয়ে।

তৃষা বললে, 'অবাক হয়ে কি দেখছ?'

'তোমাকে। তোমাকে দেখলে আমার কান্না পায় তৃষা।'

'কান্না পায় কেন?'

'তুমি এত এত সুন্দর হলে তৃষা।'

তৃষা লজ্জায় মুখ নিচু করল।

'সত্যি তৃষা, ভগবান মনে হয় তোমাকে নিজের হাতে তৈরি করে ছিলেন।'

'তোমাকেও তাই। তোমাকে কত সুন্দর দেখতে জানো কি? ঠিক দেবতার মতো।'

এইবার আমার মাথা নিচু করার পালা। তৃষা আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে আলো পড়ে তৃষার চুল সিল্কের মতো চকচক করছে।

আমি বললুম, 'তৃষা. আমার বাইরেটা সুন্দর হতে পারে, ভেতরটা যা-তা। কুৎসিত।'

'নিজেকে নিজে চেনা যায় না পিণ্টুদা। আমি তোমাকে চিনে গেছি। পিণ্টুদা তোমার আংটিটা নেবে না? এই দেখ আমার আঙুলে জ্বলজ্বল করছে।'

বাড়ি ছেড়ে ধানবাদে যাবার দিন আংটিটা তৃষার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার জন্যে যখন চলেই যাচ্ছি তখন আংটি আর কি হবে! তৃষাকে ভীষণ ভালোবাসি, দেবার তো

আমার কিছু নেই, একমাত্র আংটিটা ছাড়া।

'আংটিটা তোমার আঙুলে থাক তৃষা।'

'জানো তো, মেয়েদের আঙুলে আংটি পরালে বিয়ে করা হয়। তুমি না জেনেই আমাকে বিয়ে করে বসে আছ। দেখি তোমার আঙুল।'

আমার অনামিকাটা তৃষার দিকে এগিয়ে দিতেই সে আমার আঙুলে আর একটা আংটি পরিয়ে দিল।

'তুমি কোথায় পেলে এত সুন্দর, এত দামী একটা আংটি।'

'ওটা আমার মায়ের ছিল। মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগে আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমাকে দিলে কেন?'

'আমাকে মনে রাখবে বলে। ধরো আমাদের বিয়েটা হয়েই রইল। তুমি জানলে, আমি জানলুম, সাক্ষী এই কৃষ্ণচূড়া গাছ।'

তৃষা হাসছে। পাতলা ছুরির মতো এক জোড়া ঠোঁট। তার ফাঁকে মুক্তোর মালার মতো এক সার দাঁত। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল তৃষাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে। বেশ কোনও এক পাহাড়ী জায়গায়, যেখানে আকাশের গায়ে পাহাড় লেগে থাকে। নদী বয়ে যায় টলটলে জলে নীলের ছায়া নিয়ে। যেখানে দুঃখ নেই কোনো। নেই মৃত্যু। সে তো অনেক পরের কথা।

চারটে মাস বাবা গুম মেরে ছিলেন। হলো না, কিছুই হলো না। পৃথিবী চার মাস এগিয়ে গেল। ছেলে-ঘোড়া এক পাও এগোল না। তার ওপর দুর্ঘটনায় জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু। গুমরে গুমরে ভেতরে ভেতরে বাবা পুড়ছিলেন। এই চার মাস আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। কাছে গেলে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত নেড়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিতেন, ভাগো ভাগো, ভেগে পড়। যেন আমি একটা নর্দমা, একটা নরক। আমি সরে আসতুম। বাবাকে ওই সময়টায় একজন বিশ্রী, একগুঁয়ে লোক বলে মনে হতো। মনে মনে বলতুম, ঠিক করছেন না আপনি। আপনি এত জ্ঞানী, আপনি একজন শিল্পী, সুন্দর

বেহালা বাজান, আর এইটুকু বোঝেন না। ঘৃণা, ঘৃণা হয়ে ফিরে আসে। কর্কশ ব্যবহার ফিরে আসে কর্কশতম ব্যবহার হয়ে। একটু আনন্দে থাকলে, সুখে থাকলে মানুষের ভালোই হয়। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। কি করা যাবে!

বাবা অফিস থেকে ফিরে এলেন। যা কখনও করেন না, তাই করলেন। কোনও রকমে গায়ের জামাটা মাত্র খুলতে পারলেন। শুয়ে পড়লেন বিছানায়। শুয়ে পড়লেন বললে ভুল হবে, টলে পড়ে গেলেন খাটের একপাশে। ডাক্তার ডেকে আনলুম সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমিই অপরাধী। মনে হচ্ছিল, সত্যই আমি খুনী! আমার জন্য গোটা সংসারে একটা কালো ছায়া নেমে এল। আমাকে সবাই ঠেলে ঠেলেই যেন অপরাধী করে দিল। আমার ভেতরটা ক্রমশ পাথরের মতো হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে বুকের সমস্ত নিঃশ্বাস জমে পাথর হয়ে গেছে। দুঃখ আর নেই। এখন যেন শুধু সহ্য করা। বিছানায় বাবা শুয়ে আছেন। চোখ দুটো স্থির অনড়। সমস্ত ভাব, ভাবনা যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে। সমস্ত কথা বন্ধ। ডাক্তার-বাবু মুখের ওপর বলে গেলেন—একে বলে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। ধরেই নিন লস্ট কেস। এইভাবে যদ্দিন থাকবেন ততদিন থাকবেন। সেবাই একমাত্র ওষুধ।

আমাদের বাড়িতে সেবার লোক কোথায়। মায়ের শরীর নড়বড়ে। একেই বলে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়া। বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম বহুক্ষণ। আমার চোখে তাঁর চোখ ঠেকে আছে। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে। মনে হয় কিছু বলার চেষ্টা করছেন। চার মাসের অনেক কথা জমে আছে। পুরো চারটে মাস আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। দুঃখে, অভিমানে। না বললেও বলার কথা তো অনেক ছিল। আমি তাঁর ছেলে। ছেলে বলেই তো রাগ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, আমি তাঁর গর্ব হয়ে উঠি। হতে পারিনি সে তো আমারই দোষ।

'তৃষা, আসল বিয়ের তো অনেক দেরি। সেই কবে আমার লেখাপড়া শেষ হবে! কবে আমি চাকরি করব, তারপর। ততদিনে কত বছর পার হয়ে যাবে! কত কি বদলে যাবে!'

'তুমি আর আমি না বদলালেই হলো। মানুষ কি খুব বদলায় পিণ্টুদা! যে যেমন সে তেমনই থাকে। তুমি শুধু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বড় হয়ে যাও। রোজ তোমার সঙ্গে একবার যেন দেখা হয়, আর আজকের কথা কেউ যেন না জানে। এ শুধু তোমার আর আমার জীবনের কথা। সিন্দুকে দলিলের মতো থাকবে। সময় এলে বের করে সকলকে দেখানো হবে।'

'ধরো দশ বছর পরে তুমি যদি পাল্‌টে যাও।'

'আমি পালটাব না। কেন জানো, তোমার মুখের ছাপ আমার ভিতরে বসে গেছে। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি তোমাকে। যেন দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি ক্লাসে। দেয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড। সেই বোর্ডের সামনে আবার তুমিই দাঁড়িয়ে আছ। তুমিই পড়াচ্ছ।'

'এর মানে কি?'

'মানে হলো, অভাবের জ্বালায় আমার লেখাপড়া তো তেমন হলো না, পরে তুমিই আমাকে পড়াবে। তাই বলছি, তোমার সব কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নাও। তুমি দেখে নিও, তোমার খুব ভালো হবে। তুমি খুব বড় হবে।'

'কি করে বুঝলে?'

'আজই আমাকে এক সাধু বলেছেন, তুমি রাজরানী হবে মা। আমাকে রানী হতে হলে তোমাকে রাজা হতে হবে। সাধু বললেন, ছেলেবেলায় যারা কষ্ট করে, বড় হলে তারা সুখী হয়। আমার সুখ মানে তোমার সুখ। এখন বলো, তুমি এই পথে যাচ্ছ কোথায়?'

'তুমি বলো, তুমি আসছ কোথা থেকে।'

'সম্পর্কে আমার এক মাসী থাকেন ওই ওধারে শ্মশানের কাছে। মোটা-মুটি বড়লোক। তাঁরও মেয়ের জামাটামা ছোট হয়ে গেলে আমাকে

দিয়ে দেন। সেইসব আনতে । .াচ্ছিলম। এই দেখ না বগলে পোঁটলা বেঁধে নিয়ে চলেছি। এখন দিন . ক বেশ চলে যাবে। এই-ভাবেই চলে গেলে হলো। তারপর তো ভীষণ ভালো দিন আসবেই আসবে। আমি যাই। দাদা ওদিকে একা দোকান সামলাচ্ছে। মনে রেখ তুমি কিন্তু এখন আর একা নও। তোমার একটা তুমি আছে। সে হলুম আমি।'

তৃষা চলে গেল হনহন করে। পশ্চিম আ. . সূর্য চলেছে। সেই আলোতে তৃষাকে মনে হচ্ছে সোনার মূর্তি। মনে হচ্ছিল, আমিও ফিরে যাই ওর সঙ্গে। ভয় পেয়ে গেলুম। সবাই দেখবে। আমার বাড়িতেও পৌঁছে যাবে খবরটা। শুরু হয়ে যাবে ি ছি। ছি ছি-কে আমি আর ভয় পাই না। ভয় হয় তৃষাকে কেউ কিছু যেন না বলে। এমনিতেই অনেকে বলে, মেয়েছেলের সর্বনাশা রূপ ভালো নয়। আমাদের পাড়ার কিছু চরিত্রহীনের নজর তৃষার ওপর পড়েছে। আমি জানি। আমি শুনেছি তাদের কথা। ি শ্রী, অশ্লীল। ওদের গুলি করে মারা উচিত! ওরা জানোয়ার। তৃষার জন্যে আমার ভয় করে। ওকে একা একা ঘুরতে দেওয়া উচিত নয়। মানুষ এখন সব পারে।

আমি জানতুম এইরকম একটা কিছু হবে! ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ করে অসম্ভব ভাবলে ভবিষ্যৎ ভালো না হয়ে খারাপই হয়। ছেলে ছেলে করে আমার বাবার অসম্ভব ভাবনার ফল যে এইরকম হবে তা আমি জানতুন। আমি যেন রেসের ঘোড়া, আর আমার পিঠে জকির মতো আমার বাবা। আর আমার মা যেন ঘোড়ার মালিক। কাগজে যেমন ছবি বেরোয়। ঘোড়া রেসে জিতেছে। পিঠে জকি। লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ঘোড়ার মালিক। এক মহিলা। বব চুল। সিল্কের শাড়ি। মিসেস জালান। ঘোড়ার নাম লাকি প্রিনস। ছবি ছাপা হয়ে গেল।

বাবার চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কথা যেন নেমে এল জল হয়ে। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না মনে হচ্ছে আমার ভেতরটা ফেটে যাবে। বলার কথা না বলে আমার জীবন থেকে আমার প্রিয় মানুষটি চলে যাবেন! রাগ তো একদিন কমতই, তখন ভারি গলায় স্নেহ আর শাসন মিশিয়ে আমাকে ডাকতেন আবার, পিন্টু। কত আদরই তো পেয়েছি। আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে গেছি তখন তিনি প্রাণের বন্ধু। হাসি-গান-গল্প। আমরা ক্রিকেট খেলেছি। ব্যাডমিন্টন। দৌড়ের প্রতিযোগিতা। পাহাড়ে চড়া। নদীতে স্নান। কোমর ধরে সাঁতার শেখানো। আবার বেড়াতে বেড়াতেই পড়ানো। আমার জীবনটা খোঁড়া হয়ে গেল। আমার আর কেউই রইলেন না।

বিশু বলেছিল, মন চঞ্চল হলে, মাটির দিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলে দাঁড়িয়ে থাকবি। দেখবি ভালো লাগবে। বেশ একটা বল পাবি মনে। আমি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলুম ঘাসের দিকে তাকিয়ে। অনেক ভয়, তবু ভয় কিছুটা কমে এল। সংসার কে চালাবে! আমার লেখাপড়ার কি হবে! মা বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে আসছেন, চিকিৎসার একগাদা টাকা কে যোগাবে! ভয়ের শেষ নেই। ভাবলেই ভয়।

ঠিক সময়েই বিশু এসে গেল। বিশু চশমা নিয়েছে। ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে বিশুকে। বিশুর ডান হাতে পুরু ব্যাণ্ডেজ। আমার পিঠে হাত রেখে বললে, 'সব শুনেছি। ভাবিসনি আমি তোর পাশে আছি। সব সময় মনে রাখবি তোর আগেই আমার জীবনের ওপর দিয়ে এইসব চলে গেছে। আমাকে গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল আমার ভাগ্য। আমি কিন্তু ছাতু হয়ে যাইনি। শোন, এখন তোকে মন দিয়ে বাঁচতে হবে। যেটা সত্যদা আমাকে শিখিয়েছেন। তুই সত্যদার কাছে চল। কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে গেলে বাঁচার মতো বাঁচা যায়। দাপটে বাঁচা। মাথা তুলে বাঁচা। জীবনটাকে শক্ত করার

জন্যে যত দুর্ঘটনা আসে তুই আজই চল।

'তোর হাতে কি হয়েছে?'

'ও কিছু না।'

'আমি কিন্তু তোকে সব কথা বলি, তুই চেপে যাচ্ছিস।'

'তাহলে শোন, আমার বদরাগী মামা, মাইমাকে মারার জন্যে লাঠি তুলেছিল। মাইমাকে বাঁচাতে গিয়ে লাঠিটা সপাটে আমার হাতে। হাড়ে চিড় ধরেছে, তাই প্লাস্টার। ভদ্রলোকরা যখন ছোটলোক হয় তখন তাদের সামলানো যায় না। অনেকটা পেট খারাপের মতো। ছেড়ে দে ওসব কথা সত্যদার কাছে চল।' আকাশে মেঘ জমেছে। চিড়িক চিড়িক বিদ্যুতের রেখা পশ্চিমের আকাশে। অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। বৃষ্টি এল বলে। সত্যদার বাড়িতে ঢোকা মাত্রই বৃষ্টি নেমে গেল বড় বড় ফোঁটায়। বইয়ের পাহাড়ের মাঝখানে সামান্য একটু জায়গা বের করে সত্যদা বসে আছেন। ধুতি আর গেঞ্জি পরে সাধুর মতো স্নিগ্ধ চেহারা ফর্সা রঙ অসম্ভব সুন্দর একটা মুখ, কপালটা জ্বলজ্বল করছে। ওরই মধ্যে একটু জায়গা করে আমরা দু'জনে বসলুম। একটা ঘর নিয়ে সত্যদা একা থাকেন। ঘরের বাইরে ছোট্ট দালান, সেইখানেই রান্নার ব্যবস্থা। নিজেই রাঁধেন। সেই রান্নাই তখন চেপেছে।

সত্যদা বললেন, 'আজ আমার স্বপাকের দফারফা হলো। প্লাবনে সব ভেসে গেল।'

বিশু বললে, 'আমি গিয়ে হাতা ধরব?'

'কোনও দরকার নেই ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও। বরাতে খাওয়া থাকলে হবে, না থাকলে হবে না।' সত্যদা বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সোজা হয়ে বসো। এইটাই হলো প্রধান শর্ত। মেরুদণ্ড সোজা করে, স্ট্রেট হয়ে বসবে। কোনও মতেই সামনে ঝুঁকব না, কুঁজো হব না। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস মেরুদণ্ড দিয়েই চলাচল করে। সোজা খাড়া মেরুদণ্ডই হলো শৌর্য আর

বীর্য। মনে থাকে যেন

বিশু বলল, 'আজ ও খুব চঞ্চল মন নিয়ে এসেছে সত্যদা। বাবার সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিস। সংসারে আর কেউ নেই।'

'তার মানে ফ্রন্টলাইনে চলে এসেছে। এইবার সামনাসামনি লড়াই। তা ভয়টা কিসের। পৃথিবীর নিয়মই তো, হয় লড়ো, না হয় মরো। মরতে যখন আমরা কেউই চাই না, তখন লড়তে হবে। মনে আমরা কেউই কাপুরুষ নই। যা হবার তা হবেই। এরই মাঝে আমাদের বাঁচতে হবে। জীবনকে পিঠ দেখাব না। সারেণ্ডার নট।'

সত্যদা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ দুটো যেন সার্চলাইটের মতো। আমার ভেতরে যেন ঢুকে যাচ্ছেন সত্যদা। আমার ভেতরের সমস্ত ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন যেন। আমি যেন ক্রমশই তাঁর শক্তির মুঠোয় চলে যাচ্ছি।

সত্যদা বললেন, 'জীবনে আর অঙ্কে কোনও তফাৎ নেই পিণ্টু। অঙ্কের সমস্যার মতো জীবনের সমস্যারও সমাধান খুঁজতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। দেখ, যে যাই বলুক সাধারণ মানুষের জীবনের পেট্রোল হলো টাকা। টাকার হিসেবে তৈরি করতে হবে জীবন-পরিকল্পনা। বাবা অসুস্থ। এমন অসুখ, ভালো না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন তিনি চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে। তাঁর যে-রোজগার ছিল, সেই রোজগার থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে। তার মানে তোমাদের পেট্রোল কমে যাবে। এখন দেখতে হবে ট্যাঙ্কে কতটা পেট্রোল আছে। তার মানে সঞ্চয় কতটা আছে।'

'সত্যদা, আমি যে লেখাপড়া করব বলে এসেছি। এত হিসেব-নিকেশ কেন আসছে?'

'ধীরে বৎস ধীরে। আগে সংসার, আগে ভাত-ডাল খেয়ে বাঁচা। তারপর লেখাপড়া। এ-কালের লেখাপড়া বিনা পয়সায় হয় না। এক-এক সাবজেক্টের জন্যে এক-একজন শিক্ষক। যত উঁচুতে উঠতে চাইবে ততই খরচ। সে-রকম বুঝলে তোমাকে রোজগার আর লেখা-

পড়া চালাতে হবে একসঙ্গে।
'রোজগার! আমাকে কে চাকরি দেবে সত্যদা! চাকরবাকর হওয়া ছাড়া আমি আর কি কাজ করতে পারবো সত্যদা!'
'শোনো, সে ভাবনা আমার, আগে, তুমি তোমার বাড়ি সামলাও। তোমার মাথার ওপর এখন অনেক দায়িত্ব। বাবার চিকিৎসা। টাকা-পয়সার ব্যবস্থা। বাবার অফিসে গিয়ে বলা তাঁরা কিভাবে কি করবেন জানা দরকার। আমরা তোমার পেছনে আছি। প্রয়োজনে সামনেও যেতে পারি। তবে যতটা পার নিজেই সামলাও। যত ধাক্কা খাবে ততই শক্ত হবে। শক্ত পৃথিবীতে শক্ত মানুষেরই স্থান। দুঃখ থেকে আনন্দ খুঁজে নাও। সেইটাই জীবনের সাধনা। আমার দিকে তাকাও। বড় বড় চোখে। পলক ফেলো না।'
সত্যদার দিকে তাকালুম। সত্যদা আমার দিকে তাকালেন। চোখে চোখে ঠেকাঠেকি হয়ে গেল। কি যেন একটা শক্তির তরঙ্গ ধীরে ধীরে আমার ভেতর চলে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। যখন আবার আমি আমাতে ফিরে এলুম তখন বৃষ্টি থেমে আকাশে ফ্যাকাশে মতো একটা চাঁদ বেরিয়েছে। তলার দিকে দৈত্যের মতো একটা মেঘ ঝুলে আছে। ভিজে ভিজে বাতাস। গা শিরশির করছে।
সত্যদা আমাদের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ফিরে যাবার সময় বললেন, 'পিন্টু, আজ থেকে তুমি অন্য মানুষ হয়ে গেলে। তোমাতে আর আমাতে বয়েস ছাড়া কোনও পার্থক্য রইল না।'
বিশু বললে, 'ব্যাপারটা তুই বুঝতে পারলি?'
'না রে! কি একটা হলো; কিন্তু কি হলো আমার কোনও ধারণা নেই। তবে ভীষণ হালকা লাগছে, শোলার মতো। মনে কোনও ভয় নেই, চিন্তা নেই। অদ্ভুত লাগছে। কি ব্যাপার বল তো!'
'একে বলে কি জানিস, আমি বদল। তোর আমিটাকে তুলে নিয়ে সত্যদার আমিটাকে বসিয়ে দিয়েছেন। সত্যদার ইচ্ছেই তোর ইচ্ছা

বলে মনে হবে।'

'তার মানে আমি ক্রীতদাস হয়ে গেলুম।'

'না ক্রীতইচ্ছা, ক্রীতমন। ভয় পাচ্ছিস? ভয় নেই। দেখ না কি হয়! আমার কি খারাপ হয়েছে!'

রাস্তার যেখানে যেখানে বৃষ্টির জল জমেছে, সেখানে ছোট ছোট চাঁদের আলোর পুকুর তৈরি হয়েছে। যেন কেউ আয়না ভেঙে পথের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে। গোঁসাইদের বাড়ির পাঁচিলে মাধবীলতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। জল তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে হীরের নোলকের মতো।

বাবার শিয়রে মা বসে আছেন গালে হাত দিয়ে চুপ করে। আমি বাবার পায়ের দিকে বিছানার একপাশে বসলুম। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব মৃদু গলায় বললেন, 'এত রাত পর্যন্ত তুমি ছিলে কোথায়? এখনও শোধরাতে পারলে না নিজেকে!'

আমি চুপ করে রইলুম। মনে মনে হাসলুম। শক্রভাব এখনও গেল না।

মা বললেন, 'বড়ঠাকুর ছিলেন, এ-সংসারের লক্ষ্মী। তিনিও গেলেন, একে একে সব যেতে বসেছে। আমি এখন কি করি! আমার মাথার ওপর যে কেউ নেই!'

ফস্ করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কেন, ভগবান আছেন!'

মা বললেন, 'আগে ছিলেন এখন আর নেই।'

'ও, তোমার অভিমানের কথা। বিপদেরই ভগবান। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।'

'শুনে শুনে মানুষের মন পচে গেছে। ও-সব আমাকে আর শোনাতে এস না।'

'আবার বিশ্বাস।'

'ভগবানকে বিশ্বাস না করে নিজেকে বিশ্বাস করলে অনেক মঙ্গল হতো। সব কিছুর মূলে তুমি। তুমি যদি বাড়ি ছেড়ে না পালাতে....!

'তুমি আর পুরনো কাসুন্দি ঘেঁট না মা। যা হবার তা হয়ে গেছে। যা হচ্ছে, সেইটাকেই দু'জনে মিলে সামলাবার চেষ্টা করি এসো। তুমি তো বললে, নিজের ওপরও বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসেই কাজ হোক। প্রথম কথা বাবার সেবা আর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে! এইভাবে দু'জনে দু'মাথায় বসে কথা কাটাকাটি করলে তো কিছু হবে না। টাকা-পয়সা কোথায়, কেমন কি আছে বলো, সেই মতো ব্যবস্থা হবে।'

'টাকা-পয়সা না থাকলে ব্যবস্থা হবে না?'

'তুমি কিন্তু আবার বাঁকা দিকে চলে যাচ্ছ।'

'আমি বলতে চাইছি ছেলে হয়ে তোমার কর্তব্য নেই?'

'নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমি এখনও ছাত্র। আমার কোনও রোজগার নেই।'

'তুমি যখন বাড়ি থেকে পালাতে পেরেছিলে তখন তুমি রোজগারও নিশ্চয় করতে পারবে।'

'মা, আমি ইচ্ছে করে পালাইনি। আমি পালিয়েছিলুম, রাগে, দুঃখে, অপমানে। তোমরা আমাকে একদিনের জন্যেও ভালো কথা বলনি। উঠতে, বসতে, কেবল বকেছ, ধমকেছ। আমি সন্ন্যাসী হব বলে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। এখন দেখছি ফিরে না এলেই ভালো হতো। তোমাদের ছেলে মানুষ করার কোনও যোগ্যতা নেই। তোমরা লোভী, তোমরা স্বার্থপর, তোমরা হিংসুক, তোমরা অন্যের ভালো সহ্য করতে পারো না। তোমরা প্রতি কথায় বিস্তর উপমা দাও; কারণ বিশুর ভালো তোমরা সহ্য করতে পারো না। তুমি বেশ ভালোই জানো, বাবা আর ভালো হয়ে উঠবেন না, তোমাকে আর আমাকেই লড়াই করতে হবে। তুমি কিন্তু আমাকে সহ্য করতে পারো না। কেন পারো না সে তুমিই জানো।'

মা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করলেন। মায়ের কান্না দেখে আমার আনন্দই হলো। বহুদিন মা আমাকে কাঁদিয়ে এসেছেন। আজ মায়ের কান্নার দিন। মা যখন বাবাকে শান্ত করতে পারতেন, তখন

উল্টোটাই করেছেন। কিছু হলো না, কিছু হলো না বলে বাবাকে উত্তেজিত করেছেন। আর কেবলই বলতেন, জ্যাঠামশাইয়ের আদরে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। বড়ঠাকুর ছেলেটার মাথা খাচ্ছেন। এর ফলে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কে একটা চিড় ধরছিল। মা আমার জ্যাঠাইমাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ জ্যাঠাইমা ছিলেন মায়ের চেয়ে সুন্দরী ও শিক্ষিতা। এখন বুঝতে পারছি, কেন জ্যাঠা-মশাই আমাকে অমন উতলা হয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে খুঁজতে ছুটেছিলেন। তিনি জানতেন আমাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে সমস্ত দোষটা জ্যাঠামশাইয়ের ঘাড়ে এসে চাপত। এমনও হতে পারে, জ্যাঠামশাই গাড়ি চাপা পড়েননি, গাড়ির তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। আমার বাবা এই মাকে যে খুব একটা সহ্য করতে পারতেন, তা নয়। বেশির ভাগ সময় গম্ভীর হয়েই থাকতো। তবু আমার মা। আমার কর্তব্য মাকে সম্মান করা, ভক্তি করা।

॥ তিন ॥

বাবার সমস্ত কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বেশ অবাক হয়ে গেলুম। বাবা বেশ বড়লোক। চারদিকে অনেক টাকা জমে আছে। ব্যাঙ্কে, পোস্টাপিসে। খুব দুঃখ হলো—কিছুই ভোগ করতে পারলে না। সবই পড়ে থাকবে।

সত্যদা বললেন, 'তুমি কি ওই টাকা ভোগ করতে চাও? তাহলে তোমার জীবনটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি এই অনুপার্জিত টাকাটা ওড়াতে শিখবে। পাঁচটা বন্ধুবান্ধব এসে জুটবে। চরিত্রটা খোয়াবে। জানো তো বাঙালীর ধর্ম হলো, এক পুরুষ সঞ্চয় করে, আর এক পুরুষ এসে উড়িয়ে দেয়, তারপরের পুরুষ ভিক্ষে করে।'

'সত্যদা, আমার সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই। তাছাড়া ও টাকা আমার নয়। আমি ভিক্ষে করেই বড় হব। বড় হয়ে ভিক্ষে করতে চাই না। যা করব নিজের চেষ্টায় করব। অপরের সাহায্যের কোনও

প্রয়োজন নেই।'

'গুড। তোমার এই আত্মবিশ্বাসটাই আমি চেয়েছিলুম। মনে করো তোমার কিছুই নেই। তোমার তুমি ছাড়া কেউ নেই। জানো তো, পাখিকে কেউ উড়তে শেখায় না, পাখি নিজেই উড়তে শেখে। তুমি ওই টাকায় বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করো, আর যা থাকবে, সেটা রেখে দাও তোমার মায়ের জন্যে। তাঁর সারাজীবনের ব্যবস্থা।'

'বাবাকে কোনও নার্সিংহোমে রাখব কি?'

'কখনই না। দু'হাতে জানপ্রাণ দিয়ে পিতার সেবা করো! জানবে পিতা আর মাতার আশীর্বাদ ছাড়া কোনও মানুষ বড় হতে পারে না। যাও তোমার ওই সুখী সুখী আয়েসী ভাবটা ছেড়ে পিতার সেবায় লেগে পড়। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা হি পরমন্তপঃ। কোনও নার্সও রাখবে না। সব নিজের হাতে করবে। দেখবে, শক্তি পাবে, অসীম শক্তি।'

'আমার লেখাপড়া, আমার পরীক্ষার কি হবে!'

'তাও হবে। চব্বিশ ঘণ্টায় একটা দিন। সময়টা কিছু কম নয়, যদি ঠিকমতো হিসেব করে খরচ করতে শেখো। বাবার ঘরটাকেই লেখা-পড়ার ঘর করে নাও। পড়বে আর সেবা করবে। মনে মনে বাবাকে বলবে—দেখুন আপনি যা ভালোবাসতেন, আমি তাই করছি। আপনার নীরব আশীর্বাদ যেন আমাকে ঘিরে থাকে।' সন্ধ্যেবেলা, হঠাৎ তৃষা এসে হাজির। দরজার সামনে তৃষাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে আমি কিরকম হয়ে গেলুম। যেন একটা ছবি দেখছি। আমার ভয় এখুনি মা হয়তো অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

মা বললেন, 'কে তুমি?'

আমি কিছু বলার আগেই তৃষা বললে, 'আমি তৃষা। পিণ্টুদা আমার বন্ধু।'

মা আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অদ্ভুত এক কথা বললেন, 'তুমি তো ভারি সুন্দর।'

তৃষা এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মাকে প্রণাম করল। যখন মাথা তুলল, তৃষা কাঁদছে, 'এ কি হলো, কাকাবাবুর এ কি হলো!'
মা হঠাৎ তৃষাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে লাগলেন। মা চেয়েছিলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। পারছিলেন না; কারণ ঘৃণা। এখন সামনে তৃষাকে পেয়ে গেছেন। চাপা আবেগ উৎলে উঠেছে। তৃষা ঠিক সময়ে এসেছে। আশ্চর্য মেয়ে। কেউ তো আসেনি। ও কেন এল! দেবীর মতো কোনও মেয়ে পৃথিবীতে হঠাৎ এসে যায়! মা আঁচল দিয়ে তৃষার চোখ মুছিয়ে নিজের চোখ মুছলেন। ঘরে এত সুন্দর একটা নাটক হচ্ছে, বাবা তার কিছুই জানলেন না। টিপটিপ করে স্যালাইন আর প্লুকোজ চলেছে। একটু পরেই ডাক্তারবাবু আসবেন।
তৃষা বললেন, 'কাকিমা, আপনাদের বাড়িতে লোকজন কম। শুনেছি আপনার শরীর খারাপ, আমি আপনাদের সাহায্য করতেই এসেছি। মনে করুন, আমি আপনার মেয়ে। নাই বা হলুম পেটের মেয়ে!'
মা বললেন, 'তুমি কে মা? কোথায় তোমার বাড়ি?'
আমার বাড়ি আপনি চিনতে পারবেন না। একসময় আমাদের বাড়ির খুব নামডাক ছিল। তখন সবাই চিনতো। এখন চেনা লোকও আমাদের চিনতে পারে না। কারণ আমাদের অবস্থা পড়ে গেছে। সংসারে আমাদের এক দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। দুজনে মিলে একটা তেলেভাজার দোকান চালাই।'
'তোমার আর কেউ নেই কেন মা?'
'আমরা সেবার হিমাচলে বেড়াতে গেলুম। বেঁচে ফিরে এলুম আমরা দু'জনে। বাবা আর মা পড়ে রইলেন খাদের ভেতর। কারোর কারোর সঙ্গে ভগবান এইরকম ব্যবহারই করেন।'
'যেমন আমাদের সঙ্গে করছেন।'
তৃষা অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে রইল। রান্নাঘরে ঢুকে যা

পারল সামান্য কিছু রেঁধে দিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল আমাকে 'তুমি এরকম ভেবো না। আমি আর দাদা এইরকমই করি। দাদা বলে, এইটাই আমাদের ব্রত। মানুষের সেবা। কাল থেকে সারারাত আমি থাকব, যাতে তোমরা একটু ঘুমোতে পার। পিণ্টু, একটু শক্ত হও।'

আমি অবাক হয়ে গেলুম। তৃষা আমাকে দাদা বলছে না। নাম ধরে ডাকছে। যেন আমার দিদি।

'তোমাকে আর দাদা বলব না কেন জানো? তোমার আর আমার এক বয়েস। এক স্কুলে পড়লে এক ক্লাসেই পড়তুম। আমার বন্ধু। শোনো তোমার অনেক আগেই একের পর এক বিপদ এসে আমাদের শক্ত করে দিয়ে গেছে। যা আসে তা আসে।'

'তৃষা, তুমি এত সুন্দর কথা কি করে বলছ?'

'শুনবে তাহলে? বিপদের পর বিপদ, অভাব, অপমান আমার বয়েস বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাছাড়া মেয়েরা একটু পাকাই হয়।

তৃষাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে গেলুম। যে রাস্তায় ওদের বাড়ি সেই রাস্তাটা খুব নির্জন। এ-পাড়ার ছেলেরা ক্রমশই বুড়োদের মত হয়ে যাচ্ছে। মদ খায়, গাঁজা খায়, মেয়েদের সিটি মারে। হাত ধরে টানে। অনেক রকমের পাপ কাজ করে। কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। দল বেঁধে এসে খুন করে যাবে। দেশের অবস্থা এইরকমই হয়েছে। কি করা যাবে!

কিছুদুর যাবার পরই দেখি ব্রিজের ওপর সত্যদা দাঁড়িয়ে আছেন। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। সত্যদা কি মনে করবেন? তৃষার মতো সুন্দরী মেয়ে আমার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটছে। রাতও হয়েছে বেশ? এখুনি বলবেন হয়তো—বাঃ পিণ্টু!! তোমার আর লেখাপড়া হবে না। মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে শিখে গেছ।'

আমার হাঁটার বেগ কমে এসেছে। সত্যদা এগিয়ে এলেন। এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এত রাতে তৃষার সঙ্গে চললে

কোথায় ?'

'তৃষাকে আপনি চেনেন ?'

'চিনব না ! তৃষা তো আমার ছাত্রী। ভালই হয়েছে, তোমাদের জন্যেই বোধহয় ভগবান আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এই পথটা মোটেই সুবিধের নয়। চলো এগিয়ে দিয়ে আসি।'

তৃষা বললে, 'আমি কাকাবাবুকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

ভালাই করেছ। ওদের একটু দেখাশোনা করো। পিণ্টুর মায়েরও তো শরীর ভাল নয়।'

'হ্যাঁ সত্যদা, আমি সেই কারণেই আরো গিয়েছিলুম।'

গোটাপথের কোথাও আলো নেই। অন্ধকার যারা পছন্দ করে, ইঁট মেরে সব বাল্ব ভেঙে দিয়েছে। সত্যদা বললেন, 'পিণ্টু তোমাকে একটু মার্শাল-আর্ট শিখিয়ে দেব। এ-যুগে বাঁচতে গেলে আত্মরক্ষার কায়দা শিখতে হবে।'

'সত্যদা, আপনি কি জানতেন আমরা আসব !'

'শোনো, আমি বিশুকে পড়াচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে হলো, যাই একটু ঘুরে আসি। পথ আমাকে এই দিকেই টেনে নিয়ে এল। এখন তুমি যা ব্যাখ্যা করবে করো।'

কিছুদূরে অন্ধকারে গোটাকতক আগুনের ফুটকি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে সিগারেটের আগুন। আমার জীবনে এইরকম একটা ঘটনা আছে ! হঠাৎ হায়নারা ছুটে এসে আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছিল। ব্লেড চালিয়েছিল গালে ! সেই থেকেই সিগারেটের আগুন অন্ধকারে জ্বলতে নিবতে দেখলে আমার হাতের মুঠো শক্ত হয়। সত্যদা তৃষাকে আড়াল করলেন। জায়গাটা আমরা পেরিয়ে গেলুম। নাকে হুহু করে মদের গন্ধ ভেসে এল।

সত্যদা বললেন, 'কাকে দোষ দেব। এই অবস্থার জন্যে আমরাও কম দায়ী নই। দেশের একটা অংশ এগিয়ে যাচ্ছে যে গতিতে আর একটা অংশ পিছিয়ে যাছে ঠিক সেই গতিতেই। দেশটা কাপড়ের

টুকরোর মতো ছিঁড়ে ফালা হয়ে যেতে বসেছে।'

ফেরার পথে সত্যদা বললেন, 'তৃষাদের পাড়াটা ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওকে কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। আমার যে একটা মাত্র ঘর। তোমাদের বাড়ীতে ওকে রাখ না।'

'আমি কে সত্যদা। সবই মায়ের ইচ্ছা।'

'তোমার মাকে বুঝিয়ে বলো না।'

'আপনি বলুন না তৃষার দাদা রাজি হবে তো।'

'ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করবো। তৃষার ওপর বহু শয়তানের নজর। ওর কিছু হয়ে গেলে সহ্য করতে পারবো না।'

রাত অনেক হয়ে গেল। সারা পাড়া ঘুমে কাদা। মা আর আমি জেগে বসে আছি। বাইরে চিৎকার করছে একপাল কুকুর। দমকা বাতাসে জানালার পাল্লা দুলে উঠছে। মায়ের মাথাটা থেকে থেকে ঢুলে পড়ছে। পাশের ঘরের বিছানায় মশারি টাঙিয়ে এসে, মাকে বললুম, 'তুমি একটু শুয়ে নাও। আমি বাবার কাছে আছি।'

'শোব কি রে! শোয়া যায় না, শোয়া উচিত!'

'উচিত, অনুচিত জানি না, তুমি একটু শুয়ে নাও। তা না হলে তুমি নিজেই অসুখে পড়ে যাবে এখন তুমিও যদি পড়ে যাও, তাহলে খুব খারাপ হবে।'

মা টলতে টলতে উঠে গেলেন। আমি বাবার মাথার কাছে বসলুম। টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি চলছে। বাবার এতদিনের সঙ্গী সেই টেবিল-ক্লক, যার অ্যালার্মের শব্দে আমাদের সকলের ঘুম ভাঙতো। বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। শরীর চাদরে ঢাকা, নিথর, নিস্পন্দ। ডাক্তার বলে গেছেন, একে বলে কোমা। জীবন আছে; কিন্তু চেতনা নেই। মাথার যে-অংশে চেতনা থাকে, সেই অংশটা বিকল হয়ে গেছে। আমি বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলুম, 'বাবা, আমি পিণ্টু।' কতবার বললুম। মনে মনে আশা, হঠাৎ যদি ভগবান বাবাকে সুস্থ করে দেন। আমার ডাকে বিছানায় যদি উঠে বসেন; আমি অমনি পায়ে মাথা রেখে

ক্ষমা চাইবো। আমার পালিয়ে যাওয়ার অপরাধের যে ক্ষমা চাওয়া হয়নি।

॥ চার ॥

বাবা, তাঁর ডায়েরিতে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন—'জানবে, মানুষের একটি মাত্র ছেলে হওয়া মহাপাপ। ইংরেজিতে বলে, ওয়ান চাইল্ড সিন। সেই পাপের ফলভোগী আমি। খুব একটা উদাসীন হতে পারি না, এটাও আমার চরিত্রের এক মহা দোষ। নিজেকে নিয়েই বেশ মজায় থাকার অভ্যাস আমার নেই। আমার সমস্ত সুখ, সকল আনন্দ লুকিয়ে আছে তোমার ভেতরে। যেখানে যা কিছু ভালো দেখি, সুন্দর দেখি, গৌরবের দেখি, মহৎ দেখি, সবই মনে করি তোমাতে ফুটে উঠুক। আকাশে যত তারা, সবই যেন তোমার আকাশে গুণ হয়ে ফুটে ওঠে। নিজের কোনও উচ্চাশা নেই, সমস্ত আশার প্রতিমূর্তি তুমি। তুমি বড় হবে। বড়, আরও বড়। গাছের মধ্যে যেমন গর্জন, মানুষের মধ্যে সেইরকম তুমি। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, চারিত্রিক গুণে, শিক্ষায়, সেবায়। নৃপতির মতো হয়ে উঠবে তুমি। অচল, অটল, ধার্মিক। বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যেন জাহাজের গতি। খাড়ি থেকে নদী, নদী থেকে অনন্ত সমুদ্রে। প্রথম দিকটায় একজন পাইলটের প্রয়োজন হয় জাহাজকে সমুদ্রে তুলে দেবার জন্যে, যাতে চড়ায় না আটকে যায়। পিতা সেই পাইলট। মানব-পোতকে জীবন-সমুদ্রে মুক্তি দেয়। সমুদ্রে কাপ্তেনের নিজের কেরামতি। নিজের শিক্ষা, নিজের চরিত্র। সেখানে প্রয়োজন সাহস, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, বিচার। আমার চরিত্রের দোষ—আমি বড় আবেগপ্রবণ। আমার রাগের চেয়ে অভিমানই বেশি। নিজের অক্ষমতার ওপর অভিমান। সবাই বলে, বাপকা বেটা। কোথায় সেই ছেলে, যে বাবার সমস্ত গুণের অধিকারী হয়ে বাবাকেও অতিক্রম করে যাবে। পিতার সমস্ত অহঙ্কার তার পুত্র। সেই অহঙ্কার

আমি তৈরি করতে পারিনি, সে আমারই অক্ষমতা। সেই গ্লানি আমার কাছে অসহনীয়। সবাই বলেন, ভেবো না, ভেবো না, যা হবার তা হবে। আমার পুরুষকারে লাগে। আমি বিশ্বাস করি, চেষ্টায় কি না হয়! একশো ভাগ না হোক, চল্লিশ ভাগ হবে। জীবনকে ছেলেবেলা থেকেই বাঁধতে হয়। বাঁধন দিতে হয়। একবার আমি শিমুলতলায় বেড়াতে যাচ্ছিলুম। কারমাটার স্টেশনে দেখি এক দেহাতী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে খাটো কাপড়, নীল জামা। তার বগলে শতরঞ্জিমোড়া বিছানার একটা বাণ্ডিল। দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেই পোঁটলা আর লাঠিটি সন্তর্পণে বগলদাবা করে মানুষটি সাবধানে হেঁটে চলেছে। এই দৃশ্যটি আমি ট্রেনের জানালায় বসে দেখেছিলুম। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, এই তো উপমা। জীবনকে এইরকম সাবধানে, বেঁধেছেঁদে, আঁকড়ে ধরে এগোতে হয়। আলগা দিলেই চলে যায় নিজের আয়ত্তের বাইরে। ওই শতরঞ্জিটা হলো আদর্শ। প্রথমে আদর্শের মোড়কে জড়াতে হবে। এরপর দড়ির বাঁধন-সংযম, নিষ্ঠা, সংসঙ্গ, সংচিন্তা, সম্ভাবনা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সাধনা প্রভৃতি দিয়ে কষে বাঁধতে হবে। আর ওই লাঠিটা হলো শিক্ষা। এই চিত্রটি চোখের সামনে ধরে রাখতে পারলে সকলেরই উপকার। মানুষ পৃথিবীতে আসে বিকাশের জন্যে। নষ্ট হবার জন্যে নয়। মাটিতে বীজ ফেললে চারা হয়, সামান্য পরিচর্যায় গাছ হয়, ক্রমশ বড় হতে থাকে, ফুল হয়, ফল হয়। কোনও গাছ ইচ্ছে করে নিজেকে নষ্ট করে না। তার স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো, ফল-ফুলে নিজেকে ভরিয়ে তোলা। মানুষ কিন্তু নিজেকে নষ্ট করে। নিজেকে মেরে ফেলে। বড় হবার বিশাল সম্ভাবনা নিজের আলস্যে হারিয়ে বসে। মানুষ দেহের ব্যায়াম করে। ভালো শরীর হয়। মনের ব্যায়ামই আসল ব্যায়াম। মনের জোরেই মানুষ এগোয়। সেই মনকে একাগ্র করো। ভীষণ একটা জেদ আনো। এই কথাগুলোই তোমাকে আমার বলার ছিল। সামনা সামনি বলতে চাই। বলতে পারি না। অভিমানে আমার

কথা আটকে যায়। আমি গম্ভীর হয়ে যাই। আমার মুখ কঠিন কঠোর দেখায়। তখন কিন্তু আমি কাঁদি। ভেতরে ভেতরে কাঁদি। বাবা হওয়া বড় কষ্টের ভীষণ এক দায়িত্ব পুত্রই তো মানুষের পিতা। দূর থেকে তোমাকে যখন দেখি তখন মনে হয় নিজেকেই যেন দেখছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, মৃত্যু আমার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। না-বলা কথা লেখা রইল তোমারই জন্যে তোমার মঙ্গল কামনায়।'

বাবা রইলেন না। গভীর রাতে নিঃশব্দে চলে গেলেন অমর্ত্যলোকে। মাথার কাছে বসেছিলেন মা। মায়ের পাশে তৃষা। পায়ের কাছে আমি, প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি।

বাবার পায়ে হাত বোলাতে গিয়ে দেখি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখ দুটো কাঁচের মতো স্থির কবজির কাছে নাড়িতে আঙুল টিপে দেখি জীবন-ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবল শব্দে টেবিল-ঘড়িটা চলছে। মুখ তুলে তাকালুম। মায়ের মুখ। লাল পাড় শাড়ি। সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। সব সাদা হয়ে যাবে একটু পরেই। পৃথিবীর কোনও কিছুই পাল্টাবে না। যা ছিল. যেমন ছিল, সব ঠিক সেইরকমই থাকবে। সকাল হলেই পুব আকাশে সূর্য উঠে পুবের জানালা দিয়ে যেমন আলোর ধারা ফেলে, ঠিক সেইরকমই ফেলবে। জানালার ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝিরঝিরি পাতায় আলো নাচবে। রোজ যেমন নাচে। কারোকে কিছু না বলে আমি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। চোখের সামনে মাঝরাতের তারা ছড়ানো আকাশ। বড় নিজের মনে হলো। পৃথিবীর মানুষের চিরসঙ্গী। অনুমান করার চেষ্টা করলুম, কতক্ষণ আগে বাবা ওই পথে চলে গেছেন! তাঁর রথ কি এখনও দেখা যাচ্ছে! শেষ স্বর্ণ নিশান। একটু ধোঁয়ার রেখা। তৃষা বুঝতে পেরেছিল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে হাত রেখে বললে, 'চলে গেলেন?'

এতক্ষণ আমার কিছু হয়নি। তৃষার কথায় আমার বুক ফেটে গেল।

ভীষণ জোরে, বড় বড় ফোঁটায় যেন বৃষ্টি এল। আর ঠিক সেইসময় ঘরের ভেতর থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা এত রাতে দু'জনে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালি কেন? বাতাস লাগবে।'

আমি কোনও রকমে বললুম, 'তৃষা মাকে সামলাও।'

অন্ধকার পথ ধরে কেউ আসছেন। অন্য সময় হলে ভূতের ভয়ে দৌড় লাগাতুম। তখন আমার কোনও ভয় ছিল না। এমনও মনে হচ্ছিল, আমিও যদি যেতে পারি, যেভাবে বাবার হাত ধরে বেড়াতে যেতুম গড়ের মাঠে! সত্যদার গম্ভীর গলা—'কে পিণ্টু নাকি?'

আমি হতবাক। গলার কাছে যে কান্নাটা ঠেলে উঠেছিল নেমে গেল। এত রাতে সত্যদা!

'সত্যদা আপনি?'

'কি হলো জানো, বসে বসে বেশ অঙ্ক কষছিলুম, হঠাৎ খাতার পাতায় বড় বড় দু'ফোঁটা জল পড়ল। তা মনে হলো, যাই পিণ্টুর একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি। কিছুটা পথ এসেছি, মাথায় ঝাপটা মেরে উড়ে গেল সাদা মতো একটা পাখি। প্যাঁচা-ট্যাঁচা হবে। শোনো, রাতটা কেটে যেতে দাও। আমাদের যাত্রা হবে ভোরে।'

সত্যদা ঘরে ঢুকে বললেন, 'মা এইবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি এসে গেছি তো!'

মা তখনও জানেন না, বাবা চলে গেছেন। মাকে নিয়ে তৃষা চলে গেল পাশের ঘরে। সেই রাতে দেখেছিলুম, মানুষ কত শক্ত হতে পারে প্রয়োজনে। সত্যদা পরে আমাকে বলেছিলেন, যে ঈশ্বর দুঃখ দেন, যন্ত্রণা দেন, তিনিই দেন সহ্যশক্তি। যেমন, জল পায় না বলে, মরুভূমিতে গাছ হয়ে যায় কাঁটা কাঁটা, মনসা গাছ।

বাড়িটা খালি হয়ে গেল। খালি হয়ে গেলেন আমার মা। মানুষ চলে গেলে অন্য মানুষ ঠিকই থেকে যায়। দিন কতক তারা উদাস হয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জীবনের সুর-ছন্দ কেটে যায়। তারপর জীবন এসে হাত ধরে নাচাতে নাচাতে আবার তালে বসিয়ে

দেয়। একে একে সবই ফিরে আসে। ফিরে আসে হাসি। যেমন ছুটো ফুসফুসের একটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ বেঁচে থাকে। এমনকি সিগারেটও খেতে পারে। একটা শূন্যতা চাপা পড়ে থাকে ঘটনার পর ঘটনায়। ফোকলা দাঁতে জিভ চলে যাবার মতো, মন চলে যেতে পারে সেখানে, আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়। বেঁচে থাকাটা বড় দগদগে, রগরগে।

তৃষা আমাদের বাড়িতেই থেকে গেছে। মা তাকে ছাড়তে চাইলেন না। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, গত জন্মে এ আমার মেয়ে ছিল। সত্যদা তৃষার দাদাকে বললেন, 'শোনো বিকাশ, তৃষা বড় হচ্ছে। তার ওপর সুন্দরী। দিনকাল খুব খারাপ। ওকে আর দোকানে এনো না। তুমি একটা ছেলেটেলে রাখো। তোমার দোকান এখন বেশ জমে গেছে। ও একটা ভালো আশ্রয়ে থাক। ওকে আমি লেখা-পড়া শেখাই ভালো করে।

তৃষা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সত্যদা বলেছেন, তৃষাকে তুমিও পড়াবে। পড়ালে নিজের শিক্ষা ভালো হয়। তৃষাকে আমি পড়াই। পড়াতে বসলেই অনুভব করি, আমার ভেতরে আমার বাবা জেগে উঠছেন। তিনি দুর্দান্ত শিক্ষক ছিলেন। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, যে-সব অঙ্ক আগে বুঝতেই পারতুম না, সেইসব অঙ্ক চটচট কষে ফেলছি। তৃষার কাছে আমি হারব না।

সত্যদা বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করতেন। ঘর ঠাসা বই। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে বই পুরে রোজ বারোটা, একটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তেন। অফিসে অফিসে বাঁধা খদ্দের। সত্যদাকে সবাই ভীষণ ভালোবাসতেন। সত্যদা বলে বলে বই দিতেন—এই বইটা আপনার পড়া উচিত। এই বইতে এই এই আছে। বইয়ের খবর সত্যদার মতো কেউ রাখতেন না। প্রকৃতই একজন জ্ঞানী মানুষ। সত্যদাকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন সেই কারণে।

মাঝে মাঝে আমিও সত্যদার সঙ্গে বেরোতে শুরু করলুম।

আমার কাঁধেও একটা ছোট ঝোলা, কিছু বই। বইয়ের ওজন কম নয়। এই ভার বয়ে বয়ে সত্যদার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, আর কিছু মনেই হয় না। সত্যদা বলতেন, 'আমরাও এক ধরনের গাধা। ধোপার গাধা নই, মা সরস্বতীর গাধা. জ্ঞানের ভার বয়ে বেড়াচ্ছি।' সারাটা পথ আমরা নানারকম আলোচনা করতে করতে ঘুরে বেড়াতুম। কখনও মহাকাশে রকেট কোন বিজ্ঞানে ওড়ে, কখনও বিশ্বসাহিত্যের সেরা লেখক, কখনও দেশ-বিদেশের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী। বাসে-ট্রামে মানুষ খ্যাঁচোর-ম্যাঁচোর ঝগড়া করছে তার মধ্যে আমাদের আলোচনা চলছে—লিউইস ক্যারল কত বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন। মাঝে-মধ্যে বাসে-ট্রামেও জ্ঞানী মানুষ পাওয়া যেত। তাঁরাও আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন। বাসের কণ্ডাক্টাররা সত্যদাকে শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, আপনি উঠলে বাসের আবহাওয়াই পাল্টে যায়। বেশ কিছু কণ্ডাক্টার সত্যদার ছাত্র হয়েছিলেন। সপ্তাহে একদিন সত্যদার কাছে এসে তাঁরা নির্দেশ নিয়ে যেতেন। বাসে এঁদের কারোর সঙ্গে দেখা হলেই বাসটা স্কুল হয়ে যেত। সে বেশ মজা। কণ্ডাক্টার একদিকে টিকিট কাটছেন, আর একদিকে সত্যদার পড়ার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। বাসের সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি কিছুক্ষণের মতো বন্ধ হয়ে যেত। আমাদের স্টপেজ এলে সকলেই সশ্রদ্ধায় বলত—'নামতে দিন। নামতে দিন।' পেছন ফিরে হঠাৎ তাকিয়ে দেখেছি—অনেকেই সত্যদাকে হাত জোড় করে নমস্কার করছেন।

সত্যদার সঙ্গে ওইভাবে ঘুরতে ভীষণ ভালো লাগত। কত জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হতো। হাইকোর্টের জজসাহেব। কোম্পানির ডিরেক্টার। বড় শিল্পী। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পত্রিকার সম্পাদক। কেউ ভীষণ গম্ভীর, কেউ হাসিখুশি, রসিক, আমুদে। সত্যদা বলতেন, 'সব শিখে নাও পিণ্টু। আমার পরে তুমি। পড়াকে পড়া হবে, ব্যবসাকে ব্যবসা। কারোর দাসত্ব করতে

হবে না। অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক হয়ে বসবে তুমি। তোমাকে আমি সেইভাবেই তৈরি করে দিয়ে যাবো।'

অনেক ঘোরাঘুরির পর ক্ষিদে পেলে, আমরা হু'জনে কোনও পার্কের গাছতলায় বসে ছোলাভাজা চিবোতুম। মাথার ওপর মেঘ-ভাসা নীল আকাশ। চারপাশ জ্বলজ্বলে সবুজ। সত্যদা জিজ্ঞেস করতেন, 'পৃথিবীটা কেমন লাগছে তোমার পিণ্টু ?'

'ভালোই, তবে যে-যার সে-তার। মানুষ বড় একা।'

'তা যা বলেছ! হুটো পৃথিবী পাশাপাশি ঘুরছে। একটা ব্যবসার পৃথিবী, একটা ভালোবাসার পৃথিবী। ভালোবাসতে না পারলেই বড় একা। স্বার্থের কুকুর পেছন পেছন তাড়া করবে। তুমি অবশ্য ভালোবাসা পেয়ে গেছ। একজনকে ঠিক মতো ভালোবাসতে পারলে সকলকেই ভালোবাসা যায়। ভালোবাসার একটা নাড়ী থাকে মানুষের ভেতর। সেইটাকে একবার চালু করে দিতে পারলেই, মার দিয়া কেল্লা। ভালোবাসা পেলে ভালোবাসা আসে, যেমন বীজ ফেললে গাছ হয়, সার আর জল দিলে ফুল আসে গাছে। তৃষা মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগে ?'

সত্যদা আমার গুরুজন। এ প্রশ্নের আমি কি উত্তর দোব! কেমন করে বলব আমার পইতের আংটিটা তৃষার আঙুলে, তৃষার আংটি আমার আঙুলে। কেমন করে বলি, তৃষার কোলে মাথা রেখে বাবার অসুখের সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এইসব কথা তো সত্যদাকে বলা যায় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম।

সত্যদা বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। জানো তো, তোমার মতো বয়সে আমিও একটা মেয়েকে ভালোবাসতুম, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। বড়লোকের মেয়েকে ভালোবাসতে নেই। তারা ভালোবাসা বোঝে না, বোঝে ভালো থাকা। চলে গেল আমেরিকা, আর ফিরলই না। আমারও আর বিয়ে করা হলো না। তা বেশ ভালোই আছি। সংসার মানেই শত ঝামেলা। তৃষা মেয়েটা খুব

ভালো। ভীষণ ভালো। তোমার জীবনটা সুখের হবে। প্রথম দিকে দুঃখ পেলে, শেষের দিকে সুখ হয়। এই বইয়ের ব্যবসাটা তোমাকে দিয়ে যাব। তুমি পড়বে আর বিক্রি করবে। তৃষাকে আমি তৈরি করে দিয়ে যাব। তোমার উপযুক্ত করে।'

তৃষা আর মা একঘরে একই বিছানায় শোন। আমি বাবার ঘরটাই বেছে নিয়েছি। যত রাত বাড়ে ততই মনে হয় একটা কিছু জমছে। ঘরটা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। বাবার খাট, বাবার লেখা-পড়ার টেবিল যেন জীবন্ত। তিনি এসে বসছেন। বইয়ের যে জায়গাটা পড়ছিলেন, সেই জায়গাটা খুলেছেন। চশমার খাপ থেকে চশমা বের করছেন। আমি সব সাজিয়ে রাখি। বিছানার চাদর টানটান করে পাতি। বালিশের ওপর বালিশ সাজাই। মশারি ফেলে গুঁজে রাখি। তারপর নিজে পড়তে বসে যাই। কোনও কিছু আটকে গেলে টেবিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি। দু'তিনবার জিজ্ঞেস করার পরই আমার ভেতর থেকেই একটা উত্তর, একটা সমাধান বেরিয়ে আসে। আমি নিজেই তখন অবাক হয়ে যাই। আত্মা তাহলে আছে। মৃত্যুতেই মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না! মাঝ রাত পেরিয়ে গেলে তৃষা একসময় উঠে আসে পাশের ঘর থেকে। পেছন দিক থেকে ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে। তৃষা একটু লম্বা হয়েছে। আরও ফর্সা হয়েছে। কানের কাছে পাতলা ঠোঁট দুটো রেখে ফিসফিস করে বলবে, 'মহাশয়, এইবার কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাও। রাতের অপমান করিও না। প্রত্যূষে আবার হইবে।' তৃষার রেশমের মতো চুল এরই মধ্যে কোমর ছাপিয়ে নেমে গেছে। সেই চুল খুলে পড়ত আমার বুকের ওপর। তখন আমার মনে হতো, রাত কত সুন্দর! একটা ছেলে, একটা মেয়ে, নিকষ কালো রাত, তারার চুমকি, মধুর মতো মিষ্টি বাতাস। আমি বাবার বিছানার দিকে তাকিয়ে বলতুম, মৃত্যু আছে, দুঃখ আছে, বিরহের দহন আছে, তবু জীবন কত সুন্দর। পৃথিবীতে নিজের জন্যে বেঁচে থাকায় কোনও সুখ নেই। অন্যের জন্যে

বাঁচতে হয়। বাবা চেয়েছিলেন আমার জন্যে বাঁচতে। ছেলেকে মানুষ করবো। আমি বাঁচবো তৃষার জন্যে। তৃষাকে সুখী করবো। ও যা হলো সুন্দর একটা ফুল।

আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল। বিশু বললে, 'এইবার ঝিঁকি মারতে হবে পিণ্টু। আর কোনও কথা নয়।' সন্ধেবেলা বিশু চলে আসত আমাদের বাড়িতে। বাবার ঘরের মেঝেতে মোটা শতরঞ্চি। শুরু হতো আমাদের পড়া। বিশু মাঝে মাঝে বলত, 'তুই আমাকে পড়া।' ও যা আমাদের জোগানদার—কখনও মুড়ি চানাচুর, কখনও একটা লজেনস, কখনও গরম তেলেভাজা। বিশু বলত, 'তোদের বাড়িতে এলে মনে হয় স্বর্গে এসেছি।' বিশু রাতে আর বাড়ি ফিরত না। সারা রাতই চলত আমাদের সাধনা। মাঝে মাঝে সত্যদা আসতেন। তখন আরও জমে যেত আমাদের পড়া। একটা সময় মনে হতো, লেখা-পড়ার মতো জিনিস নেই। সত্যদা বলতেন, পৃথিবীতে ছাত্র হয়ে থাকাটাই আনন্দের। যতদিন ছাত্র থাকতে পারো, ততদিনই ভালো। খালি শিখে যাও। জ্ঞানের নেশায় আটকে থাকো।
পরীক্ষার ফল বেরোতে দেরি আছে। আমি এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলুম। সেই ঘটনাটা ঘটে গেল মাঝরাতে। তৃষা পড়তে বসেছিল আমার কাছে। অনেকক্ষণ লেখা-পড়ার পর শতরঞ্চির একপাশে তৃষা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। ছড়ানো চুলের ওপর ভাসছে তার পানপাতার মতো মুখ। কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ। মোমের মতো দুটো পা। মা আজকাল আর বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারেন না। পাশের ঘরে মা ঘুমিয়ে আছেন। আজকাল ঘুমের মধ্যেই মা কথা বলেন। বোঝার চেষ্টা করলেই বোঝা যায়। বাবার সঙ্গে কথা বলেন। বাবা ডাকছেন, মা উত্তর দিচ্ছেন। বাবা যেন কিছু খেতে চাইছেন না, মা অনুরোধ করছেন খেয়ে নেবার জন্যে। বাবা তেলেভাজা খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন, তৃষার দিকে

চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথায় একটা গল্প এসে গেল। একটা মেয়ে আর দুটো ছেলের গল্প। তিনজনেই কিশোর। তিনজনেই বড় হয়ে উঠছে। কিশোরীর চোখের সামনে দুই কিশোর যেন রেসের ঘোড়া। দু'জনেই প্রাণপণ ছুটছে। কে হারে, কে জেতে! দৌড়ের পাল্লা নেহাত কম নয়। পাকের পর পাক মারছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। পায়ের ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ছে। পায়ের নালের সঙ্গে পাথরের ঘষায় চকমকি পাথরের মতো আগুনের ফিনকি। সুন্দরী কিশোরী একটি সোঁদাল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আছে। ফুরফুর করে ঝরে পড়ছে হলুদ ফুল। কিশোরীর পরনে চাঁপা ফুলের মতো পোশাক। গলায় একটা মুক্তোর মালা। যে-ঘোড়া জিতবে তার গলায় ঝুলিয়ে দেবে মুক্তোর মালা। ঘোড়া দুটো ছুটছে। একটা ঘোড়ার নাম পিণ্টু, আর একটা ঘোড়ার নাম বিশু।

গল্পটা বেশ গুছিয়ে লিখে ফেললুম। ভোরের কাছাকাছি সময়ে গল্পটা শেষ হয়ে গেল। মনে হলো অলৌকিক এক অনুভূতি। কি যেন একটা ঘটে গেল! জীবনের প্রথম অন্যায় কাজটাও বোধ হয় করা হলো সেই ভোরে। আকাশে পেঁয়াজের খোসার মতো আলো। বাতাস হিম হিম। তৃষা চিৎ হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাতলা ঠোঁট দুটো অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। আমি মনে মনে সংকল্প করে নিলুম, পিণ্টু-ঘোড়া জিতবেই। বিশু-ঘোড়া হারবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার ঠোঁট নেমে এল। আলতো করে ছুঁয়ে গেল তৃষার ঠোঁট। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ভীষণ দ্রুত হলো। বুকের কাছটা ছলকে উঠল। ভয়, আনন্দ, নতুন এক অভিজ্ঞতা। তৃষা একবার একটু চোখ খুলল। ঠোঁটের কোণে খেলে গেল মুচকি হাসি। দু'হাত তুলে আমাকে ধরা'র চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তেই মনে হলো, মা উঠে পড়েছেন। চারপাশে যত পাখি ছিল সব একসঙ্গে চিৎকার শুরু করেছে—ওরে, ভোর হয়েছে। ভোর হয়েছে। রাস্তার কলে বালতি ফেলার শব্দ।

ওইদিনই সত্যদা আমাকে বললেন, 'পিণ্টু আজ তুমি একদিকে যাও,

আমি একদিকে। অনেক নতুন বই তুলেছি। ভাগাভাগি করে সকলকেই দেখাতে হবে। এইবার তোমার একটু একা একাই ঘোরা উচিত। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।'

সত্যদা আমাকে দিলেন, সাহিত্যের এলাকা। পত্র-পত্রিকার অফিসে সম্পাদক মহাশয়দের বই দেখাতে হবে। সকলের কাছেই আমি সত্যদার সঙ্গে আগে আগে গেছি। কেউ খুব অল্প কথার মানুষ, কেউ আবার ভীষণ বেশি কথা বলেন, হা হা করে হাসেন। ঘন ঘন সিগারেট খান। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে স্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে। তাঁর নাম সুদর্শন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলগাল, সুন্দর চেহারা। মধ্যবয়সী। আমাকে দেখলেই বলতেন—এই ছেলেটার দিকে নজর রাখা উচিত। দেখতে হবে, এ কি করে! আমাদের একটা সাবজেক্ট। বলেই তিনি আমাকে বিশ্লেষণ করতেন--চোখ দুটো বড় বড়। জল টলটলে, কিন্তু আগুন আছে। চেহারাটা নরম; কিন্তু ধার আছে। হাসলে মনে হয় কাঁদছে। সামনে বসে আছে; কিন্তু মনে হয় বহুদূরে। এ যেন সেই বাউলের গানের উপমা—ঘরের ভেতরে চোর কুঠরি। সেই স্বদেশ পত্রিকার সুদর্শনবাবুর কাছেই আগে গেলুম। তিনি বেশ ভালো মেজাজেই ছিলেন। মুখে সবে একটা পান পুরেছেন। সেই ভরাট মুখেই, জিভ ওল্টানো অবস্থাতেই বললেন, 'আরে, এসো এসো, জ্ঞানদাস এসো।' সুদর্শনবাবু মাঝে-মধ্যে আমাকে জ্ঞানদাস বলেন। আমার ঝোলায় নাকি জ্ঞান ভরা থাকে। আমাকে বসতে না বললে আমি বসি না। গুরুজনকে এই সম্মানটুকু দেখাতে হয়। সুদর্শনবাবু বললেন, 'বসো, বসো। চেয়ার টেনে বসো।'

আমি বসলুম। তিনি ঢোক গিলে মুখ খালি করে বললেন, 'আজ অনেক খাদ্য এনেছ মনে হচ্ছে। দেখাও, দেখাও।'

পর পর সমস্ত বই বের করে তাঁর সামনে সাজিয়ে দিলুম। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আরে বাপরে, আজ কি করেছ?'

একে একে সববই দেখলেন। যা নেওয়ার বেছে নিলেন। বাকি বই সব ভরে ফেললুম আমার ঝোলায়। এইবার আমি উঠব।
সুদর্শনবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে বেশ একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে! কি ব্যাপার?'
ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আমার একটা নিবেদন ছিল।'
'নৈবেদ্যটা কি?'
ইতস্তত করে বললুম, 'একটা গল্প এনেছিলুম।'
'মরেচে, তুমিও লেখক হয়ে গেলে! দেশে আর পাঠক থাকবে না দেখছি। সবাই লেখক।'
আমি লজ্জায় উঠে দাঁড়ালুম। সত্যিই তো, আমি লেখার কি জানি! তাছাড়া স্বদেশ একটা বড় কাগজ। সেরা কাগজ। সেখানে আমার মতো অবোধ লেখক লেখা আনে কোন সাহসে! নমস্কার করে বললুম, 'আমি তাহলে আসি।'
'কি হলো? তোমার গল্প?'
'আমি বোকার মতো বলে ফেলেছিলুম।'
'তাহলে এখন চালাক হয়ে দিয়ে দাও। কে বলতে পারে, তোমার হাত দিয়ে ভালো জিনিস বেরোবে না! দাও, দাও।'
কাঁপা কাঁপা হাতে লেখাটা বের করে তাঁর হাতে দিলুম। প্রথম পাতাটায় চোখ রেখে বললেন, 'লেখা কেমন হয়েছে জানি না, তবে হাতের লেখাটা বেশ ভালোই বাগিয়েছ। তোমার লেখা আজই আমি পড়ে ফেলব, কাল তুমি খবর নিও।'
প্রায় এক লাফে রাস্তায়। আরও দশ-বিশ জায়গায় যাওয়ার ছিল। সব ঘুরে, ব্যাগ খালি করে পার্কে এসে একটা গাছতলায় আরাম করে বসলুম। হাত-পা ছড়িয়ে। বইয়ের কম ওজন। সত্যদার সব বই বিক্রি করে দিয়েছি। আজ আমার দিন খুব ভালো। একটু দূরে আর একটা গাছের তলায় বসে একজন শিল্পী ছবি আঁকছিলেন। বেশ লাগছিল দেখতে। রঙে রঙ মিশে মিশে কি সুন্দর হচ্ছে!

গাছ, সবুজ জমি, বসার আসন। দুটি লোক। সুন্দর পৃথিবী ছবিতে আরো কত সুন্দর হয়ে ওঠে! আমি যদি শিল্পী হতুম, প্রথমেই তৃষার একটা ছবি আঁকতুম। পরের দিন আর সুদর্শনবাবুর কাছে যাওয়া হলো না। তার পরের দিন গেলুম। গম্ভীর মুখে সুদর্শনবাবু বললেন, 'বসো।'

তাঁর মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলুম। ভীষণ রেগে গেছেন নিশ্চয়।

হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে টেবিল পেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার ডান কানটা কষকষে করে ধরে বললেন, 'এঁচড়ে পাকা: গল্প লিখেছে। গল্প!'

লজ্জায় অপমানে জল এসে গেল আমার চোখে।

সুদর্শনবাবু বললেন, 'ওঠো। উঠে দাঁড়াও। বসে আছ কি বলে?'

আমি উঠে দাঁড়ানো মাত্রই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। সুদর্শনবাবু আবেগ জড়ানো গলায় বললেন, 'কি গল্প লিখেছিস তুই! কি সাংঘাতিক গল্প!'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'তোর হবে। তোর সাংঘাতিক হবে! তবে একটা কথা, মাথাটা ঠিক রাখিস। দীন-হীনের মতো সাহিত্যের সেবা করে যা। কেউ তোকে আটকাতে পারবে না।'

আমার চোখ বেয়ে জল নামতে লাগল হু-হু করে। মনে পড়ে গেল বাবার কথা—সাফল্যের চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। লক্ষ টাকা পেলেও ওই আনন্দ পাবে না। আমি সুদর্শনবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলুম। মনে হলো আমার বাবাকেই প্রণাম করছি। মনে হলো, আমার জীবনটা ভরে গেল কানায় কানায়!

সুদর্শনবাবু চেয়ারে বসে বললেন, 'গল্পটা পরের সংখ্যাতেই যাচ্ছে। আমার দেওয়া নামেই যাবে, জ্ঞানদাস।'

আমার হঠাৎ খুব ভয় এল মনে, 'একটা তো লিখে ফেলেছি কোনও

রকমে, আর যদি না পারি ?'

'খুব পারবে জ্ঞানদাস, খুব পারবে। জীবনে একটা স্থায়ী দুঃখ, খুব সাবধানে, নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করো, জীবনে বঞ্চিত হও, নিঃসঙ্গতাকেই সঙ্গী করো নিজেই নিজের হাত ধরো। শিল্পী মাত্রেই একা। একেবারে একা। সেইটাই সমস্ত সৃষ্টির উৎস। ঈশ্বরকে বলো, সুখ আর শান্তি আমি চাই না। প্রভু যত পারো আমাকে ব্যথা আর বেদনা দাও। শিল্প একটা ব্রতের মতো। সেই ব্রত ধারণ করো।

'আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন ?'

'মূর্খ! কেউ তোমাকে ভালোবাসবে, কেউ তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করবে। সবই তোমার জীবনের পাওনা। মানুষের দুটো পা। একটা সুখ, একটা দুঃখ। একটা ঘৃণা, একটা ভালোবাসা। একটা মান, একটা অপমান। একটা ঠিক, একটা বেঠিক। জীবনকে দেখ। জীবন দিয়ে লেখো।'

চারটে বড় বড় সন্দেশ খেয়ে নেমে এলুম পথে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার বাবা, আমার ভেতরে বসে কাজ করছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক। ফেরার পথে সংকল্প করলুম— কারোকে বলব না। না সত্যদাকে না তৃষাকে। জ্ঞানদাস ছদ্মনাম। কেউ জানতেও পারবে না।

গল্পটা বেরলো। সম্পাদক মহাশয় নাম রেখেছিলেন 'লাট্টু'। লেখক জ্ঞানদাস। প্রথম সারির সমস্ত লেখক স্বাগত জানালেন নবাগত লেখককে। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা বেরলো। সুদর্শনবাবু বললেন, 'ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকো। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। আর একটা গল্প লেখো। তারপরেই হাত দাও উপন্যাসে। এবারের পুজো সংখ্যায় তোমার উপন্যাস আমি ছাপবো। যে জীবন তুমি দেখেছ, সেই জীবনের কথাই তুমি লিখবে। তবেই বিশ্বাসযোগ্য হবে। জীবনের কাছে থাকবে। জীবনের ভেতরে

থাকবে। জীবনের বাইরে নয়। তাহলেই হয়ে যাবে গ্রহান্তরের মানুষ। লেখা তোমার মহাশূন্যে ঘুরপাক খাবে, জমি পাবে না।'

আমার দ্বিতীয় গল্পের নাম হলো 'ঘুরপাক'। সে আমার নিজেরই জীবন। একটা ছেলে জীবনের চাকায় ঘুরছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা। একটা সময়ে সে মেনেই নিচ্ছে, পেয়ে হারানো, হারিয়ে পাওয়া এই হলো জীবনের খেলা। স্থায়ী কিছুই নয়। পিছল জমিতে দাঁড়িয়ে থাকার কসরত।

দ্বিতীয় গল্পটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। সুদর্শনবাবু বললেন, 'নাঃ তোমার হবে। অনেকেই কোনওরকমে একটা লিখে ফেলেন, তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যান। সাহিত্যও এক ধরনের সাঁতার। জীবনসমুদ্রে ঢেউয়ের দোলায় দোল খাওয়া। এইবারে একটু একটু করে রসিয়ে রসিয়ে উপন্যাসটা লিখে ফেল। বেশ জমিয়ে।'

মাধ্যমিকের ফল বেরলো। সময়টা আমার ভালোই যাচ্ছে। আশাতীত ফল হলো, বিশুকে অবশ্য ধরতে পারলুম না। বিশু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। আমি গোটাকতক লেটার পেলুম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের চোখে জল। বললেন, 'সেই পারলি, কেবল দুটো মানুষ হারিয়ে গেলেন। থাকলে কত আনন্দ হতো?'

তৃষা বললে, 'তাঁরা ওপর থেকে দেখছেন ঠিকই।'

মা বললেন, 'এইবার তোমার পালা। তোমাকে ঘিরেও আমার অনেক আশা।'

সত্যদা বললেন, 'তুমি নামী কলেজে ভর্তি হতে পারো; কিন্তু আমার মতে মধ্যবিত্ত কলেজেই ভর্তি হও। আর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কাজ নেই। তোমার পথ অধ্যাপনার পথ।'

মনে মনে ভাবলুম, সত্যদা ধরেছেন ঠিক। অধ্যাপক হলে লেখালেখির

খুব সুবিধে হবে। আমি একটা প্রাচীন মধ্যবিত্ত কলেজে ভর্তি হলুম। আর কলেজে প্রথম দিন গিয়েই শুনলুম, ছেলেরা জ্ঞানদাসের লেখা নিয়ে আলোচনা করছে। তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। আমি যেন কিছুই জানি না। চুপচাপ শুনে গেলুম। আর শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো। আমি দু'খণ্ড হয়ে গেলুম। একখণ্ডে আমি লেখক। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি এক ছাত্র। একজন খুব প্রাচীন, আর একজন তরুণ। কেউ কারোকে চেনে না। কে জ্ঞানদাস। প্রশংসা শুনে আমার সামান্যতম পুলকও হচ্ছে না। সকলেই ধরে নিয়েছে জ্ঞানদাস কোনও প্রবীণ লেখকের ছদ্মনাম। দীর্ঘ সাধনার পর হঠাৎ আত্ম-প্রকাশ করেছেন। পেছনে একটা দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আছে।

সত্যদাও আমাকে বললেন, 'হঠাৎ এক নতুন লেখক এসেছেন। সময় পেলে লেখা দুটো পড়ে নিও। নিছক গল্প নয়। ভাবায়। তোমার পড়া উচিত।

হঠাৎ আমার মায়ের মাথায় একটা উদ্ভট চিন্তা ঢুকলো। চিন্তার উৎস একটা স্বপ্ন। বাবা মাকে ডাকছেন। ভোরের স্বপ্ন। একা আমার আর ভালো লাগছে না। তুমি চলে এসো। মায়ের কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আমি আর বাঁচবো না। ডাক এসে গেছে। যাওয়ার আগে ছেলের বিয়ে দিয়ে যাব।

'মা স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। কারোর জীবনে হয়নি। ভাবনাটাই স্বপ্ন হয়ে আসে। এত তাড়াতাড়ি তুমি যেতে পারো না। যাবেও না।'

'স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না পিন্টু। ভোরের স্বপ্ন।'

'আজকাল কলেজে পড়তে পড়তে কেউ বিয়ে করে না মা। আমার সহপাঠীরা আমার গায়ে থুতু দেবে। লোকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারপর বিয়ে করে।'

'তোমার সারা জীবনের ব্যবস্থা তো তোমার বাবা করে রেখে গেছেন। সেদিক থেকে তুমি তো ভাগ্যবান বাবা।'

'কোনও মেয়ের বাবা আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। ও সব সেকালে হতো।'

'সে ভাবনা তোমার নয় আমার। মেয়ে আমার কথা দেওয়া আছে।'

'তার মানে?'

'মানে, আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর মেয়েকে কথা দেওয়া আছে।'

'সেটা ভেঙে দিতে হবে মা। মনে করো, আমার বিয়ে হয়েই গেছে।'

'তার মানে?'

'তোমার পুত্রবধূ ও-ঘরে বসে লেখাপড়া করছে এখন। আজ থেকে পাঁচ বছর পরে সে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে তোমার ছেলের বউ হয়ে।'

মা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন, 'অসম্ভব। তৃষা তোমার বোন। ওকে আমি মেয়ে হিসেবে মানুষ করছি।'

'ছেলের বউও মেয়ে। সে-ও তোমাকে মাই বলবে।'

'সেই মা আর এই মায়ে অনেক তফাত। দুটো দু'রকমের মা।'

'মা কখনও দু'রকমের হয় না। মা বললে একজনকেই বোঝায় আর তিনি মা।'

'কথার মারপ্যাঁচ করার চেষ্টা কোরো না। তৃষা আর তুমি ভাইবোন।'

'তুমি জোর করে একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করলে কি হবে আমাদের নিজেদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে।'

'এত দূর? তা হলে তৃষার তো আর এ বাড়িতে থাকা হয় না।'

'কেন হয় না?

'ও যদি তোমার বউই হবে, তাহলে বিয়ের একটা প্রশ্ন আসছে। বিয়ে না করা পর্যন্ত সে তো বউ নয়। বিয়ের কনে আলাদা বাড়িতেই থাকবে।'

'এই তো বলছিলে তুমি আমার বিয়ে দেবে!'

'তোমার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি।'

'ও তোমার ঠিক করা পাত্রীকে বিয়ে করলে বিয়ের বয়স হয়েছে, আর তৃষাকে বিয়ে করলে বয়স হয়নি। তোমার কোনও তুলনা হয় না মা। তুমি অদ্বিতীয়। তোমার অদ্ভুত অদ্ভুত সব যুক্তির জন্যই তোমার সংসার আজ শূন্য। তোমার জন্যেই আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। জ্যাঠামশাই আমাকে আদরে আদরে বাঁদর করেছেন, এ কথা তুমিই প্রায়ই বলতে। আর সেই কারণেই জ্যাঠামশাই আমাকে খুঁজতে ছুটেছিলেন হাসপাতালে হাসপাতালে। যখন কোথাও পেলেন না, তখন তোমাব ভয়ে নিজেকে গাড়ির তলায় ফেলে দিলেন।'

'কে বলেছে? কে বলেছে এ কথা? তার মানে আমি খুনী?'

'তুমি আমাকে খুনী বলেছিলে। রেগে আমাকে গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলে। সেই কাটা দাগ এখনও আমার কপালে। তুমি জানতে জ্যাঠামশাইকে তুমি কি বলেছিলে? আর জানতে বলেই তোমার অত বাগ হয়েছিল। তুমি আমার বাবাকেও উদ্বাস্তু করে মেরে'ছে। তুমি সব জানো, সব বোঝো, তবু তোমার বিশ্রী জেদ, তোমার আমিব অহঙ্কার গেল না। দুটো মৃত্যুকে তুমি যত ভুলছ, তোমার পুবনো স্বভাব ততই জেগে উঠছে।

মা উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। তৃষা ঘরে এসে বললে, 'আমাকে নিয়ে যখন অশান্তি, তখন আমি চলেই যাবো।'

মা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কারোকে যেতে হবে না, আমিই যাবো।'

'কোথায় যাবে তুমি? তোমার যাবার কোনও জায়গা আছে?'

'বিধবা বুড়িরা চিরকাল যেখানে যায় ঘরছাড়া হয়ে আমি সেখানেই যাবো।'

'এই শরীরে?'

'না হয় মরবো।'

'আর তোমার এই সম্পত্তি আমরা যক্ষের মতো আগলাবো; আর

সারা জীবন লোকে আঙুল দিয়ে দেখাবে, ওই দেখ মাকে তাড়িয়েছে।'
আমার সেই গল্পটা মনে পড়ল—একটি লোক মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিল, দ্যাখো, আমি তো খুব খারাপ লোক ছিলুম, তা আমি এখন মরছি। মরার পর আমাকে তোমরা পেছনে বাঁশের গোঁজা দিয়ে হাটের কাছে প্রদর্শনী করে রেখ, খারাপ লোকের শাস্তি। গ্রামবাসীরা তাই করল ; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কোতোয়ালি থেকে রাজকর্মচারীরা গ্রামকে গ্রাম ধরে নিয়ে গেল খুনের দায়ে। আমার মাকে এই গল্পটা শোনাতে ইচ্ছে করছিল। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অসম্মান করে ফেলেছি। মায়ের মুখ থম মেরে আছে। বড় করুণ সে মুখচ্ছবি। বড় অসহায় মহিলা। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। নিজের গোঁ। আর জিদ ছাড়া।
মা বললেন, 'একটা কথা তুমি শুনে রাখো, তৃষাকে বিয়ে করে তুমি কোনওদিন সুখী হতে পারবে না। কেন জানো ? তৃষার ওই সর্বনাশা রূপ। ও হলো নায়িকা। কিন্নরী। সেকালে এই রকম মেয়েকে দেবদাসী করা হতো।'
'একালে এই রকম মেয়েরা চিত্রাভিনেত্রী হয়। সুখেই ঘরসংসার করে।'
'করতে পারে, তবে এক স্বামীর সঙ্গে নয়। দ্রৌপদীর মতো পঞ্চস্বামীর সঙ্গে।'
'তাহলে তোমার মতে তৃষ্ণার কি ব্যবস্থা করা উচিত ?'
তৃষা বললে, 'এই মুহূর্তেই আমি চলে যাবো।'
স্মরণ করিয়ে দিলুম, 'তৃষা আজ বাদে কাল তোমার পরীক্ষা। তুমি কোথায় যাবে ? কোথায় গিয়ে উঠবে তুমি ! তোমার দাদা হাসপাতালে। দোকান চালাচ্ছে তোমার দাদার বন্ধু। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে ?'
'ভবিষ্যৎ তোমরাই তৈরি করছিলে। আমার আবার ভবিষ্যৎ কি ! আমি তো পথের মেয়ে। পথ থেকে এসেছিলুম, আবার আমি পথেই ফিরে যাবো।'

তৃষা কাঁদতে লাগল।

মা বললেন, 'তোমাকে আমি একবারও চলে যেতে বলিনি।'

'তার চেয়েও বেশি বলেছ তুমি। বলেছ চরিত্রহীন।'

'তোমরাই প্যাঁচ করে বাঁকা মানে করছ। আমার মা আমাকে যা বলতেন, আমি তোমাদের তাই বলেছি। এতে তৃষা যদি রাগ করে চলে যেতে চায় তো যাক। তোমাদের দু'জনেরই এই বয়েসটা সুবিধের নয়। ঘি আর আগুন পাশাপাশি না থাকাই ভালো।'

'তুমি একটা ভুল করছ মা। আমি মার খাওয়া ছেলে, তৃষা গরিবের মেয়ে। যে-সব মেয়ে উড়ে বেড়ায় তারা সব পয়সাওয়ালা ঘরের। চরিত্র খোওয়াতে হলে টাকা চাই মা। ট্যাঁকের জোর থাকা চাই।'

'তোমার ব্যাখ্যা তোমারই থাক। আমি আমার মতে যেভাবে চলে এসেছি, চিরকাল সেইভাবেই চলব।'

তৃষা পড়ার ঘরে চলে এল। বইপত্র মুড়ে বসে রইল করুণ মুখে। আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। পৃথিবী যেমন চলছিল সেই-রকমই চলছে। আমাদের ভেতরে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেলেও বাইরেটা ঠিকই আছে। দোকানপাট, কেনাবেচা, লোকজন, হইহল্লা, হাসিঠাট্টা। আবার আমার ভাঙনের দিন এল। ঘর ছেড়ে ভেসে যাবার দিন। জ্যোতিষী ঠিকই বলেছিলেন, দেখ বাপু তোমার কোষ্ঠীতে গৃহসুখ নেই। তুমি সব পাবে, যশ, খ্যাতি, সম্মান, অর্থ; কিন্তু সারাটা জীবন তোমাকে জ্বলতে হবে।

বেশ, তাই হোক। তৃষাকে বললুম, 'চলো।'

'কোথায়?'

'যেখানে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস এখনও আছে তো? না, নষ্ট হয়ে গেছে?'

'আছে!'

'তাহলে চলো। যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থায়। শুধু বই আর খাতা-পত্তর নেবে।'

'মাকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। মা বড় একা। ভীষণ অসহায়।'

'তাহলে তখন বললে কেন?'

'না ভেবেই বলেছিলুম। হঠাৎ। তোমার চেয়েও আমি মাকে বেশি ভালোবাসি।'

তৃষা কেঁদে ফেলল। চোখ মুছে বললে, মাকে কার কাছে রেখে যাবো? আমার তো মনে হয়, স্বামী স্ত্রী হওয়ার চেয়ে, ভাইবোন হওয়া অনেক ভাল। তাহলে আমরা দু'জনেই মাকে পাবো। মাকে বাদ দিয়ে কোনও কিছুই ভাবা যায় না, ভাবা উচিত নয়। তুমি একবার ভেবে দেখ। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।'

অবাক হয়ে তৃষার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার নিজের মাকে তো আমি এইভাবে ভালোবাসতে পারিনি কোনও দিন। ভীষণ লজ্জা হলো নিজের ওপর। মেয়েরা কত সহজে গুটিয়ে নিতে পারে নিজেকে? প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে, কত কি ভেবে বসে আছি আমি তৃষাকে অন্য কেউ বিয়ে করবে ভাবলে মনে হতো, হয় আমি তাকে খুন করব, না হয় আত্মহত্যা করব নিজে। কোনও দিনই তৃষাকে আমি বোন হিসেবে ভাবতে পারবো না। তৃষা আমার প্রথম প্রেম।

সত্যদার কাছে আমার বইয়ের ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিলুম। সত্যদার হাঁটুতে কি হয়েছে হাঁটতে পারছেন না। আমাকে বলেছেন ঈশ্বরের আদেশ, সিট ডাউন, আর গেট আপ বলবেন কিনা জানি না। তুমি বুঝে নাও। এবার আমার ছুটি।

ঝোলাটা নিয়ে বেরোচ্ছি. সত্যদা বললেন, 'আজ তোমাকে একটু অন্য. মনস্ক দেখাচ্ছে কেন?'

'পরে বলবো সত্যদা। আগে নিত্য টহলটা মেরে আসি।'

রাস্তায় বেরিয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেলে নিজের সব কিছু বেশ হারিয়ে যায়। অনেকের মধ্যে আমি এক। ফেরিওলার জীবিকাটা বেশ ভালো। দিনের শেষে পার্কে এসে বসলুম। সেই গাছের তলায়।

সারা দিনের খাদ্য একটাকার বাদাম। মুখ চলছে, চলছে ভাবনা। তৃষাকে মনে পড়লেই ভেতরে এক হাজার দাঁড়কাক যেন খা খা করে ডাকছে। কেন মানুষ আত্মহত্যা করে বুঝতে পারছি। মানুষ মানুষের জন্যেই মরে। পুকুরের শান্ত জলে ঢিল ছোঁড়ার মতো শান্তিতে অশান্তির ঢেউ তোলে। তাইতেই আনন্দ বিষম, বিপুল অহঙ্কার হলো মানুষের আমি। আমির উৎপাত পাগলা হাতির উৎপাত-কেও ছাড়িয়ে যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তৃষার জন্যে অপেক্ষা করব। হঠাৎ এমন একটা বিশ্রী চিন্তা এল, নিজেই চমকে উঠলুম— মা যদি হঠাৎ মারা যান তাহলে কার কি ক্ষতি হয়! ভালোই তো হয়। মহিলার অশান্তি ছাড়া আর কিইবা করার আছে। এখনও এই অবস্থায় সংসারটাকে কত সুন্দর করা যায়! পারবেন না তিনি। মা পুড়তে আর পোড়াতে ভালোবাসেন। এও এক ধরনের বেঁচে থেকে আত্মহত্যা।

চিন্তাটাকে মন থেকে ধাক্কা মেরে সরালুম। যে ছেলে মায়ের মৃত্যু চিন্তা করে, সে তো পাপী। তার জীবনে তো ভালো কিছু হতে পারে না। এইরকম একটা কালো মন আমার ভেতরে আশ্রয় করে আছে! আর আমি জামা কাপড় পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছি! কিছুই না ভেবে বসে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা নামছে ইস্পাত কালো ডানা মেলে। হঠাৎ ভেতরে একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল। এই তো আমার উপন্যাসের বিষয়! সুদর্শনবাবু বলেছিলেন, জীবন দিয়ে লিখবে। এই তো সেই লেখা। শেষটা আমার জানা নাই, কিন্তু শেষটা আমি তৈরি করতে পারি। প্রথমটা হবে জীবনের মতো লেখা। জীবনের সঙ্গে লেখাকে মেলাবো, পরেরটা হবে, লেখার মতো জীবন। লেখার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেবো। পরে জীবন যখন সময়ের সেই পথ ধরে হাঁটবে, মিলিয়ে মিলিয়ে নেবে। সত্যদা বলেন, ঘটনা সব ঘটেই আছে তুমি শুধু হেঁটে যাও।'

উপন্যাস হয়ে ওঠার আনন্দে আমার সব দুঃখ হারিয়ে গেল। রাতে

সত্যদা যখন জিজ্ঞেস করলেন—'তোমাকে মেঘলা দেখছি কেন সকাল থেকে ?'
হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'উপন্যাস।'
'উপন্যাস মানে ?'
বিপদে পড়ে গেলুম সত্যদা তো জানেন না, আমি জ্ঞানদাস। সে কথা প্রকাশ না করে বললুম—'সত্যদা আমি আমার জীবন দিয়ে একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি।'
'তোমার জীবন তো এখনও শুরুই হয়নি।'
'ভেতরে ভেতরে অনেকটা এগিয়ে গেছে সত্যদা।'
'তার মানে তুমি বাঁচার চেয়েও বেশি বেঁচে আছো ? দেখতে পাচ্ছ নিজের চলার পথ ?'
'পাচ্ছি সত্যদা।'
'বাঃ, অঙ্কে তাহলে তোমার মাথা খুলে গেছে। জীবন এক জটিল অঙ্ক। যাদের ভালো মাথা তারা দু'তিন ধাপ এগোবার পরই উত্তরটা দেখতে পায়। হাতে এক থাকবে কি শূন্য! সাধকের হাতে থাকে এক সাধারণের হাতে শূন্য।'
একবার মনে হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে সত্যদার কাছেই থাকি এসে। দুটো কারণে তা আর করা হলো না। প্রথম কারণ, সত্যদার একটাই মাত্র ঘর। অর্ধেক বইয়ে ঠাসা। জায়গা নেই বললেই চলে। একটা মানুষ শুতে পারে কোনও রকমে। দ্বিতীয় কারণ, আমি বাড়ি ছাড়া ছাড়া হলে তৃষাও চলে যেতে পারে। তৃষা এখন উঠতি বয়সের ছেলেদের নজরে আছে। সুযোগ পেলেই হাত ধরে টানবে। যা করার করে ভাসিয়ে দেবে জলে। কোনও রকমে আর পাঁচটা বছর আমাকে মাথা নিচু করে থাকতে হবে। থাকতে হবে গা বাঁচিয়ে, কায়দা করে। তারপর আমি ভাববো, কি করতে পারি আর কি না পারি। ততদিনে আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যাবে।
শুরু হলো আমার উপন্যাস। এক মা, তার একমাত্র ছেলে। বেশ

বড় মাপের একটা বাড়ি। অনেক ঘর। সবই প্রায় তালাবন্ধ। একটা ঘরে লাইব্রেরি। আইনের বই র‍্যাকে র‍্যাকে। মাঝখানে সেগুন কাঠের বিলিতি কায়দার টেবিল। বিশাল একটা চেয়ার। দেয়ালে চোখা চেহারার দুই মানুষের ছবি। মুখে সুখী সুখী ভাব। এঁরা দুই ভাই। আর এক দেয়ালে ভীষণ রাশভারি এক মানষের প্রমাণ মাপের অয়েল পেন্টিং। এই পরিবারের বড় কর্তা। যে যার কর্মফল শেষ করে অমর্ত্যাধামের যাত্রী। একটি মেয়ে, অসাধারণ সুন্দরী। গোলাপী ফ্রক পরে যখন ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। ছেলেটি মেয়েটিকে ভালোবাসে, মেয়েটিও ছেলেটিকে ভালোবাসে। একদিন তারা চুক্তি করেছিল, বড় হয়ে বিয়ে করবে।

সাদা নরুন পাড় শাড়ি পরে যে ভদ্রমহিলা তারে শাড়ি মেলছেন, তিনি জীবনে হেসেছেন খুবই কম। যতদিন স্বামী বেঁচেছিলেন, ততদিন শুধু গেল গেল করেছেন, আর করেছেন হলো না, হলো না। সমস্ত মানুষের জীবনকে তিনি আতঙ্কে রেখেছিলেন। সেই সব আতঙ্কিত মানুষেরা টপাটপ মরে গিয়ে পরম শান্তি পেয়েছেন। এই যে মহিলা শাড়ি মেলছেন, তিনি এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মহিলা কারণ তিনি নিজের মত ছাড়া পৃথিবীতে আর কারোর মত স্বীকার করেন না। নিজের মন ছাড়া, আর কারোর মনকে মন বলে মনেই করেন না। তিনি সব সময় সোজা পথ ছেড়ে, জটিল পথের চলাতেই অভ্যস্ত। সব ব্যাপারে নিজের মত খাটাতে গিয়ে এখন একেবারে নিঃসঙ্গ। মেয়েটি তাঁর নিজের মেয়ে নয়, কিন্তু মেয়ের মতো করে মানুষ করেছেন। মেয়েটি অসহায়। অনাথই বলা যায়। এক দাদা ছাড়া তার আর কেউ নেই। সেই দাদাও এখন হাসপাতালে। তার নানা অসুখ। একটা তেলেভজোর দোকান দিয়ে বেশ ভালোই চালাচ্ছিল। এখন তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যের হাতে। মেয়েটি সেই মহিলাকে ধরে ধরে খুব সাবধানে ঠাকুরঘরের দিকে নিয়ে চলেছে। কারণ সাংঘাতিক বাতে ভদ্রমহিলা প্রায় পঙ্গু। মেয়েটি এই মহিলাকে মায়ের

চেয়েও বেশি ভালোবাসে। মেয়েটিকে মহিলা প্রায় গ্রাস করে ফেলেছেন। মেয়েটি শৈশবেই অনাথ। মায়ের স্নেহের কাঙাল। তার ফলেই এত সহজ হয়েছে ব্যাপারটা। মহিলা মা হবেন, শাশুড়ী হতে ঘোরতর আপত্তি। মেয়েটি ছেলেটির বোন হয়ে থাকতে চায়, বউ হতে আর রাজি নয়। যত তার বয়স বাড়ছে, ততই তার মনের পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেটি এখন সর্ব অর্থে অসহায়। মায়ের সঙ্গে তার বাক্যালাপ বন্ধ। মেয়েটির কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। যখনই ভাবে মেয়েটি আর কারোর বউ হবে, ছেলেটির বুক ফেটে যায়। ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে।

প্রতিদিন গভীর রাতে এই বিচিত্র জীবনকাহিনী তিন-চার পাতা করে এগোতে লাগল। ঘণ্টা চারেক চেপে লেখাপড়া করি, ঘণ্টা তিনেক চুটিয়ে লিখি। আমাদের বাড়ির তিনতলার ছাদের সেই নির্জন ঘর। যে-ঘরে বাবার বকুনি খেয়ে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতুম, আর জ্যাঠামশাই চুপিচুপি এসে আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন, বাপি খাবে চলো। বাপ, মা, গুরুজনেরা ছেলেদের একটু বকেই থাকেন। লিখতে লিখতে দেখতুম পশ্চিম আকাশে তারামণ্ডল ঢলে পড়ছে। শেষ রাতের চাঁদ অসুস্থ মেয়েটির মতো ক্রমশই ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। বাতাস চরিত্র পরিবর্তন করে ভোরের শীতল-আমেজ মাখছে। প্যাঁচারা প্রাণখুলে ডেকে রাতকে বিদায় জানাচ্ছে। বিশু থাকলে পড়ে শোনাতুম। সে চলে গেছে রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। লিখতে লিখতে ভাবি তৃষা হয়তো আসবে। এসে বলবে, রাত ভোর হয়ে এল, এবার শুয়ে পড়ো! আসে না। হয়তো মায়ের ভয়ে, নয়তো সে আর আমাকে ভালোবাসে না। ভালোবাসা বড় ঠুনকো। ভীষণ ক্ষণিক। ভোরের শিশিরের মতো। রোদ উঠলেই বাষ্প হয়ে যায়। স্বার্থ হলো সেই রোদ।

এই কাহিনী আমারই কাহিনী। আমারই পথ চলা। আমি নিজেকে বি এ-তে ফার্স্ট ক্লার্স্ট করে দিলুম ইতিহাসে। তৃষাকে ঢুকিয়ে দিলুম ভালো একটা কলেজে। আর এক গুরু এনে মাকে দিয়ে দিলুম দীক্ষা।

মাকে চালিয়ে দিলুম ধর্মের পথে। সেইটাই হওয়া উচিত—যার কেহ নাই তুমি আছ তার। বাড়িতে বয়ে গেল ধর্মকর্মের জোয়ার। সত্যদার বয়েস আরও বাড়ল। পরের জন্যে বাঁচতে গিয়ে মানুষটির নিজের বলে আর রইল না কিছু। ঘরের দেয়ালে নোনা ধরেছে। গাদাগাদা বইয়ের ওপর ঝুরঝুর শব্দে দেয়াল ঝরে পড়ে সারা রাত। ওই হলো সময়। বালির ঘড়ি হয়ে ঝরছে। তারই মাঝে রাজার মতো বসে আছেন সত্যদা। কেবল বলছেন, দিন ছোট হয়ে আসছে, পড়েনি, আর একটু পড়েনি। বৃষ্টি এলে, ছাতা ধরেন উনুনে বসানো ভাতের হাঁড়ির মাথায়। থেকে থেকেই বলেন, দুঃখে যে হাসতে পারে সেই ধার্মিক। ছাত্ররা সারাদিন তাঁকে ঘিরে থাকে। তিনি বলেন, এরাই আমার বাহিনী। আমাদের লড়াই অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে। জ্ঞানই আমাদের ধর্ম। পনেরো দিনে আমার উপন্যাসের চরিত্ররা অনেকেই অনেক দূর এগিয়ে গেল। লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে নিজেকে বিধাতা বলেই মনে হয়। ঘটনার পর ঘটনা তৈরি করেছি, যেমন তিনি করেন। এই কাহিনীতে নিজের নাম রেখেছি মানব। মানবকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়েছি। একই বিভাগে পড়ে তৃষা। খুব শান্ত। ধীর। দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীর। কবিতার মতো। ধারালো মুখ। খাড়া নাক। অসম্ভব বড় বড় দুটো চোখ। যখন তাকায় মনে হয় আকাশে তাকিয়ে আছে। এষা আর তৃষা, শেষ উচ্চারণে একই রকম শোনায়। এষার দিকে তাকালে মানবের কবিতা আসে মনে। মনে হয় বহু পথ ধরে দুই পথিক হাঁটতে হাঁটতে আসছে, বহু অভিজ্ঞতা গায়ে মেখে। মানব তো আমিই। আমার মনও তো ঘুরছে। এক থেকে অন্যে। যে আগুনে ভাত রান্না হয়, সেই আগুনেই তো ডাল হয়, তরকারি হয়। জীবনের ঘটনাকে উপন্যাসে ঢুকিয়ে দিলুম। সেদিন কলকাতা ভেসে গেল বৃষ্টিতে। জলজমা সন্ধ্যার কলকাতার পথে গোলাপী ধোঁয়ার আঁচল উড়ছে। সব অচল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত ফুটপাথে এষা দাঁড়িয়ে, অদূরে মানব। হঠাৎ এষা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ কি করে ফিরবো?'

মানব বললে, 'আমিও ঠিক ওই একই কথা তখন থেকে ভাবছি, তুমি কি করে ফিরবে?'

'তুমি আমার কথা ভাবছ? নিজের কথা ভাবছ না?'

'আমার গুরু নিজের কথা ভাবতে শেখাননি।'

'কে তোমার গুরু? কোন আশ্রমে থাকেন?'

'কোনও আশ্রম নয়। ভুবন দত্ত লেনের নোনাধরা একটা ঘরে।'

'সেটা কোথায়?'

'উত্তর কলকাতায়, আমার পাড়ায়।'

'তাহলে তুমি এই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি তো যাবে উত্তরে!'

'তোমার জন্যে। তুমি যেতে পারলে কিনা, নিশ্চিত হয়ে তবেই তো আমি যেতে পারি।'

এষা অনেকটা কাছে সরে এলো, 'মানব, তোমার সঙ্গে তো আমার তেমন পরিচয় নেই। আজই বোধহয় প্রথম এত কথা? তুমি আমার জন্যে এতটা ভাবো!'

'অনেকেই অনেকের জন্যে ভাবে। কখনও জানা যায়, কখনও জানা যায় না। আজ একটা জানাজানি হয়ে গেল।'

'আমার কাছে এ এক বিরাট আবিষ্কার।'

'এ আবিষ্কারে মানুষের কোনও উপকার হবে না।'

'আমার হবে। তোমার কথা আমিও মাঝে মাঝে ভেবেছি।'

'কেন?'

'পৃথিবীর প্রায় সব কেন-র জবাব আছে—দুটো কেন-র কোনও জবাব নেই। প্রথম কেন-মানুষ কেন আসে? দ্বিতীয় কেন-কেন একজন আরেকজনকে ভাবে?'

'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কি ভাবে? সে যে অনেক দূর। হাঁটা তো যাবে না। আমি কি ভাবছি জানো, আমার বাবা অন্ধ। বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে ছাড়া

দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। তাই আমার ভেতরটা ছটফট করছে।'
'চলো, কিছুটা হেঁটে ধর্মতলা পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে যা হয় একটা কিছু ধরা যাবে।'
'তোমার দূরত্ব যে বেড়ে যাবে। তারপর তুমি কি করে ফিরবে?'
'শোনো, তোমাকে ফেরাতে পারলে, তোমার ফেরার ভাবনাটা আমার মন থেকে নেমে যাবে, আমি তখন পাখির মতো হালকা। নির্ভার।'
মানব আর এষা হাঁটছে। থই থই জল। বিকল সব গাড়ি। ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে গেছে সার সার ট্রাম। মানব আর এষা একটা দোকানে মুখোমুখি বসে, দু'কাপ কফি খেয়ে নিল। পরিচয়টা হঠাৎ খুব ঘন হয়ে উঠল। সেই রাতটা মানবের কেটে গেল এষাদের বাড়িতে। এষার বাবা ছিলেন আর্মি অফিসার। যুদ্ধে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। এষার মা মারা গেছেন, এষা যখন খুব ছোট।
গভীর রাতে সেই ছাদের ঘরে বসে লিখতে লিখতে মনে হলো, এষা তো সত্যিই আছে; কিন্তু কবে আসবে সেই ঝড় জলের রাত। সত্যদা বলেছেন, জীবনের সব ঘটনা ঘটে আছে, আমরা সেইসব ঘটনার ভেতর দিয়ে চলতে থাকি। মহাপুরুষরা দেখতে পান, আমরা সাধারণ মানুষরা এক সময়ে বসে আগামী সময়ের কিছুই দেখতে পাই না। খালি চোখ আর দূরবীণে যা তফাত।
মানব এম, এ-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হবে। মানব ডক্টরেট করবে। মানব অধ্যাপনার চাকরি পাবে। আর তৃষার সঙ্গে বিয়ে হবে ইঞ্জিনিয়ার বিশুর। এই জায়গায় এসে থমকে গেলুম। বিশুর সঙ্গে বিয়ে হবে কেন? কেন মনে হচ্ছে। বিশুকে আমি দেখেছি, এই বাড়িতে যখন আসত, তৃষার দিকে যেন তার নজর ছিল। বিশু ইঞ্জিনিয়ার হবে। অনেক বড় চাকরি করবে। গাড়ি হবে, বাড়ি হবে। বিশাল প্রতিপত্তি হবে তার। মধ্যবিত্ত জীবনের যত প্রচলিত বিশ্বাস ও আদর্শ সব তার কাছে হয়ে যাবে মৃত। বিশু বদলে যাবে। বিশু তৃষাকে চাইবে তার রূপের জন্যে। আর বিশুকে চাইবেন আমার মা।

একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—কোথাও কোনও এক পাহাড়ী জায়গা। সাদা দুধের মতো একটা বাড়ি। সবুজ একটা লন। ঝকঝকে এক হুইল-চেয়ার, সাদা এক মাথা চুল, এক বৃদ্ধা! চোখে সোনালী চশমা। চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসছে, দীর্ঘ, ধারালো, চেহারার এক তরুণী। নীল শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ছে, খাটো চুল দুলছে কাঁধের কাছে। কে? আমার মা, আর এষা। তার মানে, মানব এষাকে বিয়ে করেছে। বেড়াতে গেছে পাহাড়ে। সংসারে সুখ ফিরে এসেছে। প্রাচীনকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যবিত্ত সুখ।
সত্যদা বললেন, শেষটা বদলাও। ওটা তোমার জীবনের ঘটনা নয়। তোমার জীবন চলে যাবে পাশ ঘেঁষে। তোমার আর আমার জীবন এক সুরে বাঁধা। আমাদের সব থেকেও কিছু থাকবে না। আমার এই নোনাধরা মসনদের তুমিই উত্তরাধিকারী। সংসার আমাদের দয়া করে ক্ষমা করেছে। তাই অসুখী হয়েও আমরা সুখী। আমরা জ্ঞানী-ভিখারী, ফেরিওলা। আমরা শেষ মাইলপোস্টে যাবো অন্য পথে। অন্য ভাবে।
আমার উপন্যাস ছাপা হলো পূজা সংখ্যায়! সুদর্শনবাবু বললেন, পেরেছো জ্ঞানদাস। তুমি পেরেছো। সত্যদা বললেন, দায়িত্ব বাড়ল। যতটা এসেছ, এসেছ, বাকিটার সঙ্গে জীবন মেলাও। কাঁটায় কাঁটায়।

সুন্দরী লেন

'এত রাত হল ?'

'রোজই তোমাকে এক কৈফিয়ত দিতে আমার ভাল লাগে না। আমি পারব না দিতে।'

শেষ কথাটা যতটা সম্ভব কর্কশ গলায় বললে শিখা। পাশের বাড়ির ঘড়িতে রাত বারোটা বাজছে। সারা পাড়া নিস্তব্ধ। একটু আগে রাতের শান্তি ইঞ্জিনের শব্দে, হেডলাইটের রেখায় চিরে দিয়ে গেছে একটা ট্যাক্সি। আবার ধীরে ধীরে অন্ধকার জোড়া লেগে এসেছে। অন্ধকারে এর ওর রকে শুয়ে থাকা গোটা কয়েক ধামসা কুকুর মাঝে মাঝে গুমরে উঠছে। অন্ধকারের শূন্যতায় সময় সময় ওরা প্রেতের উপস্থিতি টের পায়।

উত্তর কলকাতার বুকের ওপর পড়ে আছে এক চিলতে লাজুক গলি। মোটেই সুন্দর নয়। তবু কোথায় এক জায়গায় রসিকতা করে নাম লিখে রাখা হয়েছে সুন্দরী লেন। বাবু কলকতার রমরমার দিনে এই গলি যেখানে বাঁক নিয়ে বিডন স্ট্রিটে পড়ছে, সেই বাঁকের মুখে বিশাল এক বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে বসবাস করতেন সুন্দরীদাসী নামে এক বদান্য মহিলা। দান, ধ্যান, পূজাপাঠ, হরিনাম সংকীর্তন, মন্দির প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র-সেবা ইত্যাদি পুণ্যকর্মের অক্ষয় দ্যুতি রেখে শতাব্দীর প্রথম দিকেই বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। প্রথম জীবনে সেকালের কোনও এক উদার বাবুর রক্ষিতা ছিলেন। তিনিই তাঁর প্রাণের মানুষটিকে এই ইমারত উপহার দিয়েছিলেন। তখন এই অঞ্চলে এত বাড়িঘর ছিল না। গোটা তিন বাগান বাড়ি ছিল। সে সব এখন আর নেই। মাঠময়দান করে খুপরি খুপরি বাড়ি হয়েছে। গায়ে গায়ে। আলো ঢোকে না। বাতাস ঢোকে না। সেই বিশাল

ইমারতের লাগোয়া রাধামাধবের মন্দিরটি আজও আছে। টিংটিং করে আরতি হয়। সেবিকা মধ্যবয়সী একজন মহিলা। মহিলার অতীত নেই। বর্তমানে রাধামাধবের পদাশ্রিতা। এই মন্দিরের এক পাশেই সেবিকার বসবাসের ব্যবস্থা।

শিখা প্রথমে ডান পা, তুলে ডান পায়ের উঁচু হিল জুতো উঁচু র‍্যাকে রাখল। একটা চেয়ারে বসে রুদ্র শিখাকে লক্ষ্য করছে। বাঁ পায়ের ওপর ভর রেখে বাঁ হাতে ঘরের দরজার ফ্রেম ধরে শরীরের টাল সামলাচ্ছে। ডান পাটা উঁচু করার সময় বাঁ পায়ের ওপর শায়া সমেত শাড়ির অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। ধবধবে সাদা পা বেরিয়ে পড়েছে। সুন্দর সুগঠিত পা। যে পা বাজনার তালে তালে রাতের পর রাত মঞ্চে নাচে। পায়ের ওপর যে দেহকাণ্ডটি সেটি নানা ছন্দে দোলে, দোমড়ায় মোচড়ায়। ডান পা নামিয়ে শিখা বাঁ পা তুললো জুতো রাখার জন্যে। মেঝেতে শক্ত কাঠের গোড়ালির খট-খট শব্দ হল! আজ চার পাঁচ বছর হল এই দেহ আর এই মনের সঙ্গে রুদ্র ভীষণ পরিচিত। তবু শিখার এইভাবে জুতো রাখার ভঙ্গীতে রুদ্র কাবু হয়ে গেল বুকের আঁচল বসে গেছে একপাশে। একটা তোলা থাকায় পাতলা ব্লাউজের আবরণ ভেদ করে একপাশের বুক বিদ্রোহী হতে চাইছে। ভরাট কাঁধে টান টান হয়ে আছে ভেতরের জামার ফিতে। রুদ্র জানে শরীরটাকে শিখা খুব যত্নে রাখে। শরীরটাই তার নেশা। রোজ সকালে ঘণ্টা দুই ব্যায়াম করে। আসন, ফ্রি হ্যাণ্ড, দোমড়ানো, মোচড়ানো। মাঝে মাঝে কোমর আর নিতম্বের মাপ নেয়, ওজন নেয়। মুখের জন্যে আবার বিশেষ পরিচর্যার ব্যবস্থা। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, গোলাপ জল, নানা রকমের প্রলেপ। হরেক রকম দেশী-বিদেশী বইয়ের দামী দামী উপদেশ।

শিখা ঘরে এসে টেবিলের সামনে আয়নার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে কান থেকে পাথরের দুল খুলছে একে একে। মুখটা একবার ডান দিকে ফিরল, একবার বাঁ দিকে। রুদ্র একই মুখ দুটো

দেখছে। একবার আসল মুখ আর আয়নায় তার প্রতিফলন। একটা সোজা দিক আর একটা উল্টো দিক। ধারালো সুন্দর মুখ। টানা টানা চোখ। সব সময় একটু রাগী রাগী। যখন হাসে তখনও যেন উদাস ভাব। ভেতরে এমন একটা কঠিন প্রাণী আছে যে ভাঙে না, গলে না, টলে না। সমর্পণ জানে না। নিবেদন জানে না। শিখার দেহের ওপর সব কিছু খেলা করে এক সময় ক্লান্ত হয়ে তারা নিজেরাই সরে পড়ে। উদাসীনতা যেন শিখাব হাত ধরা। রুদ্র লক্ষ্য করেছে, একমাত্র শিখা যখন নিজেকে নিয়ে নিজের শরীরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তার মুখে কোমল ছায়া ঘন হয়ে আসে। দৃষ্টিতে প্রেম আসে। হাতের আঙুল দেখছে। পায়ের গোড়ালিতে পাথর ঘষছে। বুকের খাঁজে তোয়ালে চেপে ধরছে. চুল উঁচু করে ঘাড় মুছছে। চোখে সরু করে কাজল টানছে. আড়াল থেকে দেখেছে রুদ্র, তখন তাকে প্রেমিক বলেই মনে হয়। চোখের মণিতে হাসির ঝিলিক।

শিখা ঘরে এসেছে। গুনগুন করে গান গাইছে। ঘরের বাতাসে ভাসছে দামী বিলিতি সুবাস। শিখাকে দেখে রুদ্রর মনে হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি প্লাস্টার অফ প্যারিসের একটি ভাস্কর্য নীল সিল্কের শাড়ি পরে এই মধ্যরাতে মধ্য উত্তর কলকাতার একটি ফ্ল্যাটে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রুদ্রর হিংসে হচ্ছে। ঘৃণা হচ্ছে। আবার ভীষণ ভাবে কাছে পেতেও ইচ্ছে করছে। বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে যেভাবে পেয়েছিল কয়েক বছর। এখন আর উপায় নেই। দিন বদলে গেছে। প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। অনেক বড় উমেদার জুটে গেছে এখন। আম কাটলে বা কাঁঠাল ছাড়ালে যে ভাবে নীল নীল ডুমো ডুমো মাছি ছেঁকে ধরে শিখার এখন সেই অবস্থা।

রুদ্র জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কে ছিল সঙ্গে?'

শিখার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'কেউ একজন ছিল নিশ্চয়।'

ভালো ভাবে কথার উত্তর দিতে পারো না?'

'না পারি না।'

'দিন দিন খুব বেড়ে যাচ্ছো তুমি।'

'দিন দিন সব কিছুই বাড়ে। গাছ বাড়ে। বয়েস বাড়ে। লোক বাড়ে।'

'আজ খেয়েচো।'

'খেয়েচি।'

'কতটা?'

'ঠিক ততটা যতটায় গা গরম হয়।'

রুদ্র চিৎকার করে উঠল, 'শিখা।'

শিখা ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'ওঘরে যাও। আমি কাপড় ছাড়বো।'

'কেন, আমার সামনে লজ্জা করছে?'

'লজ্জা নয়। তোমাকে আনন্দ দেবার সামান্যতম ইচ্ছা আমার নেই। তুমি পাশের ঘরে যাও।'

'যে হাজারখানেক দর্শকের সামনে উলঙ্গ হতে পারে সে আমার সামনেও পারবে।'

'মুখ সামলে কথা বলবে।'

'এতদিন হাত আর পা সামলে রেখেছিলুম, এবার সেটাও চলবে।'

'চালিয়ে দেখতে পারো।'

রুদ্র ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললে, 'চরিত্রহীন।'

শিখা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'নপুংসক।'

একটা বড় ঘর, একটা বসার ঘর ছোট মতো, রান্নাঘর আর তার সঙ্গেই চৌকো মতো একটা জায়গা যেটাকে ইংরেজীতে ডাইনিং স্পেস বলে বাড়িঅলা গৌরব বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। বসার ঘরে তিনটে কোচ একটা সেণ্টার টেবিল। টেবিলের তলায় দুহাত বাই তিন হাত মাপের এক চিলতে কার্পেট। সংসারে শান্তি না থাক ঘর সাজাবার কেতায় যেন ত্রুটি না থাকে। আধুনিক জীবনের এই হল ধরন। রুদ্র একটা কোচে বসে পা দুটো জোড়া করে সামনের সেণ্টার টেবিলের

ওপর টানটান করে ছড়িয়ে দিল। কি একটা ম্যাগাজিন ছিল নিচে মুখ থুবড়ে পড়ল। রুদ্র গ্রাহ্যই করল না। দুকান দিয়ে উত্তাপ বেরোচ্ছে তার। শিখা আজকাল সুযোগ পেলেই পুরুষত্বের খোঁটা দেয়। ব্যঙ্গ করে পৌরুষ নিয়ে। এ এক নতুন কায়দা। অপদস্থ করার নতুন পদ্ধতি। মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন। এই একটা জায়গায় রুদ্র হেরে যায়। শিখার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। প্রেমিক রুদ্র ডাকাত হতে পারে না। তার ভেতরে একটা মেয়েলী ভাব আছে। নরম, কোমল। কথা বলে ধীরে। মানুষের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে পারে না। শিখা এক সময় তাকে ভালবেসেছিল এই সব গুণের জন্যেই। বলতো তোমার মুখটা কি মিষ্টি। চোখ দুটো কি সুন্দর। কোন পাপ নেই। সেই সব দিন কোথায় চলে গেল। কত তাড়াতাড়ি সব বদলে যায়। দিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনটাও কোথায় চলে যায়।

রুদ্র শুনতে পাচ্ছে শিখা বাথরুমে ঢুকেছে। জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। তখন থেকেই কি একটা গান গাইছে গুনগুন করে। আজ ভীষণ ফুর্তিতে আছে। পয়সাঅলা প্রোডিউসার ধরেছে। মঞ্চ থেকে বাঙলা ফিল্ম। বাঙলা থেকে হিন্দি। স্বপ্ন দেখছে শিখা। টাকা থাকলে অনেককে স্বপ্ন দেখানো যায়। রুদ্রর পয়সা থাকলে রুদ্রও দেখাতে পারত। তবে শিখাকে নয়, অন্য কাউকে। স্বামী-স্ত্রী, মা মেয়ে, বাপ ছেলে, পৃথিবীতে এই ধরনের কিছু সম্পর্ক আছে যার চেয়ে তিক্ত সম্পর্ক আর নেই। খুব কাছের অথচ গরলে ভরা!

শিখা বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। ওপাশ থেকে বহু রকমের খুটখাট শব্দ ভেসে আসছে। শিখা ভুলেও একবার এ-ঘরে আসছে না। শোবার ঘরের দরজা বন্ধের শব্দ হল। রুদ্র উঠে দাঁড়াল। অসহ্য। অসহনীয় ব্যাপার। ভেবেছে কি?

ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। পায়ের পাতায় আর গোড়ালিতে ক্রিম ঘষছে শিখা। সংক্ষিপ্ত বেশবাস। অন্য সময় হলে, দু'বছর আগে

হলেও রুদ্র কি করত বলা শক্ত। তবে ঘরের আলো হয়তো নিবে যেত। একটা ছুটোপাটির শব্দ। মাঝে মাঝে খিল খিল হাসি। আদরের তিরস্কার—আঃ কি হচ্ছে।

শিখার এই সব ভাবভঙ্গী আর ছলাকলা তার আর ভালো লাগে না। যখন প্রেম ছিল, ভালবাসা ছিল তখন শিখার সব কিছু ভালো লাগত। তার তাকানো, কথায় কথায় মাইরি বলা আচমকা পিঠে চড় মারার অভ্যাস। রুদ্র হয়তো চিঠি লিখছে আচমকা এসে হাত নাড়িয়ে দিয়ে খিল খিল হাসি পিঠের ওপর ঝুলে পড়ে কুট করে কান কামড়ে দেওয়া।

রুদ্র বললে, 'কি হল? খাওয়া দাওয়া হবে না?'

গুনগুন গানের ফাঁকে শিখা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে।'

'অ, তোমার হলেই হয়ে গেল, আমার কি হবে?'

'খেয়ে নাও। মনুর মা তো সব চাপা দিয়েই রেখে গেছে'

'সব তো ঠাণ্ডা জল।'

'গ্যাস আছে। জ্বেলে গরম করে নাও। তোমার তো পক্ষাঘাত হয়নি।'

'কি ভাবে কথা বলছ শিখা?'

'তোমার সঙ্গে এর চেয়ে ভালোভাবে কথা বলা যায় না'

'আমি এতই ঘৃণ্য!'

'অনেকটা কেঁচোর মতো'

'তুমি কি চাইছ শিখা?'

'তোমার ভাষায় একটু বেশি রকম উড়তে চাইছি হয়েছে? উত্তর পেয়েছ! যাও এখন নিজের জায়গায় যাও আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমার ঘুম পেয়েছে।'

শিখা মাথার ওপর দু'হাত তুলে শরীর মুচড়ে হাই তুলল। ইচ্ছে করে এমন একটা ভঙ্গী করল যাতে রুদ্রর শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে।

শিখা আজকাল এই রকম করে। রুদ্র যাতে দগ্ধে দগ্ধে মরে। ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যায়। অপমানে কুঁকড়ে থাকে। সেই দিনগুলোর কথা শিখার মন থেকে মুছে যাওয়া শক্ত। নিজের উন্নতির জন্যে, তরতর প্রোমোশানের জন্যে রুদ্র শিখাকে বহুবার টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। অফিসের বড়কর্তাকে বাড়িতে ডেকে এনে কাজের অছিলায় নিজে সরে পড়ত। খুব সোজা হিসেব। কত নোংরামিই না শিখাকে সহ্য করতে হয়েছে। তখন বড় অসহায় ছিল। আজ আর সেদিন নেই। আজ সে ওই নীচ, নোংরা লোকটাকে লাথি মারতে পারে। নোংরা ব্যাধিতে ভুগছে। দেহের ক্ষিদে দিন দিন বাড়ছে। মেটাবার ক্ষমতা নেই। শয়তান। শয়তান এখন সতীপনার উপদেশ দিতে আসে। চাকরি বাকরি সব খুইয়ে বসে আছে। চারশো বিশ করে দু'একশো রোজগার ক'রে। মাঝে মাঝে অপমানিত হয়, ঝাড় খায়। রুদ্রই তাকে খেলতে শিখিয়েছে। খেলাতে শিখিয়েছে। বহু পুরুষকেই সে খেলায়, রুদ্র তাদের মধ্যে একজন। আয়নার দিকে ঘুরে বসে শিখা বুকে পাউডার ছড়াতে লাগল। রুদ্র কুকুরের মতো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুক। চেনে বাঁধা কুকুর। লোকটা এত বড় পাজি শিখাকে বিয়ের পর মা-বাবাকে ভুলে গেল। ছেড়ে চলে এল। মা যখন মৃত্যুশয্যায় রুদ্র তখন শিখাকে নিয়ে গোপালপুরে ফুর্তি করছে। বৃদ্ধা যখন মারা যাচ্ছেন রুদ্র তখন প্রচণ্ড মদ্যপান করে শিখার নগ্ন বুকে মুখ ঘষছে। বৃদ্ধ পিতা এখনও জীবিত। রুদ্র ভুলেও সেপথ মাড়ায় না।

রুদ্র শিখাকে আয়নায় দেখতে দেখতে বললে, 'আজও তুমি খেয়েছ ?'

'কেন আজ ড্রাই ডে না কি ?'

রুদ্র প্রচণ্ড ধমক দিল, 'শিখা।'

শিখা সুর করে বললে, 'বাবা বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর।'

'তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।'

'এক সময় তুমিই তো আমার মাত্রা ঠিক করে দিয়েছিলে গুরু। দুটো

বড়, অ্যাণ্ড ইউ লুক ভেরি সেক্সি। সেইটাই সামান্য একটু বেড়েছে। কখনও তিন, কখনও চার অ্যাণ্ড আই লুক মোর সেক্সি। এ বিট মোর সেক্সি। আমার গাল গোলাপী হয়। আমার দেহ জ্বলতে থাকে ফসফরাসের মতো। ওরা তাই বলে গো। একটু আগে শক্তি আমার ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে তাই বলছিল। বলছিল অ্যামেরিকায় জন্মালে আমি মেরিলিন মনরো হতে পারতুম।'

রুদ্র গর্জন করে উঠল, 'কে শক্তি?'

'ওমা! শক্তিকে চেন না। সাতটা হিট ছবির প্রডিউসার। শক্তি আমাকে নায়িকা করবে।'

'আমি তাকে খুন করবো।'

'খুন করবে? আহা বাছারে! জেলে যাবার শখ হয়েছে গোপালের।'

শিখাকে মারবার জন্যে রুদ্র তেড়ে গিয়েছিল। মাঝপথেই থেমে যেতে হল। হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। চোখে অন্ধকার দেখছে। বিন বিন করে ঘাম বেরোচ্ছে। জিভ আর গলা শুকিয়ে কাঠ। চেয়ারের পেছন ধরে সামলে নিল। সেই অবস্থাতেই শুনতে পেল শিখা বলছে, 'আমার মতো রোজ রাতে তোমার পার্টির পয়সায় একটু করে স্কচ খাও না গো, সঙ্গে চিকেন তন্দুর। তুমি তো লাইসেন্স পাইয়ে দিতে পারো। কত রকমের লাইসেন্স। সিমেণ্টের, লোহার, মদের দোকানের, গাড়ির, মেয়েছেলে নাচাবার, তোমার অভাব কিসের!'

রুদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে একপা একপা করে দরজার দিকে এগোচ্ছে। চোখের সামনে সবই ঝাপসা। তারই মধ্যে দেখছে শিখা শরীরের সব কিছু খুলে ফেলেছে। কানে আসছে চটুল কণ্ঠ—'কাম, কাম মাই ডারলিং, কাম, আই অ্যাম রেডি।'

রুদ্রর মাঝে মাঝে মনে হয়, একদিন গলা টিপে শেষ করে দেয়। যখন জেগে থাকে তখন সম্ভব হবে না। বাইরে থেকে শরীর স্বাস্থ্য দেখলে মনে হবে না রুদ্র অসুস্থ। ভেতরটা একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে। গেছে নিজের দোষে। মদ, সিগারেট, অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা। স্নায়ু বলে

আর কিছু নেই। একটু উত্তেজিত হলেই কাঁপতে থাকে থরথর করে। ইসিজি করিয়েছিল হার্টের অবস্থা শোচনীয়। রক্তে চিনি এসেছে। শিখা যখন ঘুম আর অ্যালকোহলে বেহুঁশ থাকে সেই সময় খুব সহজেই করা যায়; কিন্তু নিদ্রিত শিখা এমনই লোভনীয় এমনই আকর্ষণীয়, তাকালেই থমকে দাঁড়াতে হয়। মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাগানে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাস্করের হাতে খোদাই করা, স্নানরতা ভেনাস, ক্লান্ত হয়ে পাথরের বেদী থেকে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

ও ঘরের আলো নিবে গেল। জোর শব্দে দরজা বন্ধ হল। ঘরের নয়, যেন মনের দরজা বন্ধ হল। সেই শিখা আর এই শিখা! রুদ্র ভাবে, কি ভাবে দিন বদলায়! চরিত্র বদলায়। শিখাকে তো সে পাপের জগৎ থেকেই তুলে এনেছিল ভালোবাসা দিয়ে। গাঁট ছড়া বেঁধে নিয়ে এসেছিল প্রথমে গগন হালদার লেনের বাড়িতে। কে না জানে উন্নতির জন্যে ক্ষমতাশালী মানুষকে কিছু না কিছু দিতে হয়। খোদ ঈশ্বর ওই আকাশে তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর বহর নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করছেন। মন্দিরে মন্দিরে তাঁর চৌকি। পেলা দাও, মানত করো মাথা ঠোকো, উপোস করো, তবে যদি তিনি সন্তুষ্ট হন। ক্ষমতাশালী মানুষ হল নিজের নিজের এলাকার ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্যে পুজো তো দিতেই হবে। যে পুজোর যে নৈবেদ্য। কোথাও মদ। কোথাও অর্থ। কোথাও একটু নারীসঙ্গ। কাজ বাগাবার জন্যে যাকে যা দেবার তা দিতে হয়।

কেন? তুমি জানো না! ওই যে অত বড় চিত্রাভিনেত্রী, প্রতি ছবিতে যিনি এখন পনের লাখ টাকা ফি নেন, সেই অভিনেত্রী প্রথম কয়েক বছর কার রক্ষিতা ছিলেন? তুমি জানো না! তুমি পড়ো নি ফিল্ম ম্যাগাজিনে। এখন তিনি বিরাট মহিলা। দেশে বিদেশে নাম। প্লেনে চেপে লণ্ডন। রয়াল অ্যালবার্ট হলে এ দেশের প্রতিনিধি হয়ে ভারতীয় কনসার্টের উদ্বোধন করছেন। এখন তাঁর কি ভীষণ দাপট। কে আর বলতে সাহস পায়, আপনি তো এক সময় ইয়ে ছিলেন।

রুদ্র উত্তেজনায় উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে। ঘরে পায়চারি করছে। প্রথম যখন সরকারী চাকরীতে বহাল হতে গেলুম, বললে ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে হবে। কি রকম পরীক্ষা। সরকারী সার্জেন একহারে প্রায় উলঙ্গই করে ছাড়লে। নিয়ম। প্রথা। পেণ্ট নামাও বলায়, আমি প্রতিবাদ করেছিলুম শিখা। পেণ্ট নামাবো মানে? বুড়ো ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, হয় যা বলছি তাই করুন নয় তো সরে পড়ুন। এই চাকরিতে ঢোকার আগে পেণ্ট খুলতেই হবে মশাই। আপনার পিতাও খুলেছিলেন! আপনার পুত্রকেও খুলতে হবে।
ওই যে সরল সরকার; সামান্য মেট্রিক পাশ করে আজ কত বড় চাকরি করছে। গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যায়। কি সুন্দর বাড়ি করেছে। চামরী গাইয়ের মতো বউ। কি করে হয়েছে তুমি জান না শিখা! পাড়ার সবাই জানে। সরল সরকারের বউই সরল সরকারের লক্ষ্মী। সবাই জানে সে কাহিনী। তুমিও জানো। সরলের বউ একদিন সরলের অফিসে গিয়েছিল স্বামীর খোঁজে। খবর পাঠিয়ে বসে আছে ভিজিটার্স রুমে। এমন সময় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্মল সেনগুপ্ত রিসেপসানিস্টকে বোর্ডে না পেয়ে ফায়ার করার জন্যে তেড়ে বেরিয়ে এলেন নিজের বাতানুকুল অনুপম প্রকোষ্ঠ ছেড়ে। রিসেপসানে ঢুকে সরলের বউকে একা বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'হোয়্যার ইজ শি?' সরলের বউ সঠিক কোনও উত্তর দিতে না পারলেও সাহস করে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বললে, 'অ্যাজ শি ইজ ক্যারিং, শি হ্যাজ গন টু ভমিট।'
সেনগুপ্তর চোখ কান দুটোই জুড়িয়ে গেল। সরলের বউয়ের তখন ভীষণ চটক।
সেনগুপ্ত নরম গলায় বললে, 'হু আর ইউ?'
'সরলস ওয়াইফ।'
ব্যাস জিনিসটা সেই দিনই জমে গেল। রিসেপসান থেকে সোজা বড় কত্তার চেম্বারে। সেখান থেকে বার, রেস্তোরাঁ, বার ঘুরতে ঘুরতে সোজা

হোটেলে। হোটেলে নানারকম দুরূহ ইণ্টারভিউএর পর 'সরলস ওয়াইফ' সায়েবের পিএ। একটু বেশী খাওয়া দাওয়ার ফলে শরীরটা ইদানীং আরব রমণীদের মতো হয়েছে। তা হোক। প্রথমে সেনগুপ্ত কব্জা করেছিল এখন মহিলা সেনগুপ্তকে কব্জা করেছে। আহা, এই তো দুনিয়ার নিয়ম। গিভ অ্যাণ্ড টেক। প্রথমে মানুষ মদ ধরে তারপর মদে মানুষ ধরে। সরলের বউও চালাক, সরলও উদার। যেভাবেই হোক আমাদের বাঁচতে হবে। এ বাজারে পয়সা ছাড়া বাঁচা যায় না। তুমিও জানো, আমিও জানি। সেই তো নিজের স্বার্থে তোমাকে শরীর ভাঙাতে হল। আমাদের দুজনের স্বার্থে যখন একটা আধবুড়োকে খেলাতে বললুম তখন এমন সতীপনা করলে পুরো পরিকল্পনাটা তো কেঁচে গেলই, আমারও বারোটা বেজে গেল।

রুদ্র এত কথা একসঙ্গে কখনও ভাবতে পারে না। ইদানীং পারছে। শিখা তার সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি ওই এক ইম্প্রেসারিও দিনের পর দিন চোখের সামনে একটু একটু করে ভোগ করবে আর রুদ্র সব শেষে ছিবড়েটি কোলে নিয়ে, হরি দিন তো গেল করবে, তা হয় না। তা হতে পারে না। শিখাকে একদিন বলেছিল, বেবিয়ে যাও। শিখা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, বেরোতে হয়, তুমি বেরোও। এ ফ্ল্যাট আমার। আমি ভাড়া দি।

এক বিছানায় বহুকাল শোয় না দু'জনে। সেই দিন শেষ উঠে চলে এসেছিল রুদ্র, যেদিন শিখা পা দিয়ে ঠেলে তার পা সরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, তুমি কাছে এলে আমার গা ঘিন ঘিন করে। মনে হয় গায়ের ওপর একটা গিরগিটি চলে বেড়াচ্ছে।

রুদ্র বলেছিল, তুমি আমার বউ, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমাকে লাথি মারছ, লাথি মেরে সরিয়ে দিতে চাইছ।

শিখা সেদিন একটু বেশী ঘোরে ছিল। বলেছিল আমার লাথির দাম জানো। কলকাতায় এমন লোক আছে যে আমার এক একটা লাথির জন্যে হাজার টাকা দেবে। বেশী স্বামীগিরি ফলাতে এসো না। নিচে

নেমে শোও। তোমার ওই আদর টাদর অসহ্য লাগে। তোমাদের মতো ঘেয়ো পুরুষদের জন্যে তো পাড়া আছে। পাঁচ টাকা, পাঁচশো টাকা সবরকমই পাবে।

রুদ্র সেই থেকে বিছানা আলাদা করে নিয়েছে।

রুদ্র হঠাৎ হেসে ফেলল। সামান্য একটা মেয়েছেলের জন্যে সে কি-না করেছে। মাকে মেরেছে। বাপকে ছেড়েছে। ভাইকে তাড়িয়েছে। অসৎ উপার্জনে উপহার কিনেছে। আর দিনের পর দিন দিওয়ানা হয়ে ঘুরেছে। ঘুরছে। না আর নয়। রুদ্র উঠে পড়ল। খিদে পেয়েছে, খেতে হবে এখন।

শিখা সংসার টংসার দেখা অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছে। রান্নাঘরের চেহারা দেখলে কান্না পায়। এলোমেলো। অগোছালো। সব ওলট-পালট। ইঁদুর ছুটছে। টিকটিকি ঘুরছে থালার ওপর। বিশ্রী একটা আঁশটে গন্ধ ভেপসে আছে বন্ধ ঘরে। কে বলেছিলেন—সুন্দর শরীরে সুন্দর মন বাস করে। ভুল। সম্পূর্ণ ভুল কথা।

রুদ্র একটা জানলা খুলে দিলো। নিচেই সুন্দরী লেন, অন্ধকারে পাক খেতে খেতে চলে গেছে আরও অন্ধকারে মাতাল পথিকের মতো। দূরে শ্যামসুন্দরের মন্দির। মিটি মিটি আলো জ্বলছে এখনও। রুদ্র পথের দিকে, প্রায় ভেঙে পড়া মন্দিরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপ-চাপ। মায়ের কথা মনে পড়ছে। শৈশব থেকে যৌবন, কত উৎপাত সহ্য করে গেছেন মহিলা। বাবাকে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে, পুরনো রঙচটা একটা ছাতা বগলে, বাড়ি বাড়ি টিউশানি করে ফিরছেন বৃদ্ধ। সেই বয়েস, যে বয়েসে মানুষ ছেলের রোজগারে সামান্য শাকান্ন খেয়ে, শান্তিতে ভগবত চিন্তায় জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখে। ভাইটা ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছে।

সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটা। আর দায়ী তার কাম। তার লোভ। তার ভোগবাসনা। রুদ্র ফিরে তাকাল ঘরের দিকে। সে একটা লেংটি ইঁদুর। ধরা পড়েছে শিখার ইঁদুর কলে। এই কল থেকে

বেরোতে হবে মনের জোরে। শিখাকে সে মারতে পারবে না। শিখাকে সে ছাড়তেও পারবে না। এরই নাম কি ভালবাসা।

রুদ্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সামনে একটা ফালি টেবিল।। এলোমেলো বাসপত্তর। টেবিলের তলায় একটা কেরোসিনের টিন। আজ কি বার। কত সাল। রুদ্র খেয়াল করার চেষ্টা করল। বছর কি রকম ঘন, পোড়া মোবিলের মতো একটু একটু করে গড়াচ্ছে। আর কি কিছু হবে। ফিরে আসবে জীবনে সুখের দিন। অমলিন শৈশব। স্বপ্ন দেখার কৈশোর। প্রেমের যৌবন।

কে এক নিশাচর বিশ্রী রকম কাশতে কাশতে চলে গেল। দূর থেকে তার ভীষণ কাশির শব্দ ভেসে আসছে এখনও। একটু পরেই আবার সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে সরু তারের মত ফিনফিনে বাতাস ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে। একটা সসপ্যানের ওপর ইঁদুর উঠেছিল। প্যানটা নেচে উঠল। অদৃশ্য কোণ থেকে একটা টিকটিকি কিটকিট করে উঠল।

সুন্দরী লেন এখন একেবারেই অচৈতন্য। গভীর, গভীর নিদ্রায়। এমন কি আজ কুকুরগুলোও ডাকতে ভয় পাচ্ছে। রাধামাধব মন্দিরের টিমটিমে আলোটাও নিবে গেছে। সেবিকা সামনের রকে একটুকরো তেরপলের ওপর শুয়ে আছেন। আজকাল আর সহজে ঘুম আসতে চায় না। এপাশ, ওপাশ করতে করতে একটু যাও-বা এলো, দেখতে দেখতে ভোর। উঠে পড়ার তাগিদ।

সেবিকা শুয়ে আছেন সামনের আকাশের দিকে চোখ রেখে। সতের নম্বর বাড়ির জানালা খোলা। এত রাতেও আলো জ্বলছে। শিল্পীর বাড়ি। শিল্পীদের রাত নেই। মেয়েটা কোনও কোনও দিন শেষ রাতেও ফেরে। ঘুম আসে না সেবিকার। রাধামাধব! তুমি কত কি-ই না দেখালে প্রভু। এ পাড়ায় এখনও এমন মানুষ আছে যে মাঝে মাঝেই রাত নিশুতি হলে তার কাছে আসে কু-প্রস্তাব নিয়ে। সেবিকা মনে মনে হাসেন, আর তার রাধামাধবকে বলেন— বাঁশিটি আড়ে নিয়ে

বাঁকা হয়ে আছ প্রভু। পৃথিবীর কিছুই তুমি দেখছ না। একেবারে এলে দিয়েছ। কোথায় মন্দিরে আসবে তোমার খোঁজে, না ছুটে এসেছে দেহের খোঁজে। মানুষের মুখে আগুন।

সতের নম্বর বাড়ির খোলা জানালায় আলোটা হঠাৎ খুব জোর হয়ে উঠল। বাবা এত রাতে উনুনে আগুন পড়ল। এরপর রান্নাবান্না তারপর খাওয়া! ভোর হয়ে যাবে যে রে। অভিনয় করিস বলে সবই কি অভিনয়! তেলচিটে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে গল গল করে। বিশ্রী পোড়া গন্ধ। সেবিকা তেরপল ছেড়ে উঠে বসলেন, হায় ঈশ্বর। এ তো উনুনে আগুন নয়। আগুন লেগে গেছে সারা ঘরে। সাপের জিভের মতো লকলকিয়ে উঠছে। সারা ঘরে জড়াজড়ি করছে। সর্প মৈথুনের মতো। আগুনের আভায় অন্ধকার গলি কাঁপছে।

সকালেই পুলিস এল। ওর‍্যারলেস লাগানো একটা জিপ। একটা কালো ঢাকা ভ্যান। অনেক লোকলস্কর। গলিটা একেবারে ভরে গেল। অফিসার-ইন-চার্জ মন্দিরের সেবিকাকে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছিল বলুন।'

'আমি দেখলুম ?'

'কি দেখলেন ?'

'জীবনে যা দেখিনি। তখন অনেক রাত। কত রাত তা বলতে পারব না। ওই যে সতের নম্বর বাড়ি। ওই যে জানলা খোলা। এ পাড়ার সবাই ওই বাড়িটাকে বলে নাচমহল। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছিল। আমার তো ঘুম আসে না ভাই। এই এইখানটায় এক টুকরো তেরপল বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে দেখছি—আলো জ্বলছে। কে একজন দাঁড়িয়ে রইল জানলায়, অনেক্ষণ ধরে। দেখছি শুয়ে শুয়ে। তন্দ্রামত এসেছে। হঠাৎ মনে হল চোখের সামনে একটা আলো কাঁপছে। এত আলো। তাকিয়ে দেখি আগুন। ওই ঘরটা যেন জ্বলে উঠেছে। লকলকে শিখা ছিলছিল করে নাচছে সারা ঘরে।'

'তারপর ?'

'তা আমি ভাবলুম আগুন লেগে গেছে। আগুন আগুন আগুন বলে চিৎকার করলুম। কে শুনবে। গভীর রাতে মেয়েছেলের গলা। হঠাৎ, আকাশ বাতাস কাঁপানো আর একটা চিৎকারে আমি ভাই অবশ হয়ে গেলুম। তারপর মেয়েছেলের রাত-চেরা গলা—বাঁচাও। তারপর দেখি কি, সম্পুর্ণ উলঙ্গ একটি মেয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে এই দিকে। আর পেছনে ছুটে আসছে দুটো জ্বলন্ত হাত সামনে বাড়িয়ে জ্বলন্ত এক মানুষ। আমি এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। মেয়েটা ছুটছে আর চিৎকার করছে—বাঁচাও বাঁচাও। জ্বলন্ত মানুষ প্রায় ধয়ে ফেলে আর কি। আমি বলছি, জয় রাধা-মাধব বাঁচাও, জয় রাধা-মাধব বাঁচাও। তেরপলটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলুম মানুষটার দিকে। পড়ে গেল। পড়ল আর উঠল না। তেরপলের তলায় ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে পুড়ে একেবারে অঙ্গার হয়ে গেল।'

'কোথায় সেই মেয়ে?'

'আমার পুঙ্গে'র কাপড়টা ওকে পরিয়ে দিয়েছি। সেই থেকে বসে গুম মেরে। মেয়েটা পাথর হয়ে গেছে।'

এই সুন্দরী লেনের অনেক ইতিহাস।

সেই সুন্দরী দাসীর জুড়ি গাড়ির ঘোড়া একবার ক্ষেপে গিয়ে হরেন সাঁতরার মেয়েকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল। সেই মৃত্যু সুন্দরীর জীবনের মোড় ফিনিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের সেই শুরু। রুদ্রের পুড়ে মরায় পাড়া আবার জেগে উঠল কিছু দিন। এ খুন, না আত্মহত্যা থানা, পুলিশ খুব হ'ল। শেষে ঢেউ উঠল, ঢেউ পড়ল। ঘটনা হারিয়ে গেল, ঘটনার স্রোতে।

শুধু রাধামাধবের মন্দিরটি বেশ ঝকঝকে নতুন হয়েছে। পেছনের দিকে একটা থাকার ঘর হয়েছে। কেউ বলে শিখা পুলিসের ভয়ে সেবিকা কিঙ্করী হয়েছে। তা না হলে স্বামী খুনের অপরাধে জেল হত। প্রবীণা সেবিকা বলে, 'শিখা যে যা বলে বলতে দে। প্রথম প্রথম

অনেকেই আমাকে বলত। আমার সম্পর্কে রটিয়েছিল, ও তো একটা বেশ্যা।'

মানুষের মুখ আর নদীর স্রোত, আপনি বন্ধ না হলে বন্ধ করা যায় না। শিখাই শুধু জানে শিখার কথা। চোখ বুজোলেই সে দেখতে পায়, তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এক জ্বলন্ত পুরুষ। এক একবার, বাতাসের সুরে ডাকছে—শিখা, আর মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুন আর নীল ধোঁয়া। অনেকেই প্রশ্ন করেছিল—তোমার স্বামী আগুনে পুড়ছে। তুমি দেখছ। নেবাবার চেষ্টা না করে তুমি ছুটে পালালে কেন? এর নাম ভালবাসা! শিখা কোনও উত্তর দিতে পারে না। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ করে—রুদ্র জ্বলতে জ্বলতে তাকে আলিঙ্গনে বাঁধতে চাইছে। ভালবাসার আলিঙ্গন নয়, মৃত্যুর আলিঙ্গন। শিখা ছুটছে। রাত্রিবাস ছিঁড়ে পড়ে গেছে শরীর থেকে। শিখা বলতে পারে না, স্বামী কে? সবাই তো কামনার জ্বলন্ত আগুন। নারীর বিধিলিপি সেই আগুনে তিলে তিলে মরা।

'চলে যায়'

'দূরের ওই বাড়িগুলো কোন জায়গায়' ?

'ওই দিকটা হল বাছারা হিলস। হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে বড়লোকদের এলাকা'।

'আর ওই দিকটা? ওই যে রাস্তাটা নিচু হয়ে একটা বিশাল দরজার ওপাশে যেন হারিয়ে গেছে। অনেকটা গড়ের ঢোকবার জায়গার মত।

'ওটা একটা ষ্টুডিও। হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে বড় ফিল্ম ষ্টুডিও'।

'আজকের দিনটা ভারি সুন্দর তাই না। বেশ মেঘলা মেঘলা, বেশি গরম নেই'।

'এখানকার আবহাওয়াটাই এইরকম। সমুদ্র থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এই শহর। বছরের এই সময়টায় এখানে লাল আঙুর পেকে ওঠে। আঙুর খেয়েছেন একদিনও ?'

'না এখন খাই নি'। এলোমেলো হাওয়ায় সঞ্জয়ের মাথার চুল উড়ছিল। ইন্দিরার গাঢ় নীল রঙের আঁচল কিছুতেই বুকের উপর তার হাতের শাসন মানছিল না। তার চুলে জুঁই ফুলের মালা জড়ানো। দক্ষিণী মেয়েরা ফুল ভীষণ ভালবাসে।

সঞ্জয় এসেছে সুদূর কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদের এই ইনষ্টিট্যুটে ট্রেনিং নিতে। ইন্দিরা তার সহপাঠী। নিজামের আমলের বিশাল বাগান বাড়িতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবাসিক। কোর্সের আজই শেষ দিন। একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হবে। শিক্ষান্তিক সমাবেশে অধ্যক্ষ সার্টিফিকেট বিতরণ করে পাঠ্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মিলনোৎসব হবে। তারপরই বিদায় নেবার পালা। এইসব অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে একটু সময় পাওয়া গেছে। একটু আগে ডাইনিং হলে বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ লাঞ্চ শেষ করেছেন।

ইন্দিরা সঞ্জয়কে নিজে হাতে মিষ্টির ডিশ পরিবেশন করেছেন। কোর্স ডিরেকটার বিষ্ণু তখন পাশেই ছিলেন। মৃদু হেসে ইন্দিরাকে যেন সাবধানের সুরে বলেছিলেন, 'ডোণ্ট প্যাম্পার সঞ্জয়'। ইন্দিরা উত্তরে মাথা দুলিয়ে হেসেছিল। চুলে বাঁধা ফুলের ঝুমকো দুলে উঠেছিল। বিরিয়ানী প্রভৃতি সুখাদ্যের গন্ধকে ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ফুলের গন্ধ। ফর্সা টুকটুকে মুখ একটু লাল হয়েছিল কি। কপালে চাঁদের মত গোল টিপ কি একটু কেঁপে উঠেছিল?

আহার শেষে ছোট্ট একটু উদগার তুলে সঞ্জয় বলেছিল—'এইবার আমরা কি করব'? শর্মা বলেছিল 'ঘণ্টা দুয়েক সময় হাতে আছে, আমরা একটু হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারি'। শর্মা এসেছেন ইন্দোর থেকে। শর্মা আর সঞ্জয় একই ঘরে থাকছেন। পাশের ঘরে প্রকাশ। প্রকাশ বলেছিলেন, 'সঞ্জয় এখন বিশ্রাম করার মুডে নেই। সঞ্জয় অন্য কিছু করার কথা ভাবছেন'। শর্মা হো হো করে হেসে উঠলেন। 'তাহলে সঞ্জয়কে আমরা আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিতে পারি'।

'অন্য কিছুটা কি, শিকার টিকার নাকি। এখানে তো ওয়াইল্ড লাইফ নেই।'

'কিন্তু অনেক রকম পাখী আছে'। শর্মার কথার জের টেনে প্রকাশ বলেছিলেন 'দুপুরটা পাখি দেখে কাটান ভাল। বিশেষতঃ এমন সুন্দর মেঘলা দিনে। হালকা মেঘের ভেলা ভাসছে আকাশের নীল গাঙে'। সঞ্জয় না বোঝার ভান করে বলেছিল, 'এত কিছু করার থাকতে পাখি দেখার কথা আসছে কি করে?'

'পাখি যখন মানুষকে দেখে, মানুষ তখন পাখি দেখতে বাধ্য হয়'।

ডাইনিং হলের সামনে ছোট্ট গোলাপ বাগান। সঞ্জয় গোলাপ বাগানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শর্মা আর প্রকাশ দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল। সঞ্জয় বিশেষ কিছু ভাবছিল না। একটি মাত্র লাল গোলাপ ফুটে আছে, মেঘলা আকাশের নীচে। মেটে

সিঁদুরের মত রং। মানুষের মনে বিশেষ কোন কোন মুহূর্তে কোন চিন্তাই স্থান পেতে চায় না। চিন্তাহীন শূন্যতায় মন স্থির হয়ে থাকে। অধ্যাপক বিষ্ণু তাঁর অফিসের দিকে যেতে যেতে সঞ্জয়কে উদ্দেশ্য করে বলে গেলেন, 'প্রকৃতি দর্শন শেষ হলে আমার ঘরে এস, কিছু কাজের কথা হবে'। পর মুহূর্তেই ইন্দিরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সঞ্জয় কিছু একটা বলা উচিত বলেই বলেছিল—'রোজ ইজ এ রোজ ইজ এ রোজ'।

'আপনি গোলাপ ভালবাসেন'?

সঞ্জয় খুশী করার জন্যে বলেছিল, 'গোলাপ কে না ভালবাসে'?

'ফুল কিন্তু অনেকে ভালবাসে না'।

'দেন দে আর ফুলস'। সঞ্জয়ের কথার মোচড়ে ইন্দিরা ছেলে-মানুষের মত হেসে উঠল। 'আপনি কিন্তু ফুল ভালবাসেন। আপনার চুলের ফুলের মালা আপনার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।'

সব মেয়েই নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসায় একটু লাজুক লাজুক হয়ে যায়। ইন্দিরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল 'চলুন ওই অফিস বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়াই।' অনেকটা উঁচু থেকে চারপাশ ভাল দেখা যায়।

সঞ্জয় এইরকম একটা আমন্ত্রণের জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না। ক্লাশে ইন্দিরাকে সে লক্ষ্য করেছে। তার চালচলন, আড়ষ্টতাবর্জিত কথাবার্তা যুক্তিতর্কের ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছে, প্রশংসা করেছে ঘনিষ্ঠ হবার মানসিক ইচ্ছাকে ভদ্রতার লাগাম পরিয়ে বাধ্য করেছে। ইন্দিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে শর্মা আর প্রকাশের পারস্পরিক প্রতিযোগীতায় মজা পেয়েছে। সে দূরের থাকতে চেয়েছে মানুষের সমস্ত ভাললাগাকে আস্কারা দিতে নেই, এ শিক্ষা তার জীবন থেকে নেওয়া পাঠ। সব পথই যেমন একই মন্দিরে পৌছে দেয় না, সব জীবনই তেমনি সব জীবনে স্থান পায় না। ইন্দিরার হঠাৎ আমন্ত্রণে সঞ্জয় উল্লসিত হয়েছিল। বিশাল একটি দুর্গ দখলের পর সৈনিকদের যেমন আনন্দ হয় সেইরকম আনন্দের অনুভূতিতে পুলকিত হয়েছিল।

সম্পূর্ণ পাথরে তৈরি বিশাল বাড়ি। একদা কোনো নবাবের বাগানবাড়ি ছিল। বিশাল চওড়া সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ছাদে গিয়ে উঠেছে। ইন্দিরা অনেকটা পথ প্রদর্শক গাইডের মত আগে আগে উঠছিল পেছনে সঞ্জয়। হালকা শরীরে জড়ানো নীল শাড়ি। এলো চুলে সাদা ফুলের মালা দুলছে। সিঁড়ির ওপরের ধাপে একটু জল পড়েছিল। ইন্দিরা পা রেখেই পিছলে পড়ে যাবার মত হয়েছিল। সঞ্জয় কোমরে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ইন্দিরার পতন সামলে নিয়েছিল। ইন্দিরার মাথা সঞ্জয়ের বুকে। সঞ্জয়ের নাক ইন্দিরার চুলে। যে সান্নিধ্য স্বাভাবিক ভাবে সম্ভব ছিল না। অদৃশ্য বিধাতার নির্দেশে সামান্য একটা দুর্ঘটনায় তা পলকে সম্ভব হল। দুজনে পাশাপাশি ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চারিদিকে দাক্ষিণাত্যের শিলাময় পাহাড়। পথ প্রসারিত এদিকে ওদিকে। বাগান বাগিচা।

'দেখেছেন একটা লরি কিরকম ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠছে। ওখানে একটা কোয়ারী আছে। ভীষণ ভাল লাগে দেখতে। সারাদিন পাথরের সঙ্গে মানুষের লড়াই। মাঝে মাঝে ডিনামাইট দিয়ে পাথর উড়িয়ে দেওয়া হয়।' ইন্দিরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোয়ারীর দিকে তাকিয়ে রইল। সঞ্জয় ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া শিলাভূমি কয়েকদিন থেকেই তার বাংলোর পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রত্যুষে দেখছে। বড় বড় পাথরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পথ এগিয়ে গেছে। কল্পনায় মনে হত এই বুঝি কোন অশ্বারোহী মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতা থেকে দ্রুতগতিতে নেমে আসবে কিম্বা চম্বলের একদল দুর্ধর্ষ ডাকাত।

"আসলে একটা কোয়ারী" সঞ্জয় যেন জোরে স্বগতোক্তি করল।

ইন্দিরা অবাক হয়ে বলল—"হ্যাঁ ওটা কোয়ারীই তো। কেন ?"

'না আমি ভেবেছিলুম'। সঞ্জয় প্রাণখোলা হাসি হেসে, এলোমেলো চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে কথাটা মাঝপথেই অসম্পূর্ণ রাখল।

'বিশ্বাস হবে না কেন ? আমি ভাবতুম' সঞ্জয় তার কল্পনার কথা আরো

কাল্পনিক করে ইন্দিরাকে শোনালো।
'বাঃ আপনি একজন কবি। আপনি কবিতা লেখেন না?'
'লিখি না তবে ভাবি লিখব।' 'আপনি লেখেন না?'
ইন্দিরা মৃদু হেসে সুদূরে চোখ রেখে সলজ্জভাবে বলল, 'হ্যাঁ আমি লিখি। বিষ্ণুও লেখেন। খুব ভাল কবিতা লেখেন।'
'হায়দ্রাবাদ বড সুন্দর শহর।'
'দেখেছেন ঘুরে?'
'দেখব কখন? সব সময় ক্লাশ। তাছাড়া আমি কিছুই চিনি না। একলা একলা কোথায় যাবো!'
সঞ্জয়ের এই কথার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আন্তরিক ভাবেই বলেছিল। অযথা পৌরুষ দেখাবার জন্যে বলতেই পারত—হাতে আর একটা দিন সময় আছে বা সম্পূর্ণ একটা ছুটি আছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে সে একাই ঘুরে বেড়াবে সারা শহরে।

ইন্দিবা খুব আস্তে করে বলল, 'কাল সকালে আমাদের গোলকুণ্ডা বোডেব বাডিতে চলে আসুন না—আমি, বাপা, আর আপনি তিনজনে সারাদিন যে কটা দর্শনীয় জায়গা পারি ঘুরে ঘুরে দেখব।'
সঞ্জয় এতটা ঠিক আশা করে নি। দূর থেকে মানুষ এতটা সহজে কাছাকাছি চলে আসতে পারে, তার ধারণা ছিল না। শর্মা আর প্রকাশ যখন ইন্দিবাব কাছাকাছি আসার জন্যে প্রতিযোগিতা করছিল তখন তাব ইচ্ছে হয়েছিল নাবীর হৃদয়ে প্রবেশ করার শক্তিটা একবার যাচাই করে দেখি। শর্মা তাব চেয়ে অনেক বেশী স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, সুসজ্জিত। প্রকাশ যথেষ্ট মার্জিত এবং ব্যক্তিত্বে আদরণীয়। এমন কি কোন কোন সময় তাব মনে হয়েছে অধ্যাপক বিষ্ণুরও ইন্দিরা সম্পর্কে কিছু দুর্বলতা আছে। পুরুষ এবং নারীর মন নিয়ে সেই চিরন্তন খেলা। যে খেলায় মানুষ জয়ের আশা না নিয়েই খেলতে নামে সে খেলায় মানুষ বোধ হয় এমনি সহজেই বিজয়ী হয়।
সঞ্জয় অনেকক্ষণ ইন্দিরার কাজল আঁকা চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইল। কৃতজ্ঞতা জানাবে না তার হাত দুটো বুকের কাছে ধরে বলবে, তুমি আমার বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস, তুমি আমার শক্তির প্রতি শক্তি আমার ভরসার ভরসা, ভেবে পেল না। মেঘলা আকাশের নীচে চারিদিকে অসমতল ভূখণ্ডের বৈচিত্র্যের মাঝে দাঁড়িয়ে, দুজনে দুজনের চোখে চোখ রেখে ভাষাতীত স্বাচ্ছন্দে ভাব বিনিময়ের সুযোগ করে নিল।

'সেই ভাল আপনারা আমার সঙ্গে থাকলে এই অচেনা শহরে আমি আর হারিয়ে যাব না।' সঞ্জয় মৃদু হেসে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

'আপনার সম্পর্কে আমার চেয়েও রূপার কৌতূহল বেশী।'

রূপা ইন্দিরার সহকর্মী। রূপাকে দূর থেকে সঞ্জয় এই কদিনে বার কয়েক দেখেছে। ইন্দিরার চেয়ে অনেক বেশী আধুনিকা। দুজনের দুরকম ব্যক্তিত্ব। সেই রূপার কৌতূহল অনেক বেশী! কৌতূহল হয়ে উঠবার মত কি এমন আছে সঞ্জয়ের চরিত্রে। মহিলার চোখে কোন্ পুরুষ যে কখন কি মর্যাদা পেয়ে যায়। তাদের চোখে হঠাৎ কেউ রাজা, হঠাৎ কেউ প্রজা। এই নায়ক, এই আবার ভিলেন!

'রূপা বলছিল বাংলা শিখে সে আপনার সমস্ত লেখা পড়বে। আপনার জীবন দর্শনের সে ভক্ত হয়ে পড়েছে।'

'কি করে? আমার কথা তো তাকে আমি কিছু বলি নি।'

আমি বলেছি। একদিন ক্লাশে আপনি যে ভাবে বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিয়েছেন নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন, সব আমি রূপাকে বলেছি'। ইন্দিরা মাথা নীচু করল আর সেই ভাবেই বলল, আপনি একটি আকর্ষণীয় চরিত্র। কালকে আপনাকে তাই আমরা কাছে পেতে চাই।

সঞ্জয়ের খুবই ইচ্ছে করছিল ইন্দিরার আনত মুখের চিবুকটা ধরে উঁচু করে তুলে মনের সমস্ত অনুরাগ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বলে, 'তোমাকে আমার জীবনে খুব পেতে ইচ্ছে করে'। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। ইন্দিরা যদি হঠাৎ বলেও ফেলে, আমার আপত্তি নেই, সঞ্জয়ের পক্ষে

নতুন করে জীবনের আর একটি অধ্যায় খুলে ফেলা সম্ভব হবে না প্রবাহের পথে ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের ধাক্কায় কোনো তটভূমিতে সাময়িক ভাবে কোনো তমাল কুঞ্জে আশ্রয় মিলতে পারে কিন্তু স্থায়ী জীবন সেখানে শুরু করা যায় না। স্রোতের উজানে যাকে ভাসতে হবে প্রতিটি মুহূর্তের অনুভূতি তার কাছে বিভিন্ন।

নিভৃতে আরো কিছু ঘটার আগে শর্মা ছাদে উঠে এলেন। 'ভাল জিনিস স্বার্থপরের মত একা একা উপভোগ করা ঠিক হচ্ছে কি ? আমাকেও তো একটু অংশ দেওয়া যায়। শর্মা হাসতে হাসতে বললেন। সঞ্জয় বলল, 'আসুন না। সু-উচ্চ ছাদে দাঁড়িয়ে হায়দ্রাবাদ দর্শন। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন শ্রীমতি ইন্দিরা'। ইন্দিরা একটু ভদ্রতার হাসি হাসলেন কিন্তু শর্মাকে দৃশ্যপরিচিতি দিতে তেমন উৎসাহ দেখালেন না। বরং বললেন, 'অনেকক্ষণ উপরে এসেছি, চলুন এবার যাওয়া যাক, বিষ্ণু আপনাকে ডেকেছিলেন না'।

॥ দুই ॥

ভ্যালেডিকটারি ফাংসান শেষ হয়ে গেল। অধ্যক্ষ দু চার কথায় তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। সার্টিফিকেট বিতরণ শেষ হল। ছাত্ররা দু'চার কথা বললেন। হলের বাইরে এসে সবাই দাঁড়ালেন। সূর্যাস্তের আকাশে ঘরে ফেরা পাখির দল। বিষ্ণু সঞ্জয়ের সঙ্গে শেক্ হ্যাণ্ড করে বললেন 'সঞ্জয় আই উইল মিস ইউ লাইক এনি থিং'। ইন্দিরা গাম্ভীর্যের আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। যাবার আগে কানে কানে বলে গেল, 'কাল সকালে।'

শর্মা প্রকাশ আর সঞ্জয়, আঠারো এবং উনিশ নম্বর ঘরের আবাসিক তিনজন পড়ন্ত বেলার, আকাশ পাহাড় আর গাছের সারিকে সামনে রেখে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। সকলেই কিছু বিষন্ন। কয়েকটা দিন হারিয়ে যাওয়া ছাত্র জীবন আবার ফিরে পাওয়া গিয়েছিল। প্রাত্যহিক জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এই মেলামেশা, ভাবনাশূন্য,

চিন্তাশূন্য, অর্থনৈতিক মর্যাদাশূন্য বিদ্যাপীঠের অধ্যয়নং তপঃ জীবনের অবসান। আবার ফিরে চল যে যেখানে ছিলে সেইখানে। যেসব ইউনিফর্ম, যেসব খোলোস খুলে রেখে এসেছিলে আবার তার মধ্যে প্রবেশ কর।

শর্মা বললেন, অনেকে আজকেই চলে যাচ্ছেন। আমি রিজার্ভেশান পেলাম না। পেলে আজই চলে যেতে পারতুম। সেই কাল সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

'আমি আজই চলে যাচ্ছি, একটু পরেই গাড়ি আসবে, যতক্ষণ না আসে, বসে বসে গল্প করি'। প্রকাশ এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে বসলেন। শর্মা ও সঞ্জয়ও বসলেন।

প্রকাশ হাসতে হাসতে বললেন, 'সঞ্জয় বোধ হয় হায়দ্রাবাদেই থেকে যাবে। হৃদয় ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সঞ্জয়ের হৃদয় থাকবে এখানে, শরীর থাকবে কলকাতায়, তা কি করে সম্ভব'।

'কখনই তা সম্ভব নয়। এটা হোল হৃদয় চুরির কেস। স্টোরি অফ এ মিসিং হার্ট'। শর্মা সমর্থন করল প্রকাশকে।

আপনি একটা হোপলেস কিছুই করতে পারলেন না, আর এই চুপচাপ উদাসীন মানুষটি নগর জয় করে নিল। 'হিরো অফ দি সিন'।

সঞ্জয় চুপ করে থাকা ঠিক নয় বলেই যেন বলল,—'এর মধ্যে জয় পরাজয়ের কথা আসে কি করে। আমি জয় করতে আসিনি, পরাজিত হতেও আসিনি।'

শর্মা কিন্তু বেশ গায়ে মাখার মত করেই বললেন, 'আমি পরাজিত। শুধু পরাজিতই নই আহত'।

'আহত কেন'? সঞ্জয় অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'ইন্দিরা আমাকে অপমান করেছে। অভদ্র ব্যবহার করেছে'।

সঞ্জয় খুব অবাক হয়ে গেল, 'অভদ্র ব্যবহার করার মত মেয়ে তো ইন্দিরা নয়। যথেষ্ট ভদ্র মার্জিত, সংস্কৃতিবান'।

'আপনার এখন সেই রকমই মনে হবে। প্রেমে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়'।

প্রেমের কথা আসছে কি করে! আমরা কয়েকজন মধ্যবয়সী মানুষ। সংসারী। এখানে লেখাপড়া করতে এসেছি। কাফলাভের বয়স কুড়ি বছর পিছনে পড়ে আছে। এখন আর প্রেম হবে না। হবার উপায় নেই। এ হল ভালো লাগার ব্যাপার।

'সঞ্জয় আপনি ভুল বলছেন। প্রেমের কোন বয়স নেই, পরিবেশ নেই, জাতি নেই, ধর্মও নেই।'

'হতে পারে তবে এখানে আমরা কেউই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা, লুটে নিয়ে যাবার জন্যে আসিনি ভাই'।

'রাজকন্যা যদি ঘাড়ে চেপে বসে তখন তাকে ঘাড় থেকে নামাবার ক্ষমতা ক'জন রাখে'। প্রকাশ হঠাৎ তালি বাজিয়ে 'ব্র্যাভো ব্র্যাভো' করে উঠল। শর্মার কথা তার ভাল লেগেছে।

'লাঞ্চের পর ইন্দিরা আমাকে একটু সময় দেবে বলেছিল। সে তার অঙ্গীকার রাখেনি। বরং সে তখন আপনাকে ছাদে নিয়ে গেছে। আমি যখন জোর করে ছাদে গিয়ে উঠেছি, সে অভদ্রের মত নেমে এসেছে। আমার সেন্টিমেন্টের কোনো মূল্য দেয় নি। একে আপনি কি বলবেন?' সঞ্জয় শর্মাকে শান্ত করার জন্যে বলল, 'আই অ্যাম সরি। আমি জানতুম না ইন্দিরার সঙ্গে আপনার এপয়েন্টমেণ্ট ছিল। জানলে অবশ্যই আমি ছাদে যেতাম না'।

'আপিনি বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। উদাসীনতার মুখোস পরে তলে তলে ঘনিষ্ট হবার কসরত চালিয়েছেন। অথচ প্রথম থেকে আমরা তিন জনে একটা ইউনিটের মত হয়ে উঠেছিলুম। ডিনার টেবিলে পাশাপাশি বসেছি, পাশাপাশি বিছানায় শুয়েছি, ছুটির পর বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ আপনি আলাদা হয়ে গেলেন'।

শর্মার অভিযোগে সঞ্জয় স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রকৃতই এত সব সে ভাবেনি। এই দুজন মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়ার খবর সে রাখেনি। সমস্ত জিনিসটাই তার কাছে ছিল একটা খেলার মত।

দূরের গেট দিয়ে একটা সাদা স্টেশানওয়াগান ঢুকছে দেখা গেল।

প্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার গাড়ী এসে গেছে। ঘর থেকে আমার স্যুটকেসটা বের করে আনি'। তিনজনেই প্রকাশের ঘরের দিকে চললেন। প্রকাশ মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে থাকেন শহরের এক প্রান্তে, স্থানীয় সরকারী অফিসে চাকরি করেন। স্থানীয় মানুষ। প্রকাশের জিনিসপত্র কিছুই নেই একটি ব্রীফকেস ও একটি পাউডারের কোটো নিয়ম মাফিক বাংলোটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ কিন্তু রাত্রিবাস করতেন বাড়িতে

প্রকাশ গাড়িতে ওঠার সময় বললেন শহর পর্যন্ত লিফ্‌ট দিতে পারি। চলে যাবার আগে আপনাদের যদি কিছু কেনাকাটা থাকে করে নিতে পারেন'। শর্মার রিজার্ভেশানের জন্যে স্টেশানে যাবার প্রয়োজন ছিল। সঞ্জয়ের প্রয়োজন ছিল বাড়ির জন্যে সামান্য কিছু কেনাকাটার। দুজনেই গাড়িতে উঠলেন, শর্মা গম্ভীর। প্রকাশ কিন্তু স্বাভাবিক গাড়ি ইন্‌ষ্টিট্যুটের গেট ছাড়ানো মাত্রই প্রকাশ তাঁর কদিনের ছাত্রজীবন, ইন্দিরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, আলাপ পরিচয় করা নিয়ে পারস্পরিক রেশারেশি সব যেন ভুলে গেলেন। ওই দরজার ওপাশে রইল পড়ে জীবনের কটা দিন, কিছু চপলতা ফিরে পাওয়া ছাত্র-স্মৃতি সঞ্জয়ের প্রতি প্রকাশের বিদ্বেষ নেই, প্রতিযোগীতার ভাব নেই। আছে দুজন বয়স্ক মানুষের পারস্পরিক পরিচয়, ভদ্রতা, বন্ধুত্ব শর্মা কিন্তু তখনও আহত মন নিয়ে বসে আছেন

শহরে পৌঁছে শর্মা আলাদা হয়ে গেলেন। সঞ্জয় ভেবেছিল, প্রকাশ চলে যাবেন। সে আর শর্মা অনেক রাত পর্যন্ত শহরে ঘুরবেন, তারপর এক সঙ্গে ফিরে আসবে হস্টেলে শর্মা কিন্তু ইচ্ছে করেই সঞ্জয়কে এড়িয়ে গেলেন সঞ্জয় প্রথমে একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল রাতের হায়দ্রাবাদ, তার কাছে নিতান্তই অপরিচিত। অপরিচিতের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার মধ্যে আনন্দ নেই বরং ভীতি আছে। ফেরার বাস সব সময় পাওয়া যায় না অন্তত ঘণ্টা দুয়েক তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে ফিরে যাবার জন্যে।

প্রকাশ কিন্তু অনুভব করতে পেরেছিল সঞ্জয়ের নিঃসঙ্গতা। 'চলুন আমার সঙ্গে। আমার বাড়ি যাবার তাড়া নেই। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরি। বাসে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাব।' প্রকাশের বন্ধু-বাৎসল্যে সঞ্জয় মুগ্ধ হয়েছিল। দুপুর থেকে সে যেন এক প্রচণ্ড পাগলামির পরিবেশে পাগল হয়ে যেতে বসেছিল। এতক্ষণে সে বোধহয় সুস্থতায় মুক্তি পেল।

হায়দ্রাবাদের সবচেয়ে বড় কেনাকাটার জায়গা 'আবিদস'-এ এসে বললেন, 'চলুন একটু কফি খাই।' বিশাল দোকানে দুজনে মুখোমুখি বসলেন কফি নিয়ে।

'চারমিনারে যাবেন না স্ত্রীর জন্যে চুড়ি কিনতে।'

'কতদূর?'

'বাসে পনের মিনিট।'

'গোলকুণ্ডা রোড এখান থেকে কতদূর?'

'শহরের ও তল্লাটে। বেশ কিছুটা দূর?'

'যাবেন নাকি? কে থাকে ওখানে?'

'ইন্দিরা। কাল সকালে আমাকে যেতে বলছে?'

'গণেশ চতুর্থীর নিমন্ত্রণ?'

গণেশ চতুর্থী দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। বাংলার দুর্গাপূজার মত।

'না চতুর্থীর নিমন্ত্রণ নয়। হায়দ্রাবাদ শহর ঘুরে দেখার নিমন্ত্রণ। ইন্দিরা আমায় গাইড।'

'বাঃ ইন্দিরাকে সঙ্গী করে নিজামের শহরে ঘুরে বেড়ানর মত রোমান্স আর কি আছে?'

আমি তোমাকে সাহায্য করব। কাল সকালে পাবলিক গার্ডেনে আরকেওলজিক্যাল মিউজিয়ামের সামনে আমি থাকব। তুমি এস তারপর তোমাকে গোলকুণ্ডার হীরের খনিতে পৌঁছে দেবার ভার আমার।'

প্রকাশ কিছুতেই সঞ্জয়কে কফির দাম দিতে দিলেন না। ক্ষণিকের বন্ধুর প্রতি ক্ষণিকের বন্ধুর ভালবাসার আপ্যায়ন। স্টপেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চার মিনারের বাস আর এল না। প্রকাশ যদিও অধৈর্য হলেন না, সঞ্জয়ের ধৈর্য কিন্তু হার মানল।

'চলুন চার মিনার আর যাওয়া হল না আজ। এতটা পথ আবার ফিরে যেতে হবে।'

'যাক কালকেই যাবেন চার মিনার সঙ্গে থাকবে মিষ্টি সঙ্গী। চুড়ি কেনার হাতের হাতের মাপও পেয়ে যাবেন।' প্রকাশ উদাস গলায় হেসে উঠলেন।

শর্মা ফিরে এলেন অনেক রাতে। সঞ্জয় তখন ডিনার শেষ করে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসছিল না। সব ঘরই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সন্ধ্যের ট্রেনে অনেকেই বাড়ির পথে। সকলের প্রায় হোম সিক। শর্মা একদিন বলেছিলেন, সংসারী মানুষ সংসার ছেড়ে দীর্ঘদিন বাইরে থাকতে পারে না। যতদিন যায় বাড়ির আকর্ষণ বাড়তে থাকে।' প্রতিদিন শোবার আগে শুয়ে শুয়ে দুজনে অনর্গল কথা বলে যায়—পাড়ার কথা, অধ্যাপকদের কথা, সহপাঠীদের কথা এবং ইন্দিরার কথা। ইন্দিরা কেন শর্মার কথার জবাবে এই কথা বলল, ওই কথা বলল। কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণে ইন্দিরার বিশেষ কিছু মন্তব্য, শর্মার বিশ্লেষণ চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে যে কোন একজন ঘুমিয়ে পড়লেই ঘরে স্তব্ধতা নেমে আসত। শর্মা ফিরে এসেছেন হতাশ হয়ে রিজার্ভেশনে নাম ওয়েটিং লিস্টে। কাল সকালে আবার যেতে হবে। আর কোনো কথা হল না। ডিনার না খেয়েই শর্মা শুয়ে পড়লেন! ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত। বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

পরের দিন সকাল। শর্মা রোজ দেরিতে ওঠেন। সেদিন উঠলেন খুব ভোরে। সঞ্জয় জেগেই ছিল। রাতে ঘুমোতে পারে নি। অজস্র চিন্তার জটিল আবর্তে ঘুম পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ইন্দিরার সঙ্গে ছাদের দুপুরের কয়েকটি মুহূর্তের সঙ্গে সময়ের ব্যবধান যত বাড়ছে জীবনের অন্য

এক সত্য যেন ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সারা রাত চোখের উপর হাত রেখে সঞ্জয় সেই সত্যকে খুঁজে পেয়েছে। জীবনে পাওয়ার চেয়ে না পাবার পরিমাণটাই বেশী। একটা পুরোনো জামা সহজেই পাল্টে ফেলে নতুন জামা পরা যায়। পুরোনো জীবনকে হঠাৎ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন জীবন কিন্তু শুরু করা যায় না, প্রাচীন জীবন অনেকটা প্রাচীন বৃক্ষের মত যে জমিতে তার মূল, শিকড়, যে জমি থেকে তার প্রাণ-রস সংগ্রহের ভবিষ্যৎ সেই জমি থেকে তাকে উৎপাটিত করলে গাছ বাঁচে না। চারা গাছ একাধিক বার ভূমি নেড়ে বসানো চলে। ইন্দিরাকে তার ভাল লেগেছে। একথা সত্য। ইন্দিরার মেধা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির মধ্যে সে তার জীবনকে আরও বেশী প্রস্ফুটিত করার সম্ভাবনা দেখেছে। তার জীবনের মূল শিকড় ইন্দিরার প্রাণরসে আরো পুষ্ট হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা একতরফা নয়। নতুন জমিতে সে মূল ছড়াতে চাইলেও; জমীর উপযুক্ত বৃক্ষ কিনা এ বিচারের ভার জমির মালিকের। ইন্দিরার সামনে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় নিজের জীবন সত্যটিকে আবিষ্কার করে ফেলেছে সে—একটি অসম্পূর্ণ মানুষ। জীবনে তার ক্ষোভের আর অসঙ্গতির পরিমাণ বিশাল। তার মন, তার মেধা উপবাসী। সে যদি তৃপ্ত হত তাহলে হঠাৎ অকারণে এতটা উল্লসিত হত না। সে কোনদিনই কমেডির নায়ক হতে পারবে না। জীবনের গতিই তাকে ট্র্যাজেডির হিরো করেছে।

প্রত্যুষের প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করা যায় না। কাঁচা সোনার মত রোদ হালকা ঠাণ্ডা আঙুর পাকানো হাওয়া। দূরে কোয়ারীর দিকে ফৌজী মাঠে কুচকাওয়াজ, ফায়ারিং রেঞ্জে মেসিন গানের শব্দ। শর্মার দাড়িকামান স্বাস্থ্যবান তাজা ফর্সা মুখ। সামনের রাস্তায় গুজরাতের ছেলে ভিয়াসের প্রাণোচ্ছল হাঁটা চলা। সঞ্জয় নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। ব্রেকফাষ্ট সেরে আর. টি. সির বাস ধরে সে আর শর্মা শহরে যাবে। শর্মা স্টেশানে সঞ্জয় মিউজিয়ামের সামনে।

শর্মা ইতিমধ্যে সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার জিনিসপত্র

সুটকেসে ভরে ফেলেছে। ওয়ার্ডরোব থেকে সমস্ত জামা কাপড় ভরে ফেলেছে। বাথরুমে তার সাবান পড়ে নেই। বিদায়ের জন্যে সে আংশিক প্রস্তুত। সঞ্জয়ের হাতে এখন পুরো একটা দিন? শর্মা তাকে ছেড়ে চলে যাবে এই বেদনা কিন্তু তাকে ভেতরে ভেতরে বিমর্ষ করে তুলেছে। রাতে তার পাশের বিছানা খালি পড়ে থাকবে। গোটা একটা ওয়ার্ডরোব ফাঁকা হু হু করবে। সারা ঘরের কোথাও শর্মার কোন স্মৃতি-চিহ্ন পড়ে থাকবে না। সে যে সময় একা ঘরে শুয়ে থাকবে, শর্মা তখন ইন্দোরের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে। আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না? একই ঘরে পাশাপাশি শোয়া হবে না। শুয়ে শুয়ে গল্প হবে না। একই টেবিলে বসে খাওয়া হবে না। সময়ের কোন এক জলাশয়ে দুজনে অবগাহন করে উঠে গেল। এরপর দুজনে পরস্পরের থেকে বহুদূরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হবে, কিছু আগে পরে পৃথিবী ছেড়ে, পরিচিতি ছেড়ে চলে যাবে। বিষণ্ণ কোন সন্ধ্যায় মনে হতে পারে—সঞ্জয় ছিল না? এখন কোথায়, কেমন? শর্মা ছিল না? ইন্দোরের কোন রাস্তায় সে হয়ত বেড়াচ্ছে। চোখে ভাল দেখতে পায় না। নাতি কিম্বা নাতনীর হাত ধরে ধরে টুক টুক করে হাঁটছে। কিম্বা কোন এক শীতের হাড় কাঁপানো রাতে সে ফিরে গেছে।

ইন্দিরা নয় শর্মার চলে যাবার বেদনা সঞ্জয়ের সকালের মেজাজ তৈরি করে দিল। জীবনের প্রচণ্ডতম সত্যের মুখোমুখি হল। চলে যায়। আজ যে আছে কাল সে থাকবে না। সময়ে সবকিছু ভাসমান। ইন্দিরার সাথে তার দেখা হোক না হোক। ছাদে একসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবার মুহূর্ত স্মৃতি হয়ে রইল সময়ের কাছে। সে যেখানেই থাকুক না কেন, ইন্দিরা আরো বড় হবে। তার জীবনের ধারা পাল্টাবে। বিয়ে হবে। সন্তানের জননী হবে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে জীবনের পরিনতির দিকে এগিয়ে চলবে। যৌবনের শক্তিতে সে সবকিছু ভুলে যাবে, অস্বীকার করবে। তারপর বয়সের কোন এক সময়ে যখন পিছনে তাকাবার সময় আসবে তখন হয়তো স্মৃতির পর্দায় হঠাৎ কোন পুরোনো

মুখ ভেসে উঠবে।
মিউজিয়ামের সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর প্রকাশ এলেন স্কুটারে। গণেশপুজো সারতে দেরী হয়ে গেছে। অজস্রবার ক্ষমা চাইলেন। 'চলুন আপনি অটোরিকশায় উঠুন, আমি স্কুটারে অনুসরণ করি। গোলকুণ্ডা এস. রোড। ঠিকানাটা কি ?
'প্রকাশ, শুনুন আমি আর ইন্দিরার কাছে যাব না। আপনার যদি সময় থাকে চলুন একসঙ্গে কয়েকটা যায়গা ঘুরি—চারমিনার, সালারজং, ওসমান সাগর, গোলকোণ্ডা ফোর্ট'।
'যাবেন না কেন ?'
ছেলেমানুষীর বয়স গেছে প্রকাশ। কি হবে এক তরুণীর মনের খবর নিয়ে এই প্রৌঢ় বয়সে। বরং শর্মা স্টেশানে আছে। চলুন ওকে ধরে, তিনজনে দিনটা নিজেদের খেয়ালখুশীতে ভরে দি।
প্রকাশ একটু অবাক হলেও, রাজি হলেন।
'তা হলে লাঞ্চ করতে হবে আমাদের বাড়িতে।
শর্মাকে স্টেশানে ধরা গেল। ইউসুফ নগরে প্রকাশের বাড়ি লাঞ্চ। সারাদিন প্রচণ্ড রোদে ঘোরা, অবশেষে অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে বিকেলে ফিরে আসা। শর্মার ট্রেন সাতটায়। আমীর গেট থেকে প্রকাশ বিদায় নিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন আর হয়তো দেখা হবে না'।
শর্মা দুহাতে সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে যাবার আগে বলে গেলেন—'একটা রাত দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কাল অন্ধকার ভোরে আপনিও বাড়ি মুখো। এখানে পড়ে থাকলে আমাদের এই কটা দিন। ভবিষ্যতে দেখা হবে, যোগাযোগ থাকবে এমন আশা করি না। বিদায় বন্ধু।'
বাংলোর পিছনদিকের দরজাটা, যেটা কমই খোলা হত, অথচ যেটা খুললে ফাঁকা মাঠ, কোয়ারী ফৌজী সীমানা দেখা যায়, সেই দরজাটা খুলে, পড়ন্ত বেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে সঞ্জয় সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিল। গণেশ পুজোয় মাইকে দক্ষিণী গান ভেসে আসছে।

রাত ভোরে বেরোতে হবে বলে সঞ্জয় প্রায় সব জিনিসই গুছিয়ে নিল স্যুটকেসে। শর্মার ওয়ার্ডরোবটা খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সারিসারি জামা প্যান্ট ঝুলতো। তলার তাকে রাখত, সাবান, সেভিং সেট, মাথার তেল, চিকি সুপুরির কৌটা। সাবান মোড়া কাগজটা খালি পড়ে আছে। কাগজটা হাতে নিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল— শর্মা নামক কোন ব্যক্তি একসময় এই ঘরের অধিবাসী ছিলেন।

শর্মার টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে দেখল, শর্মার কোন স্মৃতি যদি পড়ে থাকে। না কিছু পড়ে নেই। দুটো বাসের টিকিট পড়ে আছে— আবিদশ থেকে আমীরগেট। টিকিট দুটো সঞ্জয় পকেটে রেখে দিল।

রাতে ডইনিং হল প্রায় খালি। সেখানের সবাই প্রায় চলে গেছেন। সঞ্জয়ের আহারে তেমন রুচী ছিল না। একলা একটা টেবিলে কোন রকমে কিছু খেয়ে নিল। অন্যদিন মিষ্টির ডিস শর্মা নিয়ে আসতেন। সঞ্জয় মিষ্টি খেল না। এই প্রতিষ্ঠানে এই তার শেষ আহার।

কিছুক্ষণ বাংলোর সামনে অন্ধকার রাস্তায় পায়চারি করল। সার সার অন্ধকার বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নিঃসঙ্গতার অনুভূতিকে আরও গাঢ় করে নিল। এঁরা একদিন ছিলেন আজ আর নেই। আবার আসবে আর এক দল। আবার চলে যাবে। এই তো জীবন।

দরজা বন্ধ করে দিল সঞ্জয়। সম্পূর্ণ একা। শব্দের মধ্যে দক্ষিণী গানের সুর। বাইরের পোস্টে একটা আলো। একটি লতার ছায়া কাঁপছে শর্মার শূন্য বিছানায়। সাদা টাইলস বসানো বাথরুমের নির্জনতায় সঞ্জয় শাওয়ার খুলে স্নান করল। বাথরুমের তারে অন্যান্যদিন শর্মার কাচা রুমাল শুকোতো। আজ তার খালি। শর্মা এখানকার পাঠ শেষ করে চলে গেছে। আর সাতঘন্টা পরে সেও চলে যাবে।

পড়ার টেবিলে দেয়াল আলো জ্বেলে সঞ্জয় কাগজপত্র গুছোতে বসল। ড্রয়ার খালি করে টুকরো টাকরা যা ছিল সব বের করে আনল। একটা শুকনো ফুল বেরোলো। মনে পড়ল এখানে আসার প্রথমদিন বিকেলে শর্মা বাগান থেকে ফুলটা তুলে তাকে উপহার দিয়েছিল। ফুলটা যত্ন

করে কাগজে মুড়ে রাখল। একটা ছোট্ট স্লিপ—ইন্দিরার হাতের লেখা —গোলকোণ্ডা ক্রস রোড। লেখাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। সময় রাত দশটা। ইন্দিরা এখন হালকা রঙের শাড়ি পরে খাটের পিঠে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বই পড়ছে। বিষ্ণু বলেছিলেন—বয়সের একটা ধর্ম আছে। মানুষের বয়স যত বাড়ে সংসারের অভিজ্ঞতায়, জীবনের আগুনে মানুষের গাঁট শক্ত হয়ে ওঠে। তরুণ বয়সে মানুষের উচ্ছ্বাস বেশী থাকে, বাস্তবের চেয়ে স্বপ্নের জগতে বিচরণ তার ভাললাগে। ইন্দিরার উচ্ছ্বাস, জীবনীশক্তির উৎস তার বয়স।

জীবনের ইন্দিরা অধ্যায়, সঞ্জয় সযত্নে মুড়ে রাখল। জীবনের সুখের দিনে স্বপ্নের দিনে মাঝে মাঝে খুলে দেখবে। একসঙ্গে তোলা একটা গ্রুপ ছবিও সঙ্গে রইল। সময় কোথাও স্থির থাকবে না। সকলেই সময়ের প্রবাহে ভেসে চলেছে। কেউ চলেছে আগে, কেউ আসছে পেছনে। শর্মার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটা ইনল্যাণ্ড চিঠিতে সঞ্জয় লিখল :

Chance rides the stallion of life,
Flowers dringting in stream
meet once a while
In the tree of time
moments ripen
bursting pods send
Seeds of varied experience
Close to closeness
they drift apral
So what ! Adiu ! Adiu-

ইন্দিরার ঠিকানা লিখল, ঠিকানা লেখার জায়গায়। দূরে গেটের কাছে যুঁই ঝোপের পাশে লেটার বক্স। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। নিস্তব্ধ আকাশ। অন্ধকারে সঞ্জয় এগিয়ে চলেছে লেটার বক্সের দিকে —সাদা পাজামা, সাদা পাঞ্জাবী। সুপ্ত পৃথিবীতে সেই যেন একমাত্র জাগ্রত প্রাণী।

———